ফ্রেডরিক ফরসাইথ

দি আফগান

দি আফগান

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

অনুবাদ ঃ প্রদীপকুমার সেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

THE AFGHAN
By—Frederick Forsyth
Translated by : Pradip Kumar Sen
Rs. 90/-

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৮

প্রচ্ছদ বিন্যাস : রঞ্জন দত্ত

মূল্য : ৯০ টাকা

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে শ্রী অজিতকুমার জানা কর্তৃক প্রকাশিত। মণীন্দ্রনাথ নায়েক ১৩০৮, পূর্ব সিঁথি রোড, মধুগড়, কলকাতা-৭০০ ০৩০ থেকে বর্ণ সংযোজিত ও স্টার লাইন ১৯/এইচ/এইচ/১২, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

দি আফগান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তরুণ তালিবান দেহরক্ষীটি যদি জানতো যে ওই বিশেষ সেল ফোনটাতে একটা কল করার দরুন তাকে মরতে হবে, তাহলে সে কিছুতেই....যাই হোক, সে জানতো না। সে কলটা করল এবং তার ফলে—

২০০৫ সালের ৭ই জুলাই মধ্য লণ্ডন পর পর চারটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল। বোমাগুলো ছিল বিভিন্ন জায়গায়—চারজন আত্মঘাতী জঙ্গির পিঠে বাঁধা চারটি হ্যাভারস্যাকের মধ্যে। বিস্ফোরণে বাহান্ন জন অফিস যাত্রী ঘটনাস্থলেই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, আহত হ'ল সাতশো জন। আহতদের মধ্যে একশো জন চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেল।

এই চার জঙ্গির মধ্যে তিনজন জন্মসূত্রে ব্রিটিশ, তাদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম সবই ব্রিটেনে। তিনজনেরই বাবা-মা পাকিস্তানি অভিবাসী। চার নম্বর ব্যক্তিটির জন্ম জামাইকাতে। ব্রিটেনে দীর্ঘসময় বাস করার জন্য তাকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। এর কিছুকাল পরেই সে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। বিস্ফোরণের সময়ে তার বয়স ১৭-১৮। বাকি তিনজনের মধ্যে আরও একজনের বয়স তার সমান, তৃতীয় জনের বয়স বাইশ এবং দলের নেতার বয়স তিরিশ। এরা কেউই কিন্তু কোনো মুসলিম দেশে ট্রেনিং পায়নি। খোদ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের মধ্যেই কয়েকটি মসজিদের চরমপন্থী মৌলানাদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তারা নিয়মিত ওই সব মসজিদে যাওয়া-আসা শুরু করে। এই মৌলানারা অতীব চতুর ও নিপুণ প্রচারক। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ওই চারজনের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই—তারা পরিণত হ'ল নিষ্ঠুর, ধর্মান্ধ জঙ্গিতে। এরপর অন্যান্য কয়েকজন প্রচারক তাদের মগজ ধোলাই সম্পূর্ণ করতে আর বেশি সময় নিল না।

বিস্ফোরণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইংরেজ পুলিশ তাদের পরিচয় খুঁজে বার করল। লীড্‌স শহরে ও তার আশেপাশে চারজনেরই বাসস্থান। পুলিশ প্রথমেই হানা দিল দলের নেতার বাড়িতে—তার নাম মহম্মদ সিদ্দিক খান, উচ্চশিক্ষিত এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষকতা করার জন্য বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

চারজনেরই পুরো বাড়ি তছনছ করে উল্টেপাল্টে খুঁজে পুলিশ যা বার করল, তাকে ছোটখাটো গুপ্তধন বলা চলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে চারটি সেল ফোন কেনার রসিদ। সব কটি একই জাতের সেলফোন—'বাই-ইউজ-থ্রো' শ্রেণীর—অর্থাৎ কেনো, ব্যবহার করো এবং ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে ফেলে দাও। রসিদগুলো থেকে জানা গেল, সেলফোনগুলি তিন ব্যাণ্ডের এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকেই ব্যবহার করা চলে। আরও জানা গেল প্রতিটির কুড়ি পাউণ্ড মূল্যের 'প্রি-পেড সিম কার্ড' নম্বর। একটি ফোনও খুঁজে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু পুলিশ দেরি না করে চারটি নম্বরেই 'রেড ফ্ল্যাগ' সতর্কতা চিহ্ন লাগিয়ে দিল—যদি

BanglaBook.org

কখনও কেউ যে কোনো একটি ফোন থেকে কোনো কল করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ কলটির উৎস স্থান জানা যাবে, তা সে দুনিয়ার যেখানেই হোক।

সিদ্দিক খানের বাড়িতে পাওয়া কাগজপত্র থেকে আর একটি তথ্য জানা গেল যে, তার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে তারা আগের বছর নভেম্বর মাসে পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে তিনমাস ছিল। এই সহযোগীটি এক তরুণ পাঞ্জাবী—নাম শাহজাদ তনবীর। পাকিস্তানে থাকাকালীন তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানা গেল না। কিন্তু বিস্ফোরণের কয়েক সপ্তাহ পরে আরবি টেলিভিশন চ্যানেল 'আল জাজিরা' একটি ভিডিও ক্লিপ প্রচার করল। তাতে দেখা গেল এক উদ্ধত সিদ্দিক খানকে—সে নিজের মৃত্যু ও বিস্ফোরণের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছে। বোঝা গেল যে সে পাকিস্তানে থাকার সময়েই এই ভিডিও রেকর্ডটিও তৈরি করেছিল।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হ'ল—চার আত্মঘাতী বোমারুর মধ্যে যে কোনো একজন তার সেলফোনটি পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবেই আল-কায়দার এক প্রশিক্ষককে সেটি উপহার দিয়েছিল। (লণ্ডনের বিস্ফোরকগুলি যে আল-কায়দার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ চার জঙ্গির কারোরই ওইরকম বোমা তৈরি করার মতো উচ্চস্তরের কলাকৌশল জানা ছিল না।)

আল-কায়দার সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি যে-ই হোক না কেন, মনে হয় সে ওই সেলফোনটি আর এক ব্যক্তিকে সম্মানসূচক উপহার দেয়। ওই ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে স্বয়ং ওসামা বিন-লাদেনের খুব কাছের লোক। পেশোয়ারের পশ্চিমে ওয়াজিরিস্তানের রুক্ষ পর্বতশ্রেণী—যেখানে ওসামা অদৃশ্যভাবে কোথাও লুকিয়ে আছে বলে মনে করা হয়—সেখানে এই ব্যক্তির নিয়মিত যাতায়াত চিল। ফোনটা দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র প্রচণ্ড জরুরি অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য। এমনিতে বিন-লাদেন ও তার আল-কায়দার সদস্যরা সেলফোন ব্যবহার করার ব্যাপারে অতি সতর্ক। তবে এই ক্ষেত্রে উপহার দেওয়ার সময় দাতা ব্যক্তিটি মোটেই ভাবতে পারেনি যে ব্রিটিশ জঙ্গিটি এতটাই মূর্খ ও বোকা যে সেলফোনগুলো কেনার রসিদটা সে লীড্‌সে তার ফ্ল্যাটে রেখে দেবে!

ওসামা বিন-লাদেনের বাছাই করা আল-কায়দার সর্বোচ্চ কমিটিটি চারভাগে বিভক্ত—সশস্ত্র ক্রিয়াকলাপ, অর্থ আমদানি ও তৎসংক্রান্ত হিসেবপত্র, মত ও নীতি প্রচার এবং তাত্ত্বিক শিক্ষা। প্রতিটি বিভাগের একজন করে প্রধান বা অধ্যক্ষ আছে। এই চার অধ্যক্ষের ওপরে কেবল দুটি ব্যক্তি—ওসামা বিন-লাদেন ও তার ডানহাত আয়মান আল-জোয়াহিরি। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিশাল আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদী সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থা দেখাশোনা করত আল-জোয়াহিরির অনিষ্ঠ আর এক মিশরীয়—তৌফিক আল-কুর।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তৌফিক আল-কুর ছদ্মবেশে পেশোয়ারে হাজির ছিল। কেন ছিল, সে কারণটা পরে পরিষ্কার হয়। তবে সেই সময়ে সে বিভিন্ন দেশ ঘুরে আল-কায়দার তহবিল সংগ্রহ করে পেশোয়ারে এসে তার পথপ্রদর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই গাইডরা তাকে গোপন পথে ওয়াজিরি পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাবে, এই রকমই ব্যবস্থা ছিল। সেখানে ওসামা নিজে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

BanglaBook.org

আল-কুরকে দেখাশোনা করা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারজন তালিবান তরুণকে নিযুক্ত করা হয়। এই তালিবানিরা পাকিস্তানী নাগরিক বটে, কিন্তু মনে প্রাণে তারা ওয়াজিরি সম্প্রদায়ভুক্ত। সকলেই পুশতু ভাষায় কথা বলে, উর্দু নয়। চারজনকেই প্রায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বিভিন্ন মাদ্রাসাতে ভর্তি করে কোরান মুখস্থ করানো হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল মৌলবাদী ইসলামের প্রচার। এরা ছিল ওয়াহাবি মুসলমান—সর্বাপেক্ষা হিংস্র, ধর্মোন্মাদ এবং পরমত-অসহিষ্ণু। এদের মতো মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মুসলমান তরুণের কোনো বিষয়ে কিছুই জ্ঞান বা দক্ষতা নেই। ফলে এদের কোনো চাকরি বা কাজও দেওয়া অসম্ভব। এরা শুধু কোরান মুখস্থ বলতে পারে, আর তাদের দলের সর্দার যদি কোনো কাজ করতে বলে, তাহলে তার জন্য স্বচ্ছন্দে প্রাণ দেয়।

এই চার তালিবান তরুণের ওপর দায়িত্ব ছিল মধ্যবয়সী এক মিশরীয় ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা। মিশরীয়টি আরবি ভাষায় কথা বলে, তবে মোটামুটি পুশতুও বলতে পারে, ফলে কাজ চলে যাচ্ছিল। চার দেহরক্ষীর একজনের নাম ছিল আবদেলাহি। এই আবদেলাহির একটা সেলফোন ছিল। এই যন্ত্রটি নিয়ে তার গর্ব ও আনন্দ ছিল অপরিসীম। ১৫ই সেপ্টেম্বর সকালে সে আবিষ্কার করল যে তার ফোন কাজ করছে না, কারণ ব্যাটারিতে চার্জ নেই এবং চার্জারটাও তার সঙ্গে নেই।

সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দুপুরের নমাজের সময় পেরিয়ে গেছে। তার মানে সব মসজিদ থেকে লোকেরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, এখন বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। মিশরীয় জনাব তাঁর দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরেই নমাজ সেরে নিয়েছেন। তারপরে অল্প কিছু খেয়ে তিনি গেছেন সর্বোচ্চ তলার এই ফ্ল্যাটের অন্য একটি ঘরে বিশ্রাম নিতে।

আবদেলাহির বড় ভাই পশ্চিম পাকিস্তানের মৌলবাদী শহর কোয়েটার বাসিন্দা। তাদের মা সেখানে কিছুদিন ধরেই খুব অসুস্থ। আবদেলাহি চাইছিল তার দাদাকে ফোন করে মা'র খবর নেবে, কিন্তু তার সেলফোনটা কাজ করছিল না। মা'র খবরটা নেওয়া দরকার, অথচ সেলফোন চার্জ করার উপায় নেই। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বসার ঘরের টেবিলে রাখা মিশরীয় জনাবের অ্যাটাচি কেসের ওপরে রাখা চকচকে সেলফোনটার দিকে। সে চট করে ফোনটা তুলে নিয়ে দেখল সেটার পুরো চার্জ আছে।

ঘরে আর কেউ নেই। একটা মাত্র কল করলে কি আর হবে? সুতরাং আবদেলাহি কোয়েটাতে তার দাদার ফোন নম্বর ডায়াল করল, দাদার সেলফোনের রিং টোনটা খুব সুন্দর—সে শুনতে লাগল কেমন চমৎকার সুরে-তালে বাজছে ফোনটা....

ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারের আতঙ্কবাদ বিরোধী বিভাগের (কাউন্টার টেররিজম্ সেকশন বা সংক্ষেপে সিটিসি) একটা ছোট ঘরে মস্ত একটি পিবিএক্স বোর্ডের মতো দেখতে অসংখ্য তার-প্লাগ সমন্বিত যন্ত্রে লাগানো একটা লাল আলো জ্বলতে নিভতে শুরু করল।

ইংল্যাণ্ডের হ্যাম্পশায়ারের বাসিন্দারা মনে করে, সব কাউন্টির মধ্যে হ্যাম্প-শায়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই সর্বোত্তম। এই কাউন্টির দক্ষিণ উপকূলে ইংলিশ

BanglaBook.org

চ্যানেলের তীরে অবস্থিত বিশাল বন্দর সাদাম্পটন এবং পোর্টসমাথে নৌবাহিনীর পোতাশ্রয়। হ্যাম্পশায়ারের সদর কার্যালয়ে ঐতিহাসিক উইনচেস্টার শহর, যেখানে রয়েছে প্রায় এক হাজার বছরের পুরোনো ক্যাথিড্রাল গির্জা।

হ্যাম্পশায়ার কাউন্টির মধ্যবর্তী অঞ্চলে, সমস্ত হাইওয়ে মোটরওয়ের থেকে দূরে ছড়ানো মীওন নদীর শান্ত, সুন্দর উপত্যকা। মীওন শান্ত নদী, তার বয়ে যাওয়া শীতল আঁকাবাঁকা দুই তীরে ছোট ছোট গ্রাম ও শহর। প্রাচীন স্যাক্সন আমলে তৈরি।

মীওন উপত্যকাকে উত্তর থেকে দক্ষিণে চিরে বেরিয়ে গেছে একটি মাত্র বড় পিচ বাঁধানো রাস্তা। উপত্যকার বাকি অংশ জুড়ে অজস্র সরু গ্রামীণ পথের গোলকধাঁধা —তাদের দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড় ও বিরাট বিরাট গাছ, মাঝে মাঝে ঘাস ও বুনো ফুলে ছাওয়া প্রান্তর। যুগ যুগ ধরে এই আবাদী অঞ্চল একই রকম আছে। খোলা মাঠগুলোর কোনটারই আয়তন মোটামুটি দশ একরের বেশি নয়। অল্প কয়েকটি বৃহৎ খামার, পাঁচশো একরের বেশি কোনটিই নয়। খামারবাড়িগুলো মোটা মোটা প্রাচীন কড়ি-বরগা ও ইটের তৈরি, মাথার উপরে লাল টালির ছাদ। এগুলির চারপাশে ঘিরে রয়েছে সুন্দর দেখতে মস্ত সব গোলাবাড়ি।

এই রকম একটি গোলাবাড়ির টঙে বসেছিল একটি লোক। তার চতুর্দিকে ছড়ানো মীওন উপত্যকার সৌন্দর্যভরা শোভা। একটু নীচে তাকালে ছোট্ট গ্রাম মীওনস্টোক, মাইলখানেক দূরে। ঠিক যে সময়ে পেশোয়ারে আবদেলাহি তার জীবনের শেষ ফোনকলটা করছিল, সেই সময়ে এই লোকটি তার কপালের ঘাম মুছে হ্যাম্পশায়ারের এক গোলাবাড়ির ছাদ থেকে কয়েকশো বছর আগে লাগানো টালিগুলো একের পর এক সযত্নে খুলে নিতে লাগল।

তার উচিত ছিল এ কাজের জন্য পেশাদার মিস্ত্রি লাগানো। তারা চারদিক থেকে ভাড়া বেঁধে কাজ করতো, তার ফলে কাজটা তাড়াতাড়িও হ'ত, অনেক নিরাপদেও হ'ত। কিন্তু খরচও অনেক বেশি পড়তো। গোলাবাড়ির মাথায় ওঠা কর্মরত এই মানুষটি প্রাক্তন সৈনিক, পঁচিশ বছর সম্মান ও সাফল্যের সঙ্গে সামরিক কর্তব্য পালন করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছে। অবসরকালীন ভাতা, ভবিষ্যনিধি, জীবনবীমা ইত্যাদি বাবদ যা কিছু টাকা পেয়েছিল, তার প্রায় সবটাই সে খরচা করে ফেলেছে তার সারাজীবন লালিত একটি স্বপ্ন পূরণ করতে—তার নিজের, একান্ত নিজস্ব একটা খামার কিনে তাকে নিজের রুচিমতো তৈরি করবে, যা হবে তার নিজের বাড়ি। সুতরাং এই দশ একরের কৃষিজমি ও গোলাবাড়ি—একটা সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে গিয়ে চওড়া বালিমাটির রাস্তায় ওঠা, আর সেই রাস্তা ধরে মীওনস্টোক গ্রাম।

কিন্তু সৈনিকরা টাকা-পয়সার ব্যাপারে তেমন বিচক্ষণ নয়। এই গোলাবাড়িটা কেনার সময় তার পরিকল্পনা ছিল যে পেশাদার লোক লাগিয়ে সে তিনশো বছরের পুরানো বাড়িটাকে পাল্টে একটা বেশ আরামদায়ক পল্লীভবন তৈরি করবে। কিন্তু কয়েকটা পেশাদার এজেন্সি খরচের যা হিসেব দিল, তাতে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল। অত টাকা সে সারা জীবনেও একসঙ্গে চোখে দেখেনি। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নিল যে পুরো কাজটা সে নিজের হাতেই করবে, যতদিন লাগে লাগুক।

জায়গাটা মনোরম সন্দেহ নেই। তার মানসচক্ষে সে দেখতে লাগল বাড়ির ছাদের

BanglaBook.org

পুরোনো টালিগুলো ঘসে-মেজে পালিশ করে আবার সেগুলোর ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনা গেছে। যে ক'টা টালি ভেঙে গেছে, সেগুলো যারা পুরোনো বাড়ির ভাঙা জিনিসপত্র বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যাবে। ওক গাছের গুঁড়ির কাঠ দিয়ে তৈরি মোটা কড়ি-বরগাগুলো এখনও নতুনের মতোই মজবুত। শুধু কড়িকাঠগুলো পাল্টে নতুন ফেল্‌টের আস্তরণ দিয়ে নিতে হবে।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সংস্কার করা তার নিজের বাড়ির বসার ঘর, রান্নাঘর, পড়াশোনার ঘর, ছোট হল—সব সে নিজের হাতে তৈরি করবে। এখন সে জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে অনেক দিনের পুরোনো সব খড়ের আঁটি, ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। অবশ্য বিদ্যুৎ ও জলের লাইন করার জন্য পেশাদার মিস্ত্রি লাগবে। কিন্তু আর কিছুর জন্য নয়। ইতিমধ্যেই সে সাদাম্পটন টেকনিক্যাল কলেজের সান্ধ্য বিভাগে ভর্তি হয়ে গেছে; সেখানে ইটের দেওয়াল তৈরি, সিমেন্ট প্লাস্টার লাগানো, কাঠের কাজ আর জানালায় কাচ লাগানোর কাজের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে।

বাড়িতে ঢোকা-বেরোনোর জন্য সামনে থাকবে একটা পাথর বসানো রাস্তা, তার দু' পাশে সবজির বাগান; সরু পায়ে-চলা পথটার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হবে নুড়ি-পাথর, আর পুরানো ফলের বাগানে চরে বেড়াবে ভেড়ার পাল। গোলাবাড়ির পাশে ছোট মাঠে, যেখানে এখন সে ক্যাম্প বানিয়ে বসবাসের বন্দোবস্ত করেছে, সেখানে প্রতি রাতে বসন্তের উষ্ণ হাওয়ায় বিশ্রাম করার সময় সে খরচের হিসেব করতো। সে মোটামুটি বুঝে গিয়েছিল যে ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করতে পারলে তার যেটুকু নিজস্ব তহবিল আছে, তাতে তার চলে যাবে।

তার বয়স এখন চুয়াল্লিশ। ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও তার গাত্রবর্ণ শ্যাম, মাথার চুল ও চোখ কুচকুচে কালো। তার শরীর ছিপছিপে ও পেশীবহুল, এক ফোঁটা চর্বির আভাসমাত্র নেই। তার বাকি জীবনটা সে এবারে শান্তি ও অবসর চায়—আর অনিশ্চিত, প্রতি পদে মরণের সঙ্গে লড়াই করা নয়, যথেষ্ট হয়েছে। মরুভূমি ও জঙ্গলে ছুটে বেড়ানো ম্যালেরিয়া আর জলাভূমির জোঁকের উপদ্রব সওয়া হাড়-কাঁপানো শীতে অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করা আর নোংরা খাবার খেয়ে পেট ভরানো—এ সব অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট হয়েছে। এইবার সে কাছাকাছি কোথাও একটা যা হোক কাজ জুটিয়ে নেবে, একটা লাব্রাডর বা গোটা দুয়েক অন্য ছোট কুকুর পুষবে, হয়তো বা কোনোদিন তার এই জীবন ভাগ করে নেওয়ার জন্য আসবে কোনো এক নারী!

সে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে ফের টালি তোলার কাজ শুরু করল। দশটা আস্ত টালি রাখল একপাশে সরিয়ে, বাকি দুটোর ভাঙাচোরা টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে.....আর এই সর্বক্ষণ ধরে ইসলামাবাদে একটা লাল বাতি সমানেই দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে নিভতে লাগল।

BanglaBook.org

পাকিস্তানে সেলফোন সার্ভিস দেয় দুটি মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি—পাকটেল ও মবিটেল। পাকিস্তানী সি.টি.সি. বহুদিন ধরেই এই দুই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল যে তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে কোনো কল যাবে বা আসবে, প্রতিটি কল ইসলামাবাদে সি.টি.সি.'র বৈদ্যুতিন বার্তাগ্রহণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবশ্য

পাঠাতে হবে। লোকাল কল, ট্রাঙ্ক কল ও আন্তর্জাতিক কল—সব রকম কলের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম ছিল কঠোরভাবে প্রযোজ্য। আমেরিকান ও ব্রিটিশ সরকারের আতঙ্কবাদ প্রতিরোধী সংস্থাগুলির সঙ্গে সি.টি.সি. সবরকম সহযোগিতা করে থাকে, কারণ আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদীরা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপরেও প্রায়ই হামলা চালায়। সুতরাং সি.টি.সি. তাদের বৈদ্যুতিন গ্রাহক যন্ত্রে অত্যন্ত উন্নত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সফ্‌টওয়্যার বসিয়ে নিয়েছিল। এই সফ্‌ট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে বেশ কিছু সিম কার্ডের নম্বরকে 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করে কমপিউটারে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটি সতর্কবার্তা দেওয়া থাকে; অর্থাৎ সেগুলি কেউ ব্যবহার করলেই তৎক্ষণাৎ স্বয়ংক্রিয়-ভাবে সেগুলিকে 'ট্যাপ' করে কথাবার্তা শোনা হয় ও রেকর্ড করে নেওয়া হয়। ইসলামাবাদে সি.টি.সি.-তে এই বিশেষভাবে চিহ্নিত নম্বরগুলির একটি হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

এইটিই ছিল আল-কুরের সেলফোনে কোয়েটাতে করা আবদেলাহির কল। সি.টি.সি.-তে পুশতুভাষী পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সার্জেন্টটি বৈদ্যুতিন বোর্ডে আর একটা বোতাম টিপতেই তার ঊর্ধ্বতন অফিসার লাইনে এলো। কয়েক সেকেণ্ড দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনে সে জিজ্ঞেস করল, "কি বলছে? এ তো পুশতুতে কথা বলছে।" সার্জেন্টটি কয়েক সেকেণ্ড আবদেলাহির কথা শুনে বলল, "মনে হচ্ছে বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মা'র কথা জিজ্ঞেস করছে।"

"কোথা থেকে ফোন করছে?"

সার্জেন্টটি ফের দেখল। "পেশোয়ার ট্রান্সমিটার—পাকটেল।"

অপর প্রান্তের মেজরটি আর কিছু জানতে চাইল না। কলটা তো পুরো রেকর্ড করা হচ্ছেই—এক্ষুনি যা দরকার তা হ'ল ফোনটা কে ব্যবহার করছে এবং সে কোথায় তা জানা। একটা মাত্র কল থেকে জানা মুশকিল—তবে হতচ্ছাড়া বুদ্ধুটা তো কথা বলেই চলেছে! দেরি না করে মেজর একটা বিশেষ ফোনে তিনটে বোতাম টিপল। স্পীড ডায়াল হয়ে দু' সেকেণ্ডের মধ্যে পেশোয়ারে সি.টি.সি.'র প্রধান অফিসারের টেবিলে একটা ফোন তীব্রস্বরে বেজে উঠল।

কয়েক বছর আগে—১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ নিউইয়র্কে আল-কায়দার হানায় ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার অনেকটাই আগে—পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা 'ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স', সংক্ষেপে আই.এস.আই., পাকিস্তানী সেনা-বাহিনীর বেশ কিছু কট্টর মৌলবাদী মুসলিম অফিসারের প্রিয় লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানে উপস্থিত তালিবান ও তাদের অতিথি আল-কায়দা জঙ্গিদের দৌরাত্ম্য ও তার বিপদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগৎ তখনই যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু এই ব্যাপারে আই.এস.আই.-এর ওপরে তারা মোটেই নির্ভর করতে পারছিল না।

পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল পারভেজ মুশারফ স্বভাবতই আমেরিকার ওপর অত্যন্ত বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। সুতরাং আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কঠোর ভাষায় যে 'উপদেশ'টি এলো, সেটা না শুনে তাঁর উপায় ছিল না। সেই অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই মৌলবাদী অফিসারদের প্রায় সকলকেই আই.এস.আই. থেকে সরিয়ে সেনাবাহিনীতে সাধারণ সামরিক পদে নিযুক্ত করা হ'ল। অন্যদিকে একই সঙ্গে তৈরি

BanglaBook.org

হ'ল সি.টি.সি., যার অফিসার ও অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই বয়সে তরুণ এবং যাদের কোনোকালেই কোনোরকম আতঙ্কবাদী কাজকর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, তারা যতই ভক্তিমান মুসলমান হোক না কেন। ভূতপূর্ব ট্যাঙ্ক কমাণ্ডার আব্দুল রজ্জাক এই রকমই এক সামরিক অফিসার। পেশোয়ারে সি.টি.সি'র প্রধান তখন এই রজ্জাক। ইসলামাবাদ থেকে ফোন কলটা তিনি পেলেন দুপুর ঠিক আড়াইটের সময়।

ইসলামাবাদের মেজরকে রজ্জাক একটাই প্রশ্ন করলেন—"কতক্ষণ কথা বলছে?"

"প্রায় তিন মিনিট হ'ল—এখনও পর্যন্ত।"

রজ্জাকের দপ্তর থেকে পাকটেলের টাওয়ার মাত্র আটশো গজ দূরে। কাল বিলম্ব না করে দু'জন টেকনিশিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অফিস বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেলেন রজ্জাক। হাতে ওয়াকি-টকির মতো দেখতে লম্বা এরিয়াল লাগানো 'ডাইরেকশন ফাইণ্ডার'। কার্যরত সেলফোনের বৈদ্যুতিন সঙ্কেত ঠিক কোথা থেকে আসছে তা খুঁজে বার করবে এই যন্ত্র।

ইসলামাবাদে সার্জেন্টটি বলে উঠল, "স্যার, কথা শেষ।" "ইশ!" মেজর আক্ষেপ করে উঠল।" তিন মিনিট চুয়াল্লিশ সেকেণ্ড—অনেকটা সময় পাওয়া গিয়েছিল—তাও ধরা গেল না!" "কিন্তু সেলফোনটা সুইচ অফ করেনি, স্যার," সার্জেন্ট বলে উঠল।

পেশোয়ার শহরের পুরোনো অংশে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সর্বোচ্চ তলার ফ্ল্যাটে বসে আবদেলাহি তার দ্বিতীয় মারাত্মক ভুলটি করল। আল-কুরকে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে ঝটিতি তার দাদাকে বিদায় জানিয়ে হাতের সেলফোনটা সামনে একটা সোফার কুশনের নিচে ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফোনটাকে সে সুইচ অফ করতে ভুলে গেল....এবং আধ মাইল দূরে কর্নেল রজ্জাকের ডাইরেকশন ফাইণ্ডার অমোঘ গতিতে তার লক্ষ্যবস্তুটির বৈদ্যুতিন সঙ্কেতের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

ব্রিটেনের সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এস.আই.এস.) এবং আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সি.আই.এ.) উভয়েরই পাকিস্তানে বেশ বড় মাপের নানারকম ক্রিয়াকলাপ আছে। এর কারণটা খুবই স্পষ্ট। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, তার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি পাকিস্তান; কারণ পাকিস্তান আতঙ্কবাদী সংস্থাগুলিরও প্রধান ঘাঁটি। এস.আই.এস. এবং সি.আই.এর যুগ্ম ক্রিয়াকর্ম এই ক্ষেত্রে পশ্চিমী মিত্রশক্তির হাত শক্ত করেছে।

এই দুই এজেন্সি যে সর্বদাই মিলেমিশে কাজ করেছে, এমন নয়। ১৯৫১ সালে তিন ইংরেজ বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর—ফিলবি, বার্জেস ও ম্যাকলিন—যখন পরমাণু বোমা তৈরির যাবতীয় তথ্য নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় পালিয়ে গেল, তখন সি.আই.এর তরফ থেকে ব্রিটিশ সংস্থাটির ওপর বিস্তর দোষারোপ ও গালিগালাজ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে আমেরিকানরাও আবিষ্কার করল তাদের দেশেও এমন বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা বিস্তর। ফলে ১৯৬০-এর দশকে দুই সংস্থার মধ্যে ফের সদ্ভাব স্থাপিত হ'ল। ১৯৯১ সালে 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর অবসান ও তার পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মহলে একটা মূর্খ ধারণা তৈরি হ'ল যে এবারে দুনিয়া জুড়ে শান্তি স্থাপিত হবে। ঠিক সেই সময়েই জন্ম নিল নতুন 'ঠাণ্ডা

BanglaBook.org

লড়াই'—ইসলামি সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন মুসলিম দেশের আনাচে কানাচে লুকিয়ে, নীরবে মাথাচাড়া দেওয়া শুরু করল।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর থেকে পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে একটা স্থায়ী বোঝাপড়া হয়ে গেল। সার্বজনীন এক ভয়ঙ্কর শত্রুর মোকাবিলা করতে গেলে অবাধ ও শর্তহীন সহযোগিতা ছাড়া পথ নেই, এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রতিটি পশ্চিমী গুপ্তচর সংস্থাই পরস্পরের সঙ্গে যাবতীয় তথ্য বিনিময় শুরু করল। তবে এদের সকলের মধ্যে গভীরতম সম্পর্ক তৈরি হ'ল আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে।

পেশোয়ারের দুই সংস্থারই প্রধানকে কর্নেল রজ্জাক ভালরকম চিনতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি জেনে গেছেন যে 'লাল পতাকা' মার্কা দেওয়া দুর্বৃত্ত সেলফোনটির উৎপত্তি ব্রিটেনে। সুতরাং তিনি এস.আই.এস.-এর ব্রায়ান ও'ডাউডকে ফোন করে খবরটা দিলেন।

সেলফোনটা সোফার কুশনের নিচে লুকিয়ে ফেলার পরেই আবদেলাহি দেখল যে আল-কুর ঘর থেকে বেরিয়ে তার দিকে না এসে ঘুরে বাথরুমে ঢুকে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বার করে ফের আল-কুরের অ্যাটাচি কেসের ওপর সেটা রেখে দিল। রাখতে গিয়ে দেখল ফোনটা তখন 'অন' অবস্থায় রয়েছে। তার নিজেকে একটু অপরাধী মনে হ'ল। "ইশ্, অনেকটা ব্যাটারি খরচা হয়ে গেল!" এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি ফোনটা সুইচ অফ্ করল। কাজটা তার ঠিক আট সেকেণ্ড আগে করা উচিত ছিল; কারণ এই অতিরিক্ত সময়টুকুর মধ্যে রজ্জাকের ডাইরেকশন ফাইণ্ডার ফোনটার অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ণয় করে ফেলল।

"কি বলছো রজ্জাক?" ও'ডাউড বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলেন। "ফোনটা তুমি 'খুঁজে পেয়ে গেছে' মানে?"

"কোনো সন্দেহই নেই, ব্রায়ান। ফোনটা আছে পুরোনো পাড়ার একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সর্বোচ্চ তলার অ্যাপার্টমেন্টে। আমার দু'জন লোককে আমি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখে আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে রিপোর্ট দেবে কিভাবে এবং কি ক'রে বাড়িটাতে ঢোকা যায়।"

"তাহলে তোমরা কখন ঢুকছো?"

"সন্ধ্যের পরে, একটু অন্ধকার হলেই। ভেবেছিলাম রাত বারোটা নাগাদ অপারেশনটা করব, কিন্তু বলা যায় না, ব্যাটারা যদি পালিয়ে যায়!"

"আমি আসতে পারি?"

"যদি চাও তো...."

"চাই তো বটেই।"

"পরণের পোশাকটা খেয়াল রেখো। ঠিক ছ'টার সময় আমার অফিসে পৌঁছে যেও। কাবুলি শালোয়ার-কামিজ আর পাগড়ি... ফের বলছি।"

কর্নেল রজ্জাক যা বলতে চাইছিলেন তা হ'ল, ও'ডাউড যেন কোট-প্যান্ট না পরে আসে। পুরোনো পেশোয়ারে, বিশেষ করে বাড়িটা যে অঞ্চলে, সেই কিস্সা খাওয়ানি বাজারে পাশ্চাত্য পোশাক বা সামরিক ইউনিফর্ম পরা লোক দেখলেই জনতার নজর তার দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রজ্জাক ও তার লোকজন এবং ও'ডাউডকেও প্রচলিত

BanglaBook.org

পোশাক পরে থাকতে হবে, যাতে কেউ তাদের বিশেষভাবে খেয়াল না করে।

ব্রায়ান ও'ডাউড ছ'টার আগেই রজ্জাকের দপ্তরে পৌঁছে গেল। সে এলো একটা কালো রঙের টয়োটা ল্যাণ্ড ক্রুজার চালিয়ে। গাড়িটার কাচের জানালাগুলোও কালো ফিল্ম দিয়ে ঢাকা। এই মডেলের গাড়িটি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী ও মৌলবাদীদের বিশেষ প্রিয়; পেশোয়ারে এতগুলো ঠিক একই রকম দেখতে টয়েটো ঘুরে বেড়ায় যে ও'ডাউডের গাড়িটার দিকে কারোরই নজর পড়ার সম্ভাবনা নেই। ও'ডাউড সঙ্গে এনেছিল রজ্জাকের জন্য একটা বিশেষ উপহার—শিভাস রিগ্যাল হুইস্কির একটা বড় বোতল, রজ্জাকের খুবই প্রিয় পানীয়।

"আমি নিজেকে একজন যথেষ্ট সৎ ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম বলে বিশ্বাস করি," রজ্জাক বললেন। "কিন্তু ধর্ম নিয়ে আমার কোনো অন্ধ সংস্কার বা উন্মাদনা নেই। ইসলামের বিধান অনুযায়ী শূকর মাংস আমি ছুঁয়েও দেখি না; কিন্তু নাচগান, উৎকৃষ্ট মদ্যপান অথবা উত্তম হাভানা চুরুট উপভোগ করার মধ্যে আমি কোনো পাপ দেখি না। এই সবের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা তালিবানি গোঁড়ামি। পারস্যের খলিফারা বা ভারতের বাদশাহরা সকলেই আঙুর ও বিভিন্ন শস্য থেকে তৈরি মদ পান করতেন, নৃত্যগীত তো উপভোগ করতেন বটেই। তা সত্ত্বেও যদি বেহেশ্‌তের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে এই সব আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিরস্কার করেন, তাহলে আমি নতজানু হয়ে পরম দয়াময় আল্লাহতালার কাছে ক্ষমা চাইব.....তার আগে, তোমাকে দুটো গ্লাস দিচ্ছি; বোতলটার ছিপি খোলো, ওই অমৃত সুধা দু' পেগ করে আমাদের দু'জনের জন্যে ঢালো," রজ্জাক হেসে উঠলেন।

রজ্জাক এক অসাধারণ, উদারমনা মানুষ। একজন ভূতপূর্ব সেনা কম্যাণ্ডার কি করে এমন উচ্চ শ্রেণীর পুলিসম্যান হতে পারে, সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ও'ডাউডের সঙ্গে এইসব কথাবার্তার সময় তাঁর বয়স মাত্রই ছত্রিশ এবং তিনি বিবাহিত ও দুটি সন্তানের পিতা। তিনি স্বদেশে ও ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করেছেন এবং অতীব বুদ্ধিমান। যে কোনো আক্রমণাত্মক অভিযানে তিনি পাগলা হাতির মতো দুড়দাড়িয়ে তেড়ে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করতেন না। বরং তাঁর আক্রমণের ধরনটা গোখরো সাপের মুখোমুখি নেউলের মতো—দ্রুত এবং ক্ষিপ্র। অ্যাপার্টমেন্টটার দখল নিতে হবে, কিন্তু তার জন্য চতুর্দিকে সাড়া ফেলে গোলাগুলির লড়াই চালালে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। সুতরাং তিনি চাইছিলেন নিঃশব্দে, শত্রুকে কিছু জানতে না দিয়ে ঝটিকা আক্রমণ করতে। অপ্রস্তুত শত্রুকে হাতেনাতে ধরা সেক্ষেত্রে সহজ হবে।

পেশোয়ার অত্যন্ত প্রাচীন শহর এবং তার মধ্যেও প্রাচীনতম অঞ্চল হ'ল কিস্‌সা খাওয়ানি বাজার। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে শেরশাহ সুরির তৈরি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পেশোয়ারে এসেই শেষ হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাণিজ্য সম্ভার ও যাত্রীবোঝাই ক্যারাভানের দল এই বাজারে এসে থেমে বিশ্রাম নিত। কারণ এর পরেই সুউচ্চ হিমালয়ের খাইবার পাস দিয়ে তারা যেত আফগানিস্তান। সারা বছর দূরাগত যাত্রীদের ভিড়ে ব্যস্ত কিস্‌সা খাওয়ানি বাজারে মানুষের ব্যবহার্য দরকারি প্রায় সব জিনিসই মিলতো—কম্বল, শাল, কার্পেট থেকে শুরু করে পেতলের নানা শিল্পকর্ম,

BanglaBook.org

তামার বাসন এবং বিভিন্ন রকম খাবার ও পানীয়। এসব জিনিস আজও ওখানে পাওয়া যায়।

কিস্‌সা খাওয়ানি বাজারে কেনাবেচা করতে আসে হরেক জাতির মানুষ। কান পাতলেই শোনা যায় বিভিন্ন ভাষার কথাবার্তা। অভিজ্ঞ চোখ শুধু পাগড়ি বাঁধার রকমফের দেখেই বুঝতে পারে কে পাকিস্তানি আর কে আফ্রিদি, ওয়াজিরি অথবা ঘিলজাইরি। পাগড়ির পাশাপাশি চোখে পড়ে আরও উত্তর দিক থেকে আসা চিত্রল টুপি মাথায় তাজিক এবং পশুলোমের শীত নিরোধক বড় টুপি পরা উজবেক বণিক ও ক্রেতাদের।

অসংখ্য আঁকাবাঁকা সরু গলির গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে চোখে পড়ে হরেক রকমের দোকান আর নানারকম খাবারের বিপণি। প্রথমে ঘড়ি বাজার, তারপরে বাক্‌সা বাজার, চিড়িয়া বাজার, রূপাইয়া বাজার ইত্যাদি পেরিয়ে সব শেষে কিস্‌সা বাজার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার সময় ইংরেজ পেশোয়ারকে "মধ্য এশিয়ার পিকাডিলি" নামে ডাকতো।

যে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সেলফোনের সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল, সেটা একটা সরু গলির মধ্যে। গলিটা দিয়ে একটা গাড়ি কোনোমতে যেতে পারে। বাড়িটা পাঁচতলা। প্রতি তলায় একাধিক ঝুলবারান্দা ও জাফরি কাটা জানালা। একতলায় একটা কার্পেটের গুদাম। রাস্তা থেকে খোলা সিঁড়ি উঠে গেছে একদম মাথায় খোলা ছাদ পর্যন্ত। কর্নেল রজ্জাক তাঁর দলবল নিয়ে চুপিসারে পায়ে হেঁটে বাড়িটার দিকে এগোলেন।

রজ্জাক প্রথমে ঢিলে কুর্তা-শালোয়ার পরিহিত চারজন লোককে বাড়িটা ছাড়িয়ে সামনের দিকে পাঠালেন। তারা তিনটে বাড়ি ছেড়ে চতুর্থ বাড়িটার ছাদে উঠে গেল। বাড়িগুলো সবই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। চারজন কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে টপকে এসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ওপরের ছাদে চলে এলো মিনিট খানেকের মধ্যে। রজ্জাক দু'জন লোককে নিয়ে কার্পেট গুদামের পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। প্রত্যেকের ঢিলে পোশাকের নীচে লুকোনো মেশিন পিস্তল। সবার সামনে রইল এক বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী। তার হাতে একটা দু' ফুট লম্বা মোটা লোহার ডাণ্ডা।

পাঁচতলার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছে রজ্জাক নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। পাঞ্জাবীটি লোহার ডাণ্ডাটা বাগিয়ে ধরে অল্প ছুটে গিয়ে সজোরে দরজার মাঝখানে ধাক্কা মারল। দরজার স্প্রিং লকটা চূর্ণ হয়ে দরজাটা দড়াম করে পুরো খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খোলা মেশিন পিস্তল হাতে বাকিরা তীব্র গতিতে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ছাদ থেকে তিনজন নেমে এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। কেবল একজন ছাদে রইল—যদি কেউ কোনোদিক দিয়ে ছাদে উঠে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে আটকাবে। সবার পেছনে ছিল ব্রায়ান ও'ডাউড। পুরো ঘটনাটা এত দ্রুতগতিতে ঘটল যে পরে সমস্ত ব্যাপারগুলো তার কাছে কিছুটা ঝাপসা, অস্পষ্ট বলে মনে হ'ত—সে আলাদা করে প্রতিটি ঘটনা মনে করতে পারতো না।

ফ্ল্যাটের ভেতরে কি বা কারা আছে, সে সম্পর্কে আক্রমণকারী দলটির কোনো ধারণাই ছিল না। ভেতরে একটা ছোটখাটো সশস্ত্র সেনাবাহিনী থাকতে পারে; অথবা

BanglaBook.org

হয়তো একটা পরিবারের সদস্যরা বসে টিফিন খাচ্ছে! এমন কি ফ্ল্যাটটায় ক'টা ঘর, তার গঠন বা নকশাই বা কি রকম, এ সম্বন্ধেও তাদের কাছে কোনো অগ্রিম খবর ছিল না। তারা শুধু জানতো যে এই ফ্ল্যাটটা থেকে 'লাল পতাকা' সতর্ক সঙ্কেতযুক্ত একটা সেলফোন থেকে একটা কল করা হয়েছে।

বস্তুত তারা ঢুকেই দেখতে পেল চারজন তরুণ বসে টেলিভিশন দেখছে। এক মুহূর্তের জন্য রজ্জাকের ভয় হ'ল তিনি কোনো সম্পূর্ণ নির্দোষ মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছেন না তো? পরক্ষণেই আর সকলের সঙ্গে তিনিও খেয়াল করলেন যে চারটি যুবকেরই মুখে ভারী চাপদাড়ি, চারজনই পার্বত্য উপজাতীয় এবং তাদের মধ্যে একজন নিজের কালো ঢিলে পোশাকের ভেতর থেকে একটা পিস্তল টেনে বার করছে। পর মুহূর্তেই একটা মেশিন পিস্তলের চারটি গুলি নির্ভুল নিশানায় গিয়ে বিঁধল তার বুকে, এবং সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল—মৃত!

এই যুবকটিই আবদেলাহি। এরই নির্বুদ্ধিতার মাশুল গুণতে হ'ল ফ্ল্যাটের চারজন অধিবাসীকে।

আবদেলাহির সাথী তিন তালিবান জঙ্গি কোনো কিছু করার সুযোগই পেল না। মুহূর্তের মধ্যে তাদের মুখ চেপে ধরে মেঝের ওপর ঠেসে চিৎ করে ধরল পাঁচজোড়া বলিষ্ঠ কৌশলী হাত। কর্নেল রজ্জাক খুব স্পষ্ট করেই আগে থেকে বলে রেখেছিলেন—"ভেতরের লোকগুলোকে আমি জ্যান্ত ধরতে চাই, মনে রেখো।"

ইতিমধ্যে পাশে একটা ঘরের দরজা বন্ধ দেখে পাঞ্জাবীটি ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে তার বাহু ও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল। লোকটির শক্তি অসাধারণ। তার এক ধাক্কাতেই দরজাটা কবজা থেকে খুলে সপাটে আছড়ে পড়ল ভেতরে। উদ্যত মেশিন পিস্তল হাতে ধেয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল আর দুই এজেন্ট; তাদের ঠিক পেছনে কর্নেল রজ্জাক নিজে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল এক মধ্যবয়সী আরবী, তার দু'চোখে মিশ্রিত ভয় এবং ঘৃণা। টেরাকোটা টাইল্‌স্‌-এর মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার—বোঝাই যায় যে সে নিজেই ওটাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে আছড়ে ফেলেছে। এক মুহূর্তের জন্যে সে নীচু হ'ল যন্ত্রটাকে তোলার জন্যে। পরমুহূর্তেই পাকিস্তানী এজেন্টদের তার দিকে ধেয়ে আসতে দেখেই সে ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরে ছুটে গেল গরাদহীন খোলা জানালার দিকে। রজ্জাক পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ধরো ওকে!" বলিষ্ঠ পাঞ্জাবীটি ঝটিতি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল আল-কুরের কাঁধ। কিন্তু আল-কুর খালি গায়ে বসে কাজ করছিল। গুমোট গরমে তার ঊর্ধাঙ্গ ঘামে পিচ্ছিল। ফলে পাঞ্জাবীর মুঠো ফসকে গেল। আল-কুর তাকে আর সুযোগ দিল না। সে সোজা ধেয়ে গিয়ে হাইজাম্পারের মতো লাফ দিয়ে জানালার সিল পেরিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চল্লিশ ফুট নীচে পাথুরে রাস্তার ওপর তার দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। হইহই করে রাস্তার লোকজন ছুটে এলো, কিন্তু আল-কায়দার অর্থনৈতিক বিভাগের প্রধান দু'বার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলেই অনন্তলোকের পথে রওনা হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে-বাইরে ততক্ষণে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক জড়ো হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

চেঁচামেচি, ছোটাছুটি করছে ত্রস্ত মানুষেরা। কর্নেল রজ্জাক আগে থাকতেই কিছুটা দূরে দুটো সরকারি কালো ভ্যানে পঞ্চাশ জন ইউনিফর্ম পরা পুলিশকে বসিয়ে রেখেছিলেন। তিনি এইবার তাঁর নিজস্ব মোবাইল ফোনে একটি সংক্ষিপ্ত কল করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল। অবশ্য তাদের উপস্থিতিতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়া দূরে থাক, গোলমাল আরো বেড়ে গেল। তবে যে উদ্দেশ্যে তাদের আনা হ'ল, তা সফল হ'ল। জড়ো হওয়া জনতা কিছুটা পিছিয়ে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলল পুলিশ। সময়মতো বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দা, বাড়িওলা, নিচের কার্পেট বিক্রেতা এবং আশপাশের বেশ কয়েকজন প্রতিবেশীকে ধরে নিয়ে যেতে হবে—কর্নেল রজ্জাক প্রত্যেককে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

ইতিমধ্যে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহটা ঢাকা দিয়ে স্ট্রেচারে চাপিয়ে একটা ভ্যানে তুলে পেশোয়ার জেনারেল হাসপাতালের দিকে রওনা করে দেওয়া হ'ল। তখনও পর্যন্ত কারোরই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই যে মৃত লোকটা কে, কি তার পরিচয়। সে আত্মহত্যাই বা করতে গেল কেন, তাও কারো বোধগম্য হচ্ছিল না সেই মুহূর্তে। তাকে জীবন্ত পাকড়াও করা গেলে নিঃসন্দেহে তাকে আফগানিস্তানের বাগরামে আমেরিকান সেনাঘাঁটিতে চালান করা হ'ত এবং তারপরে তাকে নিয়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সি.আই.এ. প্রধানের বেশ জোরদার একটা দর কষাকষি হ'ত।

কর্নেল রজ্জাক বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকে এলেন। তিনজন তালিবান বন্দীকে পিছমোড়া করে হাতকড়া লাগিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে দেওয়া হ'ল। এই তিন বন্দী ও মৃত তালিবান তরুণের দেহ সশস্ত্র রক্ষীদের সঙ্গে যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নিজের কাজ অবশ্য এইবার শুরু হবে। আত্মঘাতী আরবী ব্যক্তিটির পরিচয় খুঁজে বার করতে হবে। 'লাল পতাকা' সঙ্কেতযুক্ত সেলফোনটা তারই, সন্দেহ নেই। এইবার ফ্ল্যাটের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে—প্রতিটি কাগজের টুকরো পর্যন্ত তুলে নিয়ে পড়তে হবে—তারপর তিন বন্দী, অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ও প্রতিবেশীদের নিঃশব্দে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে সি.টি.সি'র গোপন কার্যালয়ে—সেখানে চলবে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পালা। কিন্তু এই সবের আগে দেখা চাই ল্যাপটপ কম্পিউটারটা....

যতক্ষণ ফ্ল্যাটের ভেতরে অপারেশন চলছিল, ততক্ষণ ব্রায়ান ও'ডাউড সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। এইবার সে ভেতরে ঢুকে তোশিবা ল্যাপটপটা তুলে নিল। রজ্জাকের সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল; দু'জনেরই কাছে স্পষ্ট যে আজকের অভিযানের সবচেয়ে দামী পুরস্কার এই ল্যাপটপটাই।

আত্মঘাতী জঙ্গি ল্যাপটপটা তুলে মেঝেতে আছাড় মেরেছিল এই আশায় যে জোরালো আঘাতের ফলে মেশিনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা যাবতীয় তথ্য ভাণ্ডারেরও আর কেউ হদিশ পাবে না। সে জানতো না যে ফাইলগুলো মুছে দিলেও তার কোনো লাভ হ'ত না। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড দুই দেশেই বেশ কিছু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ আছে যারা ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কটার যাবতীয় তথ্য পেঁয়াজের খোসার মতো স্তরে স্তরে ছাড়িয়ে বার করে নিতে পারে। শুধু তাই নয়—কেনার পর থেকে আজ অবধি যত তথ্য, কথা, ছবি, গান, খেলা—এককথায় যা কিছু যখন হার্ড

BanglaBook.org

ডিস্কে রেকর্ড করা হয়েছে—প্রতিটি জিনিস তারা খুঁজে বার করে নেবে।

"আমাদের এই অজানা বন্ধুটির জন্য করুণা হচ্ছে," ও'ডাউড মন্তব্য করল।

রজ্জাক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। তিনি ভাবছিলেন যে আচমকা এই আক্রমণাত্মক অভিযান চালানোর জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হতে পারে, বিশেষ করে আসল শিকার যেহেতু তিনি জীবন্ত ধরতে পারেননি। কিন্তু তিনি যুক্তিপূর্ণ কাজই করেছেন। এরকম না করে যদি সাদা পোশাকের কয়েকজন এজেন্ট পাঠিয়ে নজর রাখতে বলতেন, তাহলে কোনো কাজই হ'ত না। এই পার্বত্য উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় তাঁর গুপ্তচরদের স্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যেত। না হলেও কোনোভাবে পাখি উড়ে যেতই। ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড! মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য তাঁর হাত থেকে নিশ্চিত শিকার ফসকে গেল।

এখন জনসাধারণের জন্য একটা বিবৃতি তৈরি করতে হবে যে, এক অজ্ঞাত পরিচয় অপরাধী গ্রেপ্তার এড়াতে গিয়ে পাঁচতলা থেকে পড়ে মারা গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ সরকারিভাবে এই বিবৃতিই প্রচার মাধ্যমে পাঠাতে হবে। যদি শেষ অবধি দেখা যায় যে লোকটি আল-কায়দার উচ্চপদে আসীন ছিল, তাহলে তো আর রক্ষা নেই! আমেরিকানরা সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে হাঁকডাক করে সারা দুনিয়ার কাছে প্রচার করবে কিভাবে তাদের জন্যই এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা জঙ্গি মারা পড়ল—অর্থাৎ পুরো কৃতিত্ব তাদেরই। তৌফিক আল-কুর যে ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আল-কায়দাতে তার অবস্থান যে কতখানি উঁচু, সে সম্বন্ধে রজ্জাক এখনও কোনো ধারণাই করতে পারছিলেন না।

"তোমাকে তো এখন বেশ খানিকক্ষণ এখানে আটকে থাকতে হবে," ও'ডাউড বলে উঠল। "ইতিমধ্যে যদি এই ল্যাপটপটা আমি নিরাপদে তোমাদের সদর দপ্তরে পৌঁছে দিই—তোমার আপত্তি আছে?"

আপাতদৃষ্টিতে রজ্জাকের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট গম্ভীর ও রাশভারি ধরনের। কিন্তু এই গাম্ভীর্যের আবরণের তলায় একটি ঈষৎ বক্র কৌতুকপ্রিয়তা লুকিয়ে থাকতো। নৃশংস মৃত্যু, হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংস্রতায় পূর্ণ যে গোপন জগতে তাঁর সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা সেখানে এই হাস্যকৌতুক প্রবণতাই তাঁকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখতো। ও'ডাউডের কথা শুনে তাঁর ঠোঁটের কোণে একটি মৃদু হাসি ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। বিশেষ করে 'নিরাপদে' শব্দটা তাঁর বেশ ভাল লাগল।

'ধন্যবাদ', তিনি বললেন, 'তাহলে আমার বড় উপকার হয়। আপনার সঙ্গে আমি চারজন সশস্ত্র রক্ষীকে পাঠাচ্ছি। ওরা আপনাকে আপনার গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।' ঘরে উপস্থিত অন্যদের জন্য তিনি ও'ডাউডের সঙ্গে নিয়মমাফিক শিষ্ট রীতিতে কথাবার্তা চালালেন। ব্যক্তিগত হৃদ্যতা অধস্তনদের সামনে প্রকাশ না পাওয়াই ভাল।

পরম মূল্যবান সম্পদটি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে ও'ডাউড রাস্তায় পা দিল। তার সামনে পেছনে ও দু'পাশে চারজন সশস্ত্র পুলিশম্যান তাকে পাহারা দিয়ে তার টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার অবধি পৌঁছে দিল। ল্যাপটপের গুপ্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার জন্য যে প্রযুক্তির দরকার, তা ও'ডাউডের গাড়িতেই মজুত ছিল। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে

BanglaBook.org

পেশোয়ারের সীমানার বাইরে একটা নির্জন জায়গায় থামল ও'ডাউড। তারপর তোশিবা ল্যাপটপের মধ্যে একটা তার গুঁজে দিয়ে সেটাকে যুক্ত করে নিল গাড়িতে রাখা অত্যাধুনিক ও উন্নত একটা টেক্রা কম্পিউটারের সঙ্গে। একটা ছোট্ট অথচ ক্ষমতাশালী স্যাটেলাইট ডিশের মাধ্যমে টেক্রা কম্পিউটার থেকে সাইবার তরঙ্গে বার্তা গিয়ে পৌঁছল ইংল্যাণ্ডের কটসওল্ড পার্বত্য অঞ্চলের গভীরে শেলটেনহ্যামে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারের যোগাযোগ কেন্দ্রে।

ও'ডাউড টেক্রা কম্পিউটারে কাজকর্ম চালাতে পারতো বটে, কিন্তু উন্নত সাইবার প্রযুক্তি ব্যাপারটা তার কাছে প্রায় জাদুবিদ্যা বলে মনে হ'ত। এবং সত্যিই প্রায় জাদু কৌশলের দ্বারাই, হাজার হাজার মাইল দূরে শেলটেনহ্যামের সুপার কম্পিউটার মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তোশিবা ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কের যাবতীয় তথ্য নকল করে নিল। ও'ডাউডের মাথায় একটাই তুলনা এলো—একটা মাকড়সা যেন তার জালে আটকানো একটা মাছির জীবনরস শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে দিচ্ছে!

কাজ শেষ হওয়ার কিছু সময় পরেই ব্রায়ান ও'ডাউড সি.টি.সি.'র সদর দপ্তরে যথাযোগ্য লোকের হাতে ল্যাপটপটা জমা করে দিল। ইতিমধ্যেই শেলটেনহ্যাম কেন্দ্র থেকে তোশিবা ল্যাপটপের গুপ্তধনের কপি পৌঁছে গিয়েছে আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড রাজ্যে 'জাতীয় নিরাপত্তা কেন্দ্রে'। তখন পেশোয়ারে গভীর অন্ধকার, কটসওল্ডের শেলটেনহ্যামে সবে সন্ধে হচ্ছে এবং মেরিল্যাণ্ডের ফোর্ট মীডে মধ্য-অপরাহ্ন। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। দুটি সংস্থারই ভেতরে কখনো সূর্যের আলো ঢোকে না; দু' জায়গাতেই দিনও নেই, রাতও নেই।

আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এন.এস.এ.) এবং ব্রিটেনের গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন হেড কোয়ার্টার্স (জি.সি.এইচ.কিউ.) দুটি সংস্থাই দূর গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। কঠোর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঘেরা দুটি কেন্দ্রেরই বিশাল এলাকার মধ্যে নানা মাপের অনেকগুলি বাড়ি। কয়েকশো প্রযুক্তিবিদ ও সাধারণ কর্মচারীদের বাসস্থানগুলি বাদ দিলে বাকি সব ক'টি বাড়ির ভেতরে রাখা আছে জটিল কম্পিউটার চালিত যন্ত্রপাতি। এগুলিতে সদা সর্বদা সারা দুনিয়ার প্রতিটি কোণ থেকে উদ্গত বেতার ও সাইবার তরঙ্গের মাধ্যমে পাঠানো কথাবার্তা শোনা হয় এবং সেগুলি রেকর্ড করা হয়। তারপর প্রতিদিনের এই কয়েক লক্ষ কোটি কথাবার্তা (অন্ততঃ পাঁচশোটি বিভিন্ন ভাষায়) বিশ্লেষণ করে, বাছাই করে, অদরকারি কথা ফেলে দিয়ে, কাজের কথা রেকর্ড করে লাইব্রেরিতে রাখা হয়। তারও পরে দরকার অনুযায়ী বিশেষ কলগুলির উৎস খুঁজে বার করে সেইগুলি যথাযথ বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এই-ই সব নয়। দুটি সংস্থারই আর এক প্রধান কাজ শত শত গোপন ভাষা বা কোডে পাঠানো বার্তাগুলির মর্মোদ্ধার করা এবং সেগুলিকে ফের নিজস্ব কোডে পরিবর্তিত করে ফাইল করে রাখা। এর জন্যে তাদের বিশেষ বিভাগ আছে। সেখানে বিশেষজ্ঞরা হারিয়ে যাওয়া বা লুকোনো ফাইল পুনরুদ্ধার করে সাইবার তরঙ্গের মাধ্যমে যে সব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেগুলিকে আটকানোর ব্যবস্থা নেয়। তৌফিক আল-কুর ভেবেছিল যে তার নিজস্ব ল্যাপটপে বহু ফাইল সে চিরতরে মুছে দিয়েছে, সুতরাং সে সব গোপন তথ্য কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। কিন্তু এন.এস.এ.

BanglaBook.org

এবং জি.সি.এইচ.কিউ.-তে টানা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাজ চালিয়ে বিশেষজ্ঞরা সেই বিস্মৃত ফাইলগুলিও খুঁজে বার করে ফেলল।

বহু প্রাচীন দেওয়াল-চিত্র বা ক্যানভাসে আঁকা ছবি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে এই কাজটার তুলনা চলে। পুনরুদ্ধার বিশেষজ্ঞরা ধীরে ধীরে, অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে স্তরে স্তরে জমে থাকা ময়লা বা রঙ চেঁছে সাফ করে নীচে লুকিয়ে থাকা মূল চিত্রটিকে উন্মুক্ত করেন। তৌফিক আল-কুরের তোশিবার হার্ড ডিস্ক থেকেও একইভাবে অনাবশ্যক জঞ্জাল সরিয়ে একের পর এক এমন সব তথ্য ও দলিল উদ্ধার করা হ'ল, যেগুলি সে চিরতরে লুপ্ত বলেই ধরে নিয়েছিল। আসলে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে কোনো তথ্য একবার ভরা হলে তা আর হারায় না। সেগুলি সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে মাত্র। সেগুলির ওপর পরবর্তী সক্রিয় তথ্যসম্ভার জড়ো হয়। বিশেষ সফ্‌টওয়্যার এবং দক্ষতা ও ধৈর্য সহকারে একের পর এক সব তথ্যগুলি বার করা যায়।

কর্নেল রজ্জাকের সঙ্গে অভিযানে বেরোনোর আগে ব্রায়ান ও'ডাউড স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ইসলামাবাদে তার ঊর্ধ্বতন সহকর্মী তথা 'বস'-কে সতর্ক করে দিয়েছিল। পাকিস্তানে এস.আই.এস.-এর প্রধান এই ব্যক্তিটি সঙ্গে সঙ্গে সে কথাগুলি সি.আই.এর পাকিস্তানি প্রধানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কর্নেল রজ্জাক তাঁর সদর দপ্তরে ফিরলেন রাত বারোটার পর। সঙ্গে চার-পাঁচটা বড় ব্যাগে ভর্তি তথাকথিত 'গুপ্তধন'। বন্দী তিন তালিবান রক্ষী এই বাড়িরই বেসমেন্টের বিশেষ কক্ষে আটক রইল। সাধারণ জেলে তাদের পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। সেখান থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়া বা আত্মহননে মদত দেওয়ার লোকের অভাব নেই। তাদের নাম ও পরিচয় এতক্ষণে ইসলামাবাদে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে এবং নিঃসন্দেহে আমেরিকান দূতাবাসে সি.আই.এর প্রধানের সঙ্গে দর কষাকষিও শুরু হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত ও তিনটে ছেলেকে আমেরিকানরা বাগরাম ক্যাম্পেই নিয়ে যাবে। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জেরা চলবে, যদিও সন্দেহ আছে এরা যথার্থ কাজের কথা কিছু বলতে পারবে না। সত্যি বলতে কি, যে লোকটির দেহরক্ষী হিসেবে এদের নিয়োগ করা হয়েছিল, সে লোকটির নামও এরা জানে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

লীড্‌সে কেনা সেলফোনটার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানা হয়ে গেছে। একথা এখন স্পষ্ট যে বুকে চারখানা বুলেট নিয়ে মর্গের স্ল্যাবে পড়ে থাকা আবদেলাহি কয়েক মিনিটের জন্য ফোনটা শুধু ধার নিয়েছিল—তার জীবনের মর্মান্তিক বোকামি। তার পাশের স্ল্যাবের ব্যক্তিটি চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে মাথা নীচের দিকে করে আছড়ে পড়ায় তার মুখটা খুবই জখম হয়েছিল। পেশোয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্লাস্টিক সার্জন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় মুখটাকে যতটা সম্ভব জোড়া লাগিয়ে তার পুরোনো চেহারায় ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরে মুখটার কয়েকটা ফটো তোলা হয়েছে।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর যতগুলি সংস্থা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে, তাদের প্রত্যেকেরই লাইব্রেরিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ছবির একটা বিশাল সংগ্রহ আছে। সি.টি.সি.ও এর ব্যতিক্রম নয়। পাকিস্তান থেকে মিশর যে অনেকটা দূরে, তাতে কিছু যায় আসে না। আল-কায়দার সক্রিয় কর্মীরা অন্তত চল্লিশটা বিভিন্ন জাতিভুক্ত। প্রতিটি জাতির অন্তর্ভুক্ত উপজাতিগুলোকে ধরলে সংখ্যাটা একশোয় গিয়ে

BanglaBook.org

পৌঁছবে। এই আতঙ্কবাদীরা প্রত্যেকেই সর্বদা দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় আল-কায়দার বিভিন্ন কাজে। কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও বিভিন্ন দেশের গুপ্ত সংস্থাগুলি এই সব লোকগুলোর ফটো তুলে রাখে।

রজ্জাক সারারাত ধরে তাঁর কম্পিউটারে একটার পর একটা সি ডি ঢুকিয়ে এইসব পুরোনো বা সন্দেহভাজন অপরাধীদের ছবি দেখে যাচ্ছিলেন। বারবারই কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসছিল একটা বিশেষ ছবিতেই। ছবিটার বড় প্রিন্ট কপি তাঁর টেবিলে; আর কম্পিউটারের ছবির বড় কপি দেওয়ালে লাগানো মস্ত প্লাজমা টিভির পর্দায়। বেশ কয়েকবার এবং বেশ খানিকক্ষণ দেখার পরে রজ্জাক তাঁর উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারলেন না।

রজ্জাকের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত সেলফোনে যখন কলটা এলো, তখন সকাল হয়ে গেছে—ব্রায়ান ও'ডাউড তার সি.আই.এ. সহকর্মীর সঙ্গে প্রাতঃরাশ খাচ্ছিল। রজ্জাকের কথা শুনেই দু'জনে তাদের টোস্ট ওমলেট ফেলে দৌড়াল সি.টি.সির সদর দপ্তরের দিকে। সেখানে তারা দু'জনেও অনেকক্ষণ ধরে মর্গ থেকে আসা ছবিটার সঙ্গে কম্পিউটারের ছবিটা মিলিয়ে দেখল। তিনজনেরই মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরতে লাগল—আমরা যা ভাবছি, সেটা ঠিক তো? যদি সত্যি হয়....তিন জনই কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের নিজের সদর দপ্তরে জানিয়ে দিল তাদের এই দুর্দান্ত আবিষ্কারটির কথা—মর্গে পড়ে থাকা আত্মঘাতী ব্যক্তিটি আরবী নয়, মিশরীয়—স্বয়ং তৌফিক আল-কুর, আল-কায়দার অর্থনৈতিক ও হিসাব সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান!

সকাল ৯টার সময় একটা পাকিস্তানি সামরিক হেলিকপ্টার এসে পৌঁছল। হাতকড়া বাঁধা ও মাথা-মুখ ঢাকা তিনজন বন্দী, দুটি মৃতদেহ এবং ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি উড়ে গেল। ভারপ্রাপ্ত সেনা অফিসার রজ্জাককে প্রচুর প্রশংসা ও অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু পুরো ব্যাপারটি এবার রজ্জাকের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেল। ঘটনাটা ঘটেছে পেশোয়ারে বটে, কিন্তু বিষয়টার সামগ্রিক গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। তার ভরকেন্দ্র ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদ থেকেও সরে গেছে মেরিল্যাণ্ডের ফোর্ট মীড-এ।

১১ই সেপ্টেম্বরের বিপর্যয়ের পরে একটা কথা সব দেশের সরকারের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আল-কায়দা কি করতে চলেছে তার গোপন খবর, এমন কি প্রমাণ পর্যন্ত, গুপ্তচর সংস্থাগুলির কাছে মজুত ছিল। অবশ্যই একটি মাত্র সংস্থায় সাজিয়ে গুছিয়ে, সুদৃশ্য উপহারের বাক্সে ঢুকিয়ে কেউ সে সব পৌঁছে দেয়নি। খবরগুলো ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বিভিন্ন সংস্থায়, কোথাও বেশি কোথাও কম। খোদ আমেরিকার উনিশটি গুপ্তচর ও গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে অন্তত আটটির কাছে তাদের নিজ নিজ এজেন্টদের থেকে পাওয়া টুকরো টুকরো বার্তা ও প্রমাণ যথেষ্ট আগে থাকতেই ছিল। কিন্তু এই সংস্থাগুলি কেউই পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতো না, ফলে সবগুলো টুকরোকে জোড়া দিয়ে একটা সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করার কোনো চেষ্টাই হয়নি।

'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস ও পেন্টাগন আক্রান্ত হওয়ার পরে এই সব ক'টি সংস্থার কাজকর্ম নিয়ে একটা বিশাল নাড়াচাড়া হ'ল। তার ফলে নির্দিষ্ট নিয়ম জারি হয়ে গেল

যে, যাই খবর হোক না কেন, ছ'টি প্রধান বিভাগে তা যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্যে চারটি বিভাগের শীর্ষে থাকেন চার রাজনীতিক ঃ প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দুই সেক্রেটারি (মন্ত্রী)। বাকি দু'জন পেশাদার। একজন স্টিভ হ্যাডলি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটি (এন.এস.সি.) অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তা সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি উপরোক্ত উনিশটি সংস্থা এবং দেশের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। ষষ্ঠজনের স্থান সবার উপরে, বস্তুত রাষ্ট্রপতির পরেই—জন নিগ্রোপন্টে, ডাইরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স। ইনি জাতীয় স্তরে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা এই তিনটি বিভাগেরই যাবতীয় তথ্য ও বার্তার ভারপ্রাপ্ত প্রধান। সোজা কথায়, সামরিক, অসামরিক ও রাজনৈতিক সমস্ত বিষয়ে তাঁর কর্তৃত্ব শতকরা একশো ভাগ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে তথ্য সংগ্রহ ও সে বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এখনও সি.আই.এর আছে, কিন্তু সি.আই.এর প্রধান এখন আর একা সব খবর ও তথ্য নিজের কুক্ষিগত করে রাখতে পারেন না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত ব্যাপারেই বিবৃতি পাঠানো এখন প্রত্যেকটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে বাধ্যতামূলক। নীতি একটাই—পারস্পরিক সহযোগিতা।

সব গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তম হ'ল ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা সংক্ষেপে এন.এস.এ.। মেরিল্যাণ্ডে ফোর্ট মীড-এ এদের কার্যালয়টি সর্ববৃহৎ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও বাজেটের দিক দিয়েও এই সংস্থাটিই আমেরিকার সবচেয়ে বড় তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা। কিন্তু এন.এস.এর গণপ্রচার প্রায় নেই বললেই চলে। এর সমস্ত কাজই হয় অতি গোপনে ও সন্তর্পণে। কোনো প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে এন.এস.এর বিন্দুমাত্রও যোগাযোগ নেই। আজকে যোগাযোগ মাধ্যমের বিপ্লবের দিনে এত বড় সংস্থাটি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে এক অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু এর চোখ ও কান সদা সর্বদা জাগ্রত। দুনিয়ার প্রতিটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাতায়াতকারীর প্রতিটি কথা এখানে শোনা হয়, প্রতিটি সঙ্কেত বাক্য ও সাঙ্কেতিক ভাষার মর্ম উদ্ধার করা হয়, প্রতিটি তথ্য ও বার্তা পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু এন.এস.এর ভাণ্ডারে বদ্ধ এই সমস্ত তথ্য সঠিক বিচার ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটি বহিরাগত কমিটির প্রয়োজন হয়। এই কমিটিগুলির সদস্যেরা প্রত্যেকেই কোনো একটি দুর্বোধ্য বিষয়ে সুপণ্ডিত। এই রকমই একটি কমিটি হ'ল 'কোরান কমিটি'।

পেশোয়ারে উদ্ধার হওয়া সমস্ত তথ্য ও কাগজপত্র এসে পৌঁছানোর পরে অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সেগুলির ওপর কাজ শুরু করল। সেই মুহূর্তে সবচেয়ে দরকারি কাজ আত্মঘাতী মৃত ব্যক্তিটির পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এ কাজটা দেওয়া হ'ল এফ.বি.আই.-কে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যুরো লিখিত রিপোর্ট দিল যে কর্নেল রজ্জাক যা বলেছেন তাই ঠিক। মৃত লোকটি নিশ্চিতভাবেই তৌফিক আল-কুর—আল-কায়দার প্রধান অর্থ সংগ্রাহক এবং ওসামা বিন-লাদেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ওসামার ডান হাত আর এক মিশরীয় আয়মান আল-জোয়াহিরি তাকে আল-কায়দাতে ঢুকিয়েছিল।

মোট এগারোটা পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল। আমেরিকান স্বরাষ্ট্র দপ্তর সেগুলি

BanglaBook.org

পরীক্ষা করে দেখার ভার নিল। দুটো পাসপোর্ট একেবারে নতুন, ব্যবহার করা হয়নি। বাকি ন'টার প্রত্যেকটাতেই ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রবেশ ও প্রস্থান স্ট্যাম্প বেশ কয়েকটা করে মারা রয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই ছ'টা পাসপোর্ট বেলজিয়ামের—প্রতিটাই আলাদা নামে এবং প্রতিটাই আসল, শুধু ভেতরের খুঁটিনাটি তথ্যগুলো নানারকম বানানো।

আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বেলজিয়ামকে 'ফুটো বালতি' নামে অভিহিত করে থাকে। ১৯৯০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে উনিশ হাজার ফাঁকা পাসপোর্ট বেলজিয়ান সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর ও বিভিন্ন দূতাবাস থেকে চুরি হয়ে গেছে! বস্তুত এই পাসপোর্টগুলো সবই সরকারি আমলা এবং বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মীরা মোটা ঘুষের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। মাত্র পঁয়ষট্টিটা পাসপোর্ট কোথা থেকে বেরিয়েছিল তা খুঁজে বার করা গেছে—পঁয়তাল্লিশটা ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ শহরের কনসালেট থেকে বেরিয়েছিল, এবং কুড়িটা হল্যাণ্ডের দ্য হেগ শহরের দূতাবাস থেকে বিক্রি হয়েছিল। তালিবান বিরোধী যোদ্ধা আহমদ শাহ্ মাসুদকে যে দু'জন মরক্কোবাসী আততায়ী হত্যা করেছিল, তাদের পাসপোর্ট দুটো ছিল এই কুড়িটার মধ্যে। আল-কুর যে ছ'টা বেলজিয়ান পাসপোর্ট ব্যবহার করেছিল, তার মধ্যে দেখা গেল এই কুড়িটার মধ্যে একটা। বাকি পাঁচটা কোথা থেকে আল-কায়দার ভাণ্ডারে পৌঁছেছিল তা কেউ জানে না, তবে মনে হয় যে ১৮,৯৩৫টির কোনো হিসেব নেই, তারই মধ্যে হবে।

এইবার আসরে নামল আমেরিকান সরকারের আন্তর্জাতিক বিমান-উড়ান মস্ত্রক। সারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং উড়ান প্রশাসনগুলিতে প্রভাব খাটিয়ে প্রতিটি উড়ানের যাত্রী তালিকা এবং টিকিট পরীক্ষা করা শুরু হ'ল। কাজটা অতীব ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে সন্দেহ নেই, তবে আল-কুরের পাসপোর্টগুলোর প্রবেশ এবং প্রস্থান স্ট্যাম্পগুলো দেখে নিয়ে বিশেষ করে সেই উড়ানগুলোই নিরীক্ষণ করতে লাগল মন্ত্রকের এজেন্টরা।

ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই একটা ছক বেরিয়ে এলো। বোঝা গেল যে তৌফিক আল-কুরকে বিভিন্ন দেশ ঘুরে আল-কায়দার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে একটা বিশাল তহবিল তৈরি করার ভার দেওয়া হয়েছিল—খুব সম্ভবত বেশ কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য। কিন্তু কি সেই সব জিনিস? কেন কেনা হচ্ছে? আল-কুর নিজে কিছু কিনেছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তার মানে, সংগ্রহ করা অর্থ সে অন্যান্য হাতে চালান করছিল এবং কেনাকাটা তারাই করছিল। ঠিক কোন কোন লোকের সঙ্গে আল-কুর দেখা করেছিল তা যদি জানা যেত! ওই নামগুলো খোঁজ সঠিক বোঝা যেত সারা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আল-কায়দা কি রকম গোপন জাল বিস্তার করছে। তৌফিক আল-কুর অনেকগুলি দেশ ঘুরেছে গত দু-তিন বছরে কেবল একটি মাত্র দেশে সে কখনো যায়নি, সেটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

সব তথ্য এসে শেষ অবধি জড়ো হ'ল ফোর্ট মীড-এ এন.এস.এর দপ্তরে। পেশোয়ারে পাওয়া তোশিবা ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক থেকে মোট তিয়াত্তরটি ডক্যুমেন্ট সংগ্রহ করা গিয়েছিল। তার মধ্যে কতকগুলো বিভিন্ন বিমান কোম্পানির টাইমটেবল্। এগুলোর থেকে ঠিকঠাক জানা গেল আল-কুর কোন্ উড়ানে কবে কোথায় গিয়েছিল।

BanglaBook.org

আরও বেশ কিছু সরকারি বেসরকারি সংস্থার বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট। কোনো বিশেষ কারণে আল-কুর এগুলি ডাউনলোড করে রেখেছিল। কিন্তু এগুলোর থেকে কোনো সূত্রই বার করা গেল না।

অধিকাংশ তথ্যপঞ্জী ইংরেজিতে, কিছু ফরাসি ও জার্মান ভাষায়। আল-কুর তার মাতৃভাষা আরবী ছাড়া এই তিনটি ইউরোপীয় ভাষাতেই অনর্গল লিখতে, পড়তে এবং কথা বলতে পারতো। বাগরাম সেনা ঘাঁটিতে বন্দী তিন তালিবান রক্ষীর কাছ থেকে জানা গেল যে আল-কুর ভাঙা ভাঙা পুশতু বলতে পারত। তার মানে সে কিছুকাল আফগানিস্তানে ছিল, যদিও কবে বা কোথায় ছিল সে ব্যাপারে কিছু বলা গেল না।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলির আগ্রহ জাগিয়ে তুলল বেশ কয়েকটি আরবী ভাষার দলিল ও তথ্যপঞ্জী। এন.এস.এ. স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হলেও প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীন। তাদের দপ্তর যেখানে, সেই ফোর্ট মীড মূলত একটি বিশাল সেনাঘাঁটি। এই কারণে এন.এস.এর প্রধান কর্মকর্তা পদে সর্বদাই কোনো এক উচ্চপদস্থ সেনা-জেনারেলকে নিযুক্ত করা হয়। এন.এস.এর আরবী-ইংরেজি অনুবাদ বিভাগের প্রধান অনুবাদক শেষ পর্যন্ত এই জেনারেলের দ্বারস্থ হলেন। জেনারেলের সহায়তা ব্যতিরেকে আল-কুরের কম্পিউটারের আরবী পাঠ্যাংশগুলির সঠিক মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না।

১৯৯০-এর দশক জুড়েই এন.এস.এর আরবী বিভাগের আয়তন ক্রমশ বাড়ছিল। এর কারণ দ্বিবিধ—একদিকে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন ক্রমাগত সংঘর্ষ, অন্যদিকে ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের দ্রুত বৃদ্ধি। ১৯৯৩ সালে রামজি ইউসুফ নামে এক জঙ্গি যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নীচের তলায় বিস্ফোরক বোঝাই একটা ট্রাক ঢুকিয়ে দিয়ে আক্রমণ চালাল, তখনই আরবী ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম বেড়ে গেল। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে আমেরিকান ও ব্রিটিশ উভয় সরকারের তরফ থেকে তাদের সবক'টি গুপ্ত সংস্থার কাছে জরুরি নির্দেশ গেল—'আরবী ভাষায় প্রত্যেকটি দিন বৈদ্যুতিন ও ছাপার মাধ্যমে যা কিছু কথাবার্তা হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও তথ্য আমরা জানতে চাই।' ফলত এন.এস.এর আরবী বিভাগটি খুব তাড়াতাড়ি এক বিশাল আকার ধারণ করল। এই বিভাগে কাজ করে কয়েক হাজার আরবী-ইংরেজি অনুবাদক, যাদের বেশিরভাগই জন্মসূত্রে আরব এবং আরবী মাধ্যমের স্কুলে শিক্ষিত।

আরবীকে একটি মাত্র ভাষা ভাবাটা ভুল। কোরান এবং সাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত ধ্রুপদী আরবী সাধারণ মানুষের কথ্য বা লেখ্য ভাষা নয়। প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক সারা পৃথিবীতে অন্তত পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় কথা বলে থাকে; তাদের শব্দের ব্যবহার, উচ্চারণ ইত্যাদি সবই আলাদা। বিশেষত যদি কেউ দ্রুত কথা বলে এবং তার বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অঞ্চলভেদে আলাদা রকম হয়, তাহলে আরবের সেই অঞ্চলেই জন্মকর্ম এরকম অনুবাদক ব্যতীত কেউ প্রতিটি কথার সঠিক অর্থ বা সূক্ষ্ম তারতম্য ধরতেই পারবে না।

BanglaBook.org

তাছাড়া আরবী অতীব অলঙ্কারবহুল ভাষা। যে কোনো সাধারণ আরবী ভাষীর কথাতেও প্রচুর পরিমাণে উপমা, তোষামোদ, অতিরঞ্জন এবং চিত্রকল্পের ব্যবহার থাকে। এর সঙ্গে আবার যোগ হয় নানা শব্দ উহ্য রেখে কথা বলার প্রবণতা। অনেক কথা খোলাখুলি উচ্চারণ করে বলা হয় না, তার ফলে বাক্যের অর্থ বুঝে নিতে হয়।

বহু শব্দের মানে আবার ক্ষেত্রবিশেষে পাল্টে যায়। প্রাচ্যের অনেক ভাষার মতোই আরবীর সঙ্গেও ইংরেজির মূল তফাৎ এইখানে। ইংরেজিতে সাধারণত একটি শব্দের একটিই অর্থ; আরবীতে অধিকাংশ শব্দই নানার্থক।

"কম্পিউটার থেকে পাওয়া শেষ দুটো ডকুমেন্টই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে", প্রধান অনুবাদক বললেন জেনারেলকে। "মনে হচ্ছে দুটো এসেছে আলাদা দুটো জায়গা থেকে। প্রথমটা এসেছে সম্ভবত স্বয়ং আয়মান আল-জাওয়াহিরির কাছ থেকে; অন্যটা আল-কুরের নিজের। আমরা আল-জাওয়াহিরির অনেকগুলো বক্তৃতা এবং ভিডিও রেকর্ডিং ভালভাবে নিরীক্ষণ করেছি। শব্দের ব্যবহার ও বাক্যের গঠন একই রকম। মুশকিল হচ্ছে যে দুটোই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট—সাউণ্ড থাকলে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়া যেত।

প্রথম ই-মেলটার উত্তর হ'ল শেষ ডকুমেন্টটা, মনে হচ্ছে আল-কুর নিজেই লিখেছে। কিন্তু আল-কুরের আরবী লেখার কোনো নমুনা আমাদের কাছে নেই। আল-কুর পেশায় ব্যাঙ্কার, প্রধানত ইংরেজিতেই সব রকম লেখালেখি করতো।"

"কিন্তু দুটো ডকুমেন্টেই বারবার কোরানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে; কোরান থেকে একাধিক উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। দু'জনেই কিছু একটা ব্যাপারে বারবার আল্লার আশীর্বাদ কামনা করেছে। আমার অধীনে একাধিক আরবী ভাষাবিদ ও পণ্ডিত আছেন। কিন্তু আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে লেখা কোরানের ভাষা এবং তার সূক্ষ্ম অর্থ উদ্ধার করা শক্ত। আমার মনে হয় কোরান কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার, তাঁরা এ দুটো ডকুমেন্ট পরীক্ষা করে দেখুন।"

সব শুনে জেনারেল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর বললেন, "ঠিক আছে প্রফেসর, আপনি যা চাইছেন, তাই হবে।" তাঁর প্রধান সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোরান কমিটির বিশেষজ্ঞদের ধরো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে আনার ব্যবস্থা করো। কোনোমতে দেরি বা কোনো অজুহাত চলবে না।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

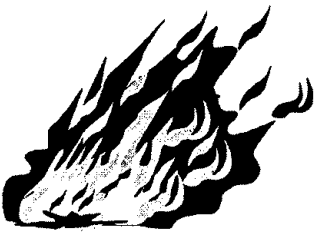

কোরান কমিটির সদস্য চারজন—তিনজন আমেরিকান, একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ। চারজনই পেশায় অধ্যাপক। কেউই আরবের না হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবন কোরান ও তার হাজার হাজার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সব ব্যাখ্যার ওপর গবেষণা করাই তাদের প্রধান কাজ।

একজন নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক অধ্যাপক। ফোর্ট মীড থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার গিয়ে তাকে এন.এস.এ.-তে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে যথাক্রমে র‍্যাণ্ড কর্পোরেশন ও ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যুক্ত। আমেরিকান সেনাবাহিনীর দুটি মোটরগাড়ি তাদের নিয়ে এন.এস.এ-তে হাজির করল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে।

চতুর্থ জন ডক্টর টেরি মার্টিন বয়সে সবার ছোট। লণ্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপক, সেই সময়ে ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর, অর্থাৎ পরিদর্শী অনাবাসিক গবেষক অধ্যাপক। আরবী সাহিত্য, ধর্মীয় গ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ের গবেষক হিসেবে মার্টিনের খ্যাতি যথেষ্ট।

এই বিষয়ে অন্য তিনজনের তুলনায় টেরি মার্টিন ছোটবেলা থেকেই কিছু সুবিধা উপভোগ করেছিল। তার বাবা ছিলেন একটি নামজাদা পেট্রোলিয়াম সংস্থার অন্যতম প্রধান হিসাবরক্ষক। তৈল সংস্থাটি বহুদিন ধরেই ইরাকে কাজকর্ম চালাচ্ছিল এবং মিঃ মার্টিন সে কারণে বেশ কয়েক বছর যাবৎ বাগদাদে সপরিবারে বসবাস করছিলেন। তিনি টেরিকে ইচ্ছে করেই অ্যাংলো-আমেরিকান স্কুলে না পাঠিয়ে একটি বিশেষ প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এই স্কুলটিতে পড়তো প্রধানত ইরাকি সমাজের এলিট শ্রেণীর ছেলেরা। মাত্র দশ বছর বয়সের মধ্যেই দেখা গেল টেরি মাতৃভাষার মতোই অনর্গল ও স্বচ্ছন্দভাবে আরবী বলতে-পড়তে-লিখতে পারছে। শুধু তার ফর্সা রঙ, গোলাপী ঠোঁট এবং ঈষৎ হলদেটে চুল দেখে বোঝা যেত সে আরবের নয়।

১৯৭৬ সালে, টেরির বয়স যখন এগারো, তখন মিঃ মার্টিন তাঁর জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। ইরাক তখন পশ্চিমী বিদেশীদের জন্য আর বিশেষ নিরাপদ নয়। বাথ পার্টি তখন ইরাকি সরকারের সর্বময় কর্তা। রাষ্ট্রপতি আবু বক্‌র প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ বললেই চলে। আসল ক্ষমতা সবই উপরাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেনের কুক্ষিগত। এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে নিয়ম করে তার তথাকথিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শত্রুদের হত্যা করা শুরু করেছিল। চিহ্নিত লোকটি

BanglaBook.org

আদতে শত্রু কিনা তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণের পরোয়া যেন করে না—তার মতে ওই লোকটা তার শত্রু, ওকে খতম করে দাও!

মার্টিন পরিবার প্রায় তিন দশক ধরে ইরাক প্রবাসী। এই সময়ের মধ্যে তারা নানা উত্থান পতনের সাক্ষী। মিঃ মার্টিন প্রথম এসেছিলেন পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। ইরাকে তখন রাজতন্ত্র, সিংহাসনে বালক নৃপতি ফৈজল। ইরাকে তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া বইছে। এর পরেই শুরু হ'ল নৃশংস ধারাবাহিক রক্তপাত, প্রথমেই আততায়ীর হাতে খুন হ'ল রাজা ফৈজল ও তার পশ্চিমপন্থী প্রধানমন্ত্রী নূরি সঈদ। তার পরে টিভি স্টুডিওর মধ্যে ক্যামেরার সামনে কুপিয়ে খুন করা হ'ল ফৈজল-পরবর্তী শাসক জেনারেল কাসিমকে। কাসিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'ল পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান 'বাথ' পার্টি। প্রাথমিকভাবে ক্ষমতা দখল করলেও তাদের শাসন বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না। কিন্তু বাথ পার্টিকে দমিয়ে রাখা গেল না। গোপনে শক্তি সঞ্চয় করে ১৯৬৮ সালে তারা ফের ক্ষমতায় ফেরত এলো। সেই থেকে সাত বছর ধরে মিঃ মার্টিন দেখে গেলেন কিভাবে ইরাকের বিকৃত মস্তিষ্ক, নির্দয় উপরাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেন ক্রমাগত ক্ষমতা সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারী শাসকে পরিণত হ'ল। ১৯৭৫ সালে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন—ঢের হয়েছে, আর ইরাকে নয়, ফিরে চলো গ্রেট ব্রিটেনে।

তাঁর বড় ছেলে মাইকেল বা সংক্ষেপে মাইক-এর বয়স তখন তেরো। একটি নামজাদা, উৎকৃষ্ট ব্রিটিশ বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হতে তার অসুবিধা হ'ল না। মিঃ মার্টিন লণ্ডনে বার্মা শেল কোম্পানিতে উচ্চপদে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে মিঃ ডেনিস থ্যাচার নামে তাঁর এক শুভার্থী তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। মিঃ থ্যাচারের স্ত্রী মার্গারেট এর কিছুদিন আগেই কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ক্রিসমাসের কিছুদিন আগে মিঃ ও মিসেস মার্টিন তাঁদের দুই ছেলে মাইক ও টেরি সহ লণ্ডনে পৌঁছে গেলেন।

দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট টেরি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। সে কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের ক্লাসের পড়া শেষ করে ফেলল। তার পরে তার থেকে দু' তিন ক্লাস উঁচুতে পড়া ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তাদের পরীক্ষাগুলো এত সহজে পাস করল, যেন মাখনের মধ্যে দিয়ে ধারালো ছুরি চলছে! একের পর এক ছাত্রবৃত্তি ও মেধা পুরস্কার নিতে গিয়ে সে যখন সিনিয়র স্কুল পাস করল, তখন সবাই ধরেই নিল যে টেরি এইবার নির্ঘাত অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে তার উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল টেরির অভিপ্রায় অন্য। সে আরবী ভাষা এবং সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে লেখাপড়া চালাতে চায়। তার জন্ম ইরাকে এবং আরবীতে সে তার মাতৃভাষার মতোই সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। হাইস্কুলের শেষ বছরে সে 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' (এস.ও.এ.এস.)-এ স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদন পাঠিয়ে দিয়েছিল। ১৯৮৩ সালে ভর্তির পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে 'ফল' বা শরৎকালীন টার্মে সে স্নাতক শ্রেণীর প্রথম বছরের পড়াশোনা শুরু করল—তার 'মেজর' বা প্রধান

BanglaBook.org

পাঠ্য বিষয় হ'ল 'মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস'।

তিন বছরে প্রথম শ্রেণীর গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে পাস করার পরে টেরি মার্টিন আরো তিন বছর কোরান এবং বাগদাদের খলিফা শাসনতন্ত্রের ওপর গবেষণা চালিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করল। এরপরে আরো এক বছর কায়রোতে বিখ্যাত আল-আজহার ইনস্টিটিউটে কোরান সম্বন্ধীয় পড়াশোনা করে ইংল্যাণ্ডে ফিরতেই এস.ও.এ.এস. তাকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করল। তখন তার বয়স মাত্র পঁচিশ। এস.ও.এ.এস.-এর অধ্যাপক নির্বাচন পদ্ধতি কঠিন। সুতরাং বলাই বাহুল্য আরবী অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে টেরি মার্টিন এই অল্প বয়সেই যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিত পেল। চৌত্রিশ বছর বয়সে সে উন্নীত হ'ল রীডার পদে এবং চল্লিশ বছর বয়সে গবেষক প্রফেসর। এন.এস.এ. সে সময় তাকে আল-কুরের ল্যাপটপে পাওয়া আরবী তথ্যাদি বিশ্লেষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল, তখন তার বয়স একচল্লিশ। ২০০৬ সালের সেই সময়ে সে এক বছরের জন্য জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাবাসিক পরিদর্শী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত।

টেরি মার্টিনকে ফোর্ট মীডে নিয়ে আসার জন্য এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জর্জটাউনে পৌঁছে দেখলেন টেরি মার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হলে 'কোরানের শিক্ষা ও আধুনিক যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে বক্তৃতারত।

এন.এস.এর প্রতিনিধি মঞ্চের উইংস থেকে ছাত্রছাত্রীতে ঠাসা হলের উপর একনজরে চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন যে ছাত্রমহলে টেরি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তার বক্তৃতা দেওয়ার ধরন অতীব সহজ ও স্বচ্ছন্দ, কোনো গম্ভীর বোলচাল নেই, বরং শুনে মনে হয় সমমর্যাদাসম্পন্ন কিছু মানুষ পরস্পরের মধ্যে একটি সভ্য ও শিষ্ট ভঙ্গীতে কিছু আলোচনা করছেন। বিষয়বস্তু তার কণ্ঠস্থ, বই বা নোটস্ দেখার দরকার প্রায় হয়ই না। স্যুটের কোট খুলে চেয়ারের ওপর রাখা, শার্টের হাতা কিছুটা গুটানো—মোটাসোটা খর্বকায় টেরি মার্টিন পায়চারি করতে করতে কথা বলছিল। তার চোখমুখ, শারীরভঙ্গি, বাচনশৈলী সব কিছুর থেকে যেন একটা পরম উৎসাহ ও আগ্রহের দীপ্তি নির্গত হচ্ছিল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে তার সমস্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞান তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে তৈরি। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে যে কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সেটিকে এড়িয়ে না গিয়ে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করছিল টেরি—কোনো শ্রোতা বুঝতে না পারলে, বা বোকার মতো কথা বললে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা তার ধাতে নেই। সে পণ্ডিতি ফলায় না, বা দুর্বোধ্য শব্দও ব্যবহার করে না। বরং তার সর্বদাই চেষ্টা ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে কাছে নিয়ে আসা, যাতে তারা বেশি করে প্রশ্ন উত্থাপন করে, আর এই সওয়াল জবাবের মধ্যে দিয়ে তার বক্তৃতার বিষয়টি আরো বেশি করে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। ফোর্ট মীডের প্রতিনিধি যখন মঞ্চের উইংসে পৌঁছলেন, তখন প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হয়ে গেছে।

পঞ্চম সারির একটি আসন থেকে লাল শার্ট পরিহিত একটি ছেলে হাত তুলল ঃ "প্রফেসর, আপনি বললেন যে সন্ত্রাসবাদীদের জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে তাদের 'মৌলবাদী'

BanglaBook.org

নামে অভিহিত করতে আপনার আপত্তি আছে। কেন?"

আল-কায়দার আক্রমণে নিউইয়র্কের জোড়া টাওয়ার ধ্বংস হওয়া ইস্তক কোরান ও ইসলামি সব রকম ব্যাপার নিয়ে আমেরিকায় বইপত্র, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ইত্যাদিতে প্রচার ও আলোচনার এমন প্রবল ঝড় বইতে শুরু করেছে যে তাত্ত্বিক আলোচনার সময়েও সর্বত্র পশ্চিমী দেশগুলির ওপর ক্রমান্বয়ে ঘটে চলা আতঙ্কবাদী আক্রমণ ও কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। টেরি মার্টিন এই প্রশ্নটাও সহজভাবে সরাসরি উত্তর দিল ঃ

"কারণ নামটা ভুল। 'মৌল' কথাটি এসেছে 'মূল' শব্দটি থেকে। অর্থাৎ মৌলবাদ মানে মূলের দিকে ফিরে যাওয়ার মতবাদ। কিন্তু যারা ট্রেনে, বাসে, বাজারে বোমা ফাটিয়ে নিরপরাধ সাধারণ মানুষদের মারছে, তারা ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতির প্রতি কোনোরকম ভক্তি বা ভালবাসা দেখাচ্ছে না। তারা নিজেরাই নিজেদের মতো করে কোরানের কিছু কিছু অংশের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা দিচ্ছে, প্রমাণ করতে চাইছে যে তাদের তথাকথিত লড়াই কোরান দ্বারা সমর্থিত এবং সেই কারণে ন্যায্য ও নীতিশীল।

"পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মেই মৌলবাদীদের দেখা পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর খ্রিস্টান সাধু আছেন, যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। তাঁরা কঠোর শপথ নিয়ে চরম দারিদ্র্য, আত্মত্যাগ ও ব্রহ্মচর্যের জীবন কাটান—এঁরা মৌলবাদী। সংসারত্যাগী, সমাজত্যাগী সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুরা সব ধর্মেই আছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই নির্বিচারে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের গণহত্যায় প্রশ্রয় দেন না। এখানে আসল বিচার্য শব্দটি হ'ল 'মূল'। সমস্ত ধর্ম এবং সেই ধর্মগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এই শব্দটির ভিত্তিতে বিচার করো তোমরা—দেখবে যে মৌলিক শিক্ষা ও নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলার প্রবণতাই 'মৌলবাদ', কিন্তু তা কখনোই আতঙ্কবাদ বা সন্ত্রাসবাদ নয়। পৃথিবীর কোনো ধর্মেই—ইসলামেও—মৌল নীতিগুলি কোনভাবেই গণহত্যার ওকালতি করে না।"

এন.এস.এর প্রতিনিধিটি এবারে একটু অধৈর্য হয়েই টেরি মার্টিনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। টেরি উইংসের দিকে তাকাতে সে হাতের ঘড়িটা তুলে ধরে তাতে টোকা মারল। টেরি তার মধ্যেই লক্ষ্য করল তার পরণের গাঢ় রঙের স্যুট, ছোট্ট করে ছাঁটা চুল, বাটন-ডাউন শার্ট-কলার—তার সারা চেহারা জানান দিচ্ছে যে সে সরকারের প্রতিনিধি। টেরি মার্টিন অল্প ঘাড় নেড়ে ফের শ্রোতাদের দিতে তাকালো।

"তাহলে আজকের আতঙ্কবাদীদের আপনি কি নামে অভিহিত করবেন? জিহাদি?" —এবারের প্রশ্নটা এলো হলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে। প্রশ্নকর্ত্রী শ্যামবর্ণা, বোঝাই যায় তার পিতামাতা একদিন দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন—হয়তো ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান—ইরান, জর্ডন বা ইরাকও হতে পারে। তবে মুসলমান না হতেও পারে, কারণ মাথা ঢেকে স্কার্ফ বাঁধা নেই।

"জিহাদ শব্দটিও এক্ষেত্রে ভুল", টেরি মার্টিন উত্তর দিল। "অবশ্যই জিহাদ আছে এবং থাকবে, কিন্তু জিহাদেরও কোরান অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে। প্রথম

BanglaBook.org

অর্থে জিহাদ একটি ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার অন্তরীণ সংগ্রাম। তার দ্বারা সে নিজ চরিত্রের দোষগুলিকে তাড়িয়ে মুসলমান হিসেবে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে চায়। বলা বাহুল্য, এই অর্থে জিহাদ আদৌ হিংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক নয়।

"জিহাদের দ্বিতীয় অর্থ ইসলাম ধর্ম রক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রাম। আতঙ্কবাদীদের দাবি যে তারা এই জিহাদ লড়ছে। কিন্তু নিজেদের বিকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা কোরানের মূল পাঠে স্পষ্ট উল্লেখিত নিয়মগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করছে।

"প্রথমত জেনে রাখা দরকার যে কেবলমাত্র বৈধ ও নিয়মসম্মত কোরান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ ব্যতীত আর কেউ জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না। ওসামা বিন-লাদেন ও তার সহচরেরা কোরান ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে অমুসলিম দেশগুলি ইচ্ছে করে ইসলাম ধর্মকে নানাভাবে আক্রমণ করছে, তার ক্ষতি করছে, দুনিয়াজোড়া মুসলিমদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালাচ্ছে, তাহলেও জিহাদ-এর প্রকরণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোরানে স্পষ্ট ভাষায় নিশ্চিত ও নিঃশর্ত নিয়মাবলী উল্লেখ করা আছে।"

"চারটি কাজ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। যারা ইসলাম তথা মুসলমানদের কোনোভাবে আক্রমণ করেনি বা তার কোনো ক্ষতিসাধন করেনি, তাদের আক্রমণ বা হত্যা করা নিষেধ; মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা নিষেধ; বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দর কষাকষি করার জন্য জিহাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষজনকে বন্দী করে রাখা নিষেধ এবং বন্দীদের ওপর কোনোরকম অত্যাচার করা, তাদের যন্ত্রণা দেওয়া বা হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল-কায়দার অন্তর্ভুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা এই চারটি কাজই প্রত্যেকদিন নিয়মিতভাবে করে চলেছে। এবং একথাও মনে রাখা দরকার যে তারা খ্রিস্টান, ইহুদি বা হিন্দুদের তুলনায় ঢের বেশি সংখ্যক মুসলমানকেই হত্যা করেছে।"

"তাহলে, ডক্টর মার্টিন, আপনি আল-কায়দা ও অন্যান্য সমশ্রেণীর সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপকে কি আখ্যা দেবেন?"

"ব্যক্তিগতভাবে আমি বলি 'নব্য জিহাদ' কারণ এই লোকগুলি পবিত্র কোরানের আইন ও নিয়মাবলীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, অথবা সেগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে এক অন্যায় ও দুর্নীতিপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছে। এই লড়াই সম্পূর্ণরূপেই ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। শুদ্ধ জিহাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, তা কখনো কোনোভাবেই নৃশংস ও বর্বর নয়। সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলি যা করছে তা নৃশংস বটে, বর্বর তো বটেই। .....আজকের মতো শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন, আজ আর সময় নেই।"

"আত্মঘাতী জঙ্গিরা সকলেই নিজেদের ইসলামের শহীদ ব'লে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ বোমা মেরে নির্দোষ, সাধারণ মানুষদের হত্যা করা তাদের কাছে একটি ন্যায্য ও সৎকর্ম। এটা কি ক'রে সম্ভব হচ্ছে?"

"কারণ তাদের অত্যন্ত চতুরভাবে সুকৌশলে বোকা বানানো হচ্ছে," ডঃ মার্টিন উত্তর দিলেন। "তাদের সঙ্গে ধর্মের নামে প্রতারণা করা হচ্ছে, যদিও এই জঙ্গিদের

BanglaBook.org

অনেকেই সুশিক্ষিত। নিয়মনিষ্ঠ প্রণালীতে ঘোষিত জিহাদে প্রাণ ত্যাগ করলে সেই যোদ্ধা অবশ্যই 'শহীদ' আখ্যা পেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পবিত্র কোরানে স্পষ্ট কয়েকটি আদেশ দেওয়া আছে। যোদ্ধা যদি জানে যে সে এমন একটি অভিযানে যাচ্ছে যার থেকে সে বেঁচে ফিরতে পারবে না, তবুও সে কিছুতেই নিজের হাতে নিজের প্রাণনাশ করতে পারবে না। ঠিক কোথায় এবং কখন তার মৃত্যু হবে একথাও আগাম জেনে নেওয়া 'গুনাহ্' বা পাপ। অথচ সন্ত্রাসবাদী আত্মঘাতী জঙ্গিরা এই দুটি কাজই নিয়মিত করে থাকে।"

"এক কথায়, ইসলামে আত্মহনন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহম্মদ তাঁর জীবিতাবস্থায় এক আত্মহন্তারক ব্যক্তির মৃতদেহকে আশীর্বাদ করতে অস্বীকার করেছিলেন, যদিও সেই ব্যক্তিটি একটি অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগের যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্যই আত্মহত্যা করেছিল। যারা নিরপরাধ, নিষ্পাপ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করে এবং তারপর আত্মঘাতী হয়, তাদের গন্তব্য 'দোজখ্' বা নরক, 'বেহেশ্‌ত' বা স্বর্গে কিছুতেই তাদের ঠাঁই হবে না। যেসব ভণ্ড প্রচারক ও প্রতারক ইমাম এবং মৌলারা ওইসব জঙ্গিদের বিভ্রান্ত করে বিপথে পরিচালনা করে, তাদেরও স্থান নরকেই।"

"আচ্ছাঃ, এবার তাহলে জর্জটাউন, হ্যামবার্গার এবং কাফেটেরিয়ার জগতে ফিরে যাওয়া যাক। আপনারা সবাই যে এতক্ষণ মন দিয়ে আমার কথা শুনেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ।"

হলভর্তি শ্রোতারা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে সজোরে হাততালি দিয়ে ডঃ টেরি মার্টিনকে অভিনন্দন জানালো। হাত তুলে অভিনন্দন স্বীকার করে কোট পরতে পরতে নোট-ফাইল হাতে নিয়ে টেরি মার্টিন মঞ্চের উইংসের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে গেল।

"প্রফেসর মার্টিন," ফোর্ট মীড থেকে আগত প্রতিনিধি তাকে দেখে বলে উঠল, "আপনার কাজের সময়ে না বলে কয়ে মাথা গলানোর জন্য দুঃখিত, কিন্তু ওপরমহল থেকে নির্দেশ আছে, আজই যেন কোরান কমিটির সদস্যরা সকলেই ফোর্ট মীডে হাজির হয়। আমাদের গাড়ি আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"তাড়াতাড়ি যেতে হবে?" মার্টিন জিজ্ঞেস করল।

"এক্ষুনি, স্যার। একটা ঝামেলা হয়েছে।"

"ঝামেলা?" মার্টিন জিজ্ঞেস করল। "কি ব্যাপারে?"

"জানি না, স্যার। আমার কোনো ধারণাই নেই।"

ঠিক কথা, টেরি ভাবল। ঠিক যতটুকু তোমার জানা আবশ্যক, ততটুকুই তোমাকে জানানো হবে। তোমার কাজের সঙ্গে সংস্রবহীন কোনো তথ্য ওরা তোমাকে জানাবে না কখনোই। কি ঝামেলা হয়েছে, অফিসারটির তা জানার কথা নয়। ফোর্ট মীডে পৌঁছনোর আগে টেরি মার্টিন তার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারবে না।

গাড়িটা কালো সেডানবডি, ছাদের এক কোণে ছোট এরিয়াল লাগানো। সারাক্ষণ ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। চালকটিকে দেখেই বোঝা যায় সে সৈনিক, কিন্তু তার পরণে সাধারণ পোশাক, ইউনিফর্ম নয়। ফোর্ট মীড যদিও সেনাঘাঁটি,

BanglaBook.org

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেই তথ্যটি সর্বজন সমক্ষে প্রচার করতে রাজি নয় কর্তৃপক্ষ। টেরি মার্টিন পেছনের আসনে উঠে আরাম করে বসল। অফিসারটি বসল সামনের আসনে, চালকের পাশে। মসৃণ গতিতে সন্ধেবেলার ট্র্যাফিকের মধ্যে মিশে গেল গাড়িটা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঢুকে পড়ল বাল্টিমোর হাইওয়েতে।

এর থেকে অনেকটা পূর্বদিকে, হ্যাম্পশায়ারের একটা গ্রামে প্রাচীন গোলাবাড়িকে বদলে অবসরকালীন পল্লীভবনে পরিণত করতে ব্যস্ত মানুষটির দিনের কাজ শেষ হয়েছে অনেকটা আগেই। সে ফলবাগানের পাশে ক্যাম্পফায়ার জ্বালিয়ে চিৎ হয়ে ঘাসের ওপর শুয়েছিল। তার মন প্রশান্তিতে ভরপুর। এর আগে বহুবার তাকে রুক্ষ পাথুরে জমি, বালুময় মরুভূমি, এমন কি তুষারের ওপরেও শুয়ে ঘুমোতে হয়েছে। সুতরাং আপেল গাছের নিচে নরম ঘাসের ওপর শুয়ে উষ্ণ আগুন পোহাতে তার কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না।

ক্যাম্পফায়ারের জন্য জ্বালানি জোগাড়ের কোনোই সমস্যা নেই। তার ভাঁড়ারে যত ঘুণধরা পুরোনো তক্তা মজুত আছে, তাতে তার বাকি জীবনটা পুরোই চলে যাবে। অগ্নিকুণ্ডের একটা কিনারে বড় একটা টিনের পাত্র ভর্তি জল টগবগ করে ফুটছিল। সে উঠে বসে চটপট বড় চিনেমাটির মগ ভর্তি করে চা তৈরি করল। সারাদিন খাটুনির পরে সৈনিকের প্রিয় পানীয়—ফুটন্ত, সুগন্ধি দার্জিলিং চা!

আজ একটু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সে গিয়েছিল মীওনস্টোক গ্রামের মুদি-মনোহারি দোকানে তার সপ্তাহান্তিক কেনাকাটা সারতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনবার সময়ে সে খেয়াল করছিল যে গ্রামের বাসিন্দারা তাকে ইতিমধ্যেই নিজেদের একজন বলে মেনে নিয়েছে। লণ্ডন থেকে ঢাউস গাড়িতে চেপে এসে যে সব বড়লোক তাদের চেকবই আর ক্রেডিট কার্ড চমকায়, তাদের সঙ্গে সামনে ভদ্র ব্যবহার করলেও আড়ালে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাল মন্তব্য কেউই করে না। কিন্তু এই যে কালো চুল বলিষ্ঠ একা লোকটি তার ফলবাগানে তাঁবু খাটিয়ে থাকে, আর সারাদিন ধরে গোলাবাড়ির ছাদে উঠে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, সে নিঃসন্দেহে ভাল লোক—গ্রামে এরকমই একটা ধারণা প্রচলিত।

পোস্টম্যানের কাছ থেকে জানা গেছে যে তার কাছে চিঠিপত্র খুব বেশি আসে না। মাঝে মাঝে পুরু কাগজের বড় খামে সরকারি কাগজপত্র আসে। তা সেগুলোও লোকটি পোস্টম্যানকে বলেছে গ্রামের 'বাক্‌স্ হেড' পাবে জমা রাখতে, সময়মতো সে নিজেই নিয়ে নেবে। ফলে পোস্টম্যানকে আর দীর্ঘ, কাদাভর্তি রাস্তা দিয়ে অতখানি দূর যেতে হয় না। পোস্টম্যান এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট—প্রকৃত ভদ্রলোকের মতোই কাজ। খামগুলোর ওপরে লেখা নামের আগে লেখা থাকে 'কর্নেল'। কিন্তু লোকটি যখন পাবে এসে একটা হুইস্কি বা বীয়ার নেয়, নয়তো মুদি-মনোহারী দোকানে গিয়ে খবরের কাগজ বা খাবারদাবার কেনে, কখনো তার মধ্যে কোনো দাম্ভিক বা গর্বিত ভাব কেউ দেখেনি। তার সঙ্গে কথা বললে সে সব সময়েই হেসে উত্তর দেয়, ব্যবহার অতি বিনয়ী। সব

BanglaBook.org

মিলিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তার সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত প্রশংসাসূচক মনোভাব তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু সবার মনে একটা কৌতূহল ছিলই—লোকটা কে? কোথা থেকে এসেছে? মীওনস্টোকে থাকবে বলেই বা ঠিক করেছে কেন?

সেদিন বিকেলে গ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে প্রাচীন সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জায় ঢুকে রেক্টর জেমস ফোলির সঙ্গে আলাপ করল। পাদ্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চলে আসবার সময় তার মনে হচ্ছিল যে তার থাকার জায়গাটা সে ভালই বেছেছে, সে বেশ আনন্দেই থাকবে বাকি জীবন। মাঝে মাঝে তার শক্তসমর্থ মাউন্টেন বাইকটা চালিয়ে সে চলে যাবে সাদাম্পটন রোড ধরে ড্রক্সফোর্ডে। সেখানে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে টাটকা ক্ষেতের সবজি কিনবে। তার গোলাবাড়ির উঁচু ছাদ থেকে যে অজস্র আঁকাবাঁকা মেঠো গলি চতুর্দিকে দেখা যায়, বাইক চড়ে সেগুলোতে অভিযান চালাবে, খুঁজে পাবে কত অজানা 'পাব' অচেনা জায়গা।

সেদিনটা শুক্রবার। রবিবার সে যাবে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জায় সকালের প্রার্থনা সভায়। পাথরের তৈরি প্রাচীন অট্টালিকাটির ভেতরে শান্ত আবছায়ার মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে নত হয়ে সে প্রার্থনা করবে, যেমন প্রার্থনা সে রোজই করে। সারাজীবন সে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। সে প্রার্থনা করবে যেন তাদের সকলের আত্মা শান্তি পায়। একই সঙ্গে সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার যত যোদ্ধা সাথীরা তার পাশাপাশি লড়াই করতে করতে নিহত হয়েছে, তাদের অমর আত্মা যেন চিরশান্তিতে বিশ্রাম লাভ করে। ঈশ্বরকে সে ধন্যবাদ জানাবে কারণ সেই পরম করুণাময়ের কৃপায় তাকে কখনো কোনো মহিলা বা শিশুকে, অথবা কোনো শান্ত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করতে হয়নি। সব শেষে সে প্রার্থনা করবে যেন মৃত্যুর আগে সে তার সকল পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে, যাতে তার আত্মা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়।

গির্জায় প্রার্থনা শেষে সে ফিরবে পাহাড়ের নীচে তার নির্মীয়মান নীড়ে, আবার শুরু করবে তার গৃহ নির্মাণের কাজ। আর হাজারখানেক টালি বসাতে পারলেই ছাদের কাজ শেষ হবে। তারপর শুরু হবে ঘর তৈরি.....

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির পুরো এলাকাটা বিরাট, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরো ফোর্ট মীড সেনাঘাঁটির সুবিশাল এলাকার মধ্যে এন.এস.এ.র অংশটুকু খুবই ছোট। আমেরিকায় ফোর্ট মীডের মতো প্রকাণ্ড সেনাঘাঁটি আর বিশেষ নেই। ওয়াশিংটন ডিসি ও বাল্টিমোরের মাঝামাঝি ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ৯৫ থেকে চার মাইল পূর্বে অবস্থিত এই ঘাঁটিতে প্রায় দশ হাজার সামরিক ও পঁচিশ হাজার অসামরিক সরকারি কর্মচারী সপরিবারে বসবাস ও কাজকর্ম করে। এটি একটি ছোট শহর। সব রকম নাগরিক সুযোগ সুবিধাই এর এলাকার মধ্যে সহজলভ্য। এরই এক নিভৃত কোণে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত একটি বাড়ির সামনে ডঃ টেরি মার্টিনকে নিয়ে কালো সামরিক সেডান গাড়িটি থামল। টেরি এর আগে কখনো এই বাড়িটাতে আসেনি।

তার আগে ঘাঁটির প্রধান দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পর থেকে তিন-চারটি বিভিন্ন

BanglaBook.org

গেট পেরোতে হ'ল। প্রতিটি জায়গায় গাড়ির সামনে বসা অফিসারকে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে টেরি মার্টিনের পরিচয় সম্বন্ধে রক্ষীদের অবহিত করতে হ'ল। তবুও প্রতিটি গেটের রক্ষী নীচু হয়ে জানালার দিকে উঁকি মেরে মার্টিনকে দেখে এবং তার কাছে দেওয়া ছবির সঙ্গে তার চেহারা মিলিয়ে তবেই গাড়ি ঢুকতে দিল। সব শেষে গুপ্ত সংবাদ ও সাঙ্কেতিক ভাষা নিরূপণের বাড়িটিতে ঢোকার সময় টেরির দশ আঙুলের ছাপ নিয়ে রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, চোখের কনীনিকা বিশ্লেষণ করে তার পরিচিতি সম্বন্ধে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়ার পরেই তাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হ'ল।

বাড়ির ভেতরে অজস্র করিডোর, গলি, সিঁড়ি পেরিয়ে শেষে একটি সাদা দরজার সামনে থামল টেরির সঙ্গী অফিসার। দরজার সামনে কোনো কিছু লেখা নেই। এই দরজা ঠেলে একটি প্রশস্ত কক্ষে ঢুকে টেরি মার্টিন অবশেষে কোরান কমিটির সহযোগী সদস্যদের দেখা পেল।

ঘরটা অন্য যে কোনো সরকারি অফিসঘরের মতোই মোটামুটি আরামে কাজ করার উপযোগী, কোন অলঙ্করণ বা বাহার নেই। ঘরে একটিও জানালা নেই। বাতানুকূল যন্ত্রের দৌলতে ঘরের হাওয়া অবশ্য তাজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল ঘিরে গদিওয়ালা ছ'টা চেয়ার। একটা দেওয়ালে লাগানো সাদা স্ক্রীন, প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ছবি, চার্ট ইত্যাদি দেখানোর জন্য। এক কোণে ছোট টেবিলে কয়েকটা ট্রে-তে সাজানো নানারকম স্ন্যাক্স এবং তার পাশে একটা কফি মেকার।

টেরি মার্টিনকে যে দু'জন আমেরিকান অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁদের একজন এন.এস.এর ডেপুটি ডাইরেক্টর, অন্যজন ওয়াশিংটন প্রেরিত 'হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি' বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার। জেনারেল স্বয়ং, তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে ডেপুটি ডাইরেক্টরকে এই আলোচনা সভায় পাঠিয়েছেন।

চার শিক্ষাবিদ তাঁদের কাজের সূত্রে দীর্ঘদিন পরস্পরের পরিচিত। প্রত্যেকেই কোরান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে নানা গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রের রচয়িতা। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে, অথবা সেমিনার, অধিবেশন ইত্যাদিতে তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা ও মতের আদান-প্রদান হয়েই থাকে। একটি মাত্র ধর্ম ও সেই ধর্মের প্রধান পবিত্র গ্রন্থটি সম্বন্ধে তাঁদের পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু এন.এস.এর এই নামহীন, প্রচারহীন, গুপ্ত কমিটিতে তাঁদের সদস্যপদ সম্বন্ধে গুটিকয়েক লোক ছাড়া কেউই কিছু জানে না।

পাশাপাশি তিনটে চেয়ারে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুডডিগ স্ট্র্যাম, র‍্যাণ্ড কর্পোরেশনের বেন জোলি এবং ব্রুকিংস্-এর হ্যারি হ্যারিসন। শুভেচ্ছা সম্ভাষণ জানিয়ে টেরি মার্টিন তিনজনের সঙ্গেই করমর্দন করে একমাত্র খালি চেয়ারটিতে বসল। চারজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বেন জোলি। টেরি বসা মাত্রই তিনি কোটের পকেট থেকে তাঁর প্রিয় ব্রায়ার পাইপটি বার করে তাতে তামাক ঠুসে অগ্নিসংযোগ করলেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর তাঁর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি

BanglaBook.org

করলেন। তিনি ধূমপান বিরোধী। তাঁকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে জোলি মহানন্দে পাইপে টান দিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেওয়ালে লাগানো ওয়েস্টিং হাউস কর্পোরেশনের তৈরি ধূম্রনিকাশী যন্ত্রটির দৌলতে অবশ্য সে ধোঁয়ার বেশির-ভাগটাই ঘরে জমে থাকার সুযোগ পেল না।

আর কালক্ষেপ না করে ডেপুটি ডাইরেক্টর চারজনের সামনে চারটি ফাইল নামিয়ে রাখলেন। প্রতিটি ফাইলের ভেতরে আল-কায়দার অর্থ বিশারদের ল্যাপটপ থেকে উদ্ধার করা আরবী ভাষায় লেখা ডকুমেন্ট এবং এন.এস.এর আরবী বিভাগের অনুবাদকদের করা ইংরেজি অনুবাদ। চারজনই ইংরেজি অনুবাদ সরিয়ে রেখে আরবী ডকুমেন্টের প্রিন্টআউটটি তুলে নিয়ে পড়া শুরু করে দিলেন। চারজনই মোটামুটি একই সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করে মাথা তুললেন।

এরপরে চারজনই ইংরেজি অনুবাদটি পড়ে দেখলেন, অত্যন্ত মন দিয়ে এবং যত্ন সহকারে, কিছু ভুল হয়েছে বা বাদ গেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। অবশেষে জোলি তাকালেন দুই গোয়েন্দা অফিসারের দিকে।

"তাহলে?"

"তাহলে কি, প্রফেসর?"

"আপনাদের সমস্যাটি কি?" জোলির কণ্ঠস্বর কিছুটা রুক্ষ শোনাল। "আমাদের এত হুড়োহুড়ি করে ডেকে এনেছেন কেন?"

ডেপুটি ডাইরেক্টর ঝুঁকে পড়ে ইংরেজি অনুবাদের একটা অংশে তাঁর তর্জনী দিয়ে টোকা মারলেন—"সমস্যাটা এখানে। এইটা। এই কথাগুলোর মানে কি? ওরা কি বলতে চাইছে?"

চারজন শিক্ষাবিদই আরবী ভাষ্যের মধ্যে কোরান থেকে নেওয়া অংশটি আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। চারজনই আরবী বলতে পড়তে লিখতে পারেন অতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে, তাঁদের কোনো অনুবাদের প্রয়োজন হয় না কখনো। যে বাক্যাংশটির প্রতি ডেপুটি ডাইরেক্টর তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন, সেই শব্দ সমষ্টিটি তাঁদের চেনা। বহুবার নানা কারণে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ওই কথাগুলির ভাববৈচিত্র্য এবং সঠিক অর্থ নিয়ে আলোচনা ও লেখালেখি করেছেন। কিন্তু সে সবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কেতাবী আলোচনা। শব্দ সমষ্টিটির উল্লেখও তাঁরা বরাবর পেয়েছেন প্রাচীন দার্শনিক বা ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে। কিন্তু বর্তমান দলিলে ওই শব্দগুলি আধুনিক আরবীতে লেখা। একটা চিঠিতে তিনবার এবং আর একটা চিঠিতে একবার ওই বিশেষ শব্দ সমষ্টিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তার প্রসঙ্গ টেনে আরো কিছু কথা বলা হয়েছে।

"আল-ইসরা? এ কথাটা নিঃসন্দেহে সাঙ্কেতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে এ কথাটা নবী মহম্মদের জীবনের একটি ঘটনার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়।"

"আপনি আমাদের অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন," হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির অফিসারটি এতক্ষণে মুখ খুললেন, "আল-ইসরা ব্যাপারটা কি?"

"টেরি, তুমি বুঝিয়ে বলো", ডঃ জোলি বললেন।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," টেরি মার্টিন শুরু করল। "আল-ইসরা হ'ল মহম্মদের জীবনে একটি দৈবলব্ধ জ্ঞান বা প্রত্যাদেশ। আজও পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক চলছে যে মহম্মদ কি সত্যিই একটি ঈশ্বরীয় অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, নাকি এটি তাঁর স্থূল রক্তমাংসের শরীরের বাইরে বায়বীয় স্তরে আত্মার পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত। ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরকম ঘটেছিল ঃ

"তাঁর জন্মস্থান মক্কা থেকে স্থায়ীভাবে মদিনা চলে যাওয়ার বছরখানেক আগে একদিন মহম্মদ একটি স্বপ্ন দেখেন। অথবা হয়তো তাঁর মনে কোনো অলীক বিভ্রমের উদয় হয়েছিল। নতুবা তাঁর অভিজ্ঞতাটি সত্যিই কোনো ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা। আমি অত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। সংক্ষেপে বলা যাক, তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাই থেকে তাঁর একটি বিশেষ মানসিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।"

"মহম্মদ স্বপ্ন দেখলেন যে কোনো এক অজানা শক্তি যেন তাঁকে সৌদি আরবের অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মরুভূমি ও পাহাড় পেরিয়ে জেরুজালেমে নিয়ে চলে গেছে। তখনো পর্যন্ত জেরুজালেম কেবল খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র শহর।"

"সেটা কোন সময়? আমাদের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী?"

"মোটামুটি ৬২২ খ্রিস্টাব্দ।"

"তারপরে কি দেখলেন?"

"মহম্মদ দেখলেন তাঁর সামনে একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে যেন তাঁকে বলল ঘোড়াটির পিঠে চড়তে। তিনি পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বসতেই সে ডানা মেলে উড়ে গেল সোজা স্বর্গে। সেখানে মহম্মদ স্বয়ং পরম করুণাময় ঈশ্বরের মুখোমুখি হলেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তখন অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে আদর্শ বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রার্থনা করার যাবতীয় আচার ও নিয়মাবলী এক এক করে বিবৃত করলেন। মহম্মদ সেগুলি সব শুনে শুনে মুখস্থ করলেন। বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তনের পর এই সমস্ত আচার বিচার ও নিয়মাবলী তিনি এক অনুলেখকের কাছে স্মৃতি থেকে পরপর বলে গেলেন। অনুলেখকটি তাঁর পাঠ ও ভাষ্য শুনে শুনে সেগুলি হুবহু লিপিবদ্ধ করল। এই ছন্দোবদ্ধ স্তোত্রগুলি ইসলাম ধর্মের ভিত্তি।"

বাকি তিন অধ্যাপক মাথা নেড়ে টেরি মার্টিনের কথায় সম্মতি জানালেন।

"ওরা এইসব ব্যাপার বিশ্বাস করে?" ডেপুটি ডাইরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি দয়া করে নিজেকে পরম যুক্তিবাদী সুসভ্য খ্রিস্টান মনে ক'রে মুসলমানদের প্রতি পিঠ চাপড়ানির ভাব দেখাবেন না," হ্যারি হ্যারিসন বলে উঠল। "বাইবেলে রয়েছে যে যীশুখ্রিস্ট গহন জঙ্গলের ভেতর চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত নিরম্বু উপবাস করার পর স্বয়ং শয়তানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রতিরোধ করেন এবং ধমক দিয়ে বিতাড়ন করেন। এতদিন অনশনের পরে তাঁরও তো চিত্তবৈকল্য বা বিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা খ্রিস্টানরা কি তাই ভাবি? আদর্শ খ্রিস্টান এক মুহূর্তের জন্যও এই ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না।"

"ঠিক কথা। আমি ক্ষমা চাইছি," ডেপুটি ডাইরেক্টর বললেন। "তাহলে আল-

ইসরা হ'ল মহম্মদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সরাসরি সাক্ষাৎ?"

"না," এবার জোলি কথা বললেন। "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল সংসারভূমি থেকে আল্লাহ্‌তালার পবিত্র ভূমি পর্যন্ত ভ্রমণটিই হ'ল আল-ইসরা। এক মায়াবী বা কুহকী যাত্রা। অথবা বলা উচিত, স্বয়ং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী এটি এক অলৌকিক ও স্বর্গীয় যাত্রা।"

"এও বলা হয়ে থাকে," ডঃ স্ক্র্যাম বলে উঠলেন, "আল-ইসরা হ'ল গভীর অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে এক পরম আলোকপ্রাপ্তির পথে ভ্রমণ...."

আল-ইসরা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ব্যাখ্যা থেকে স্ক্র্যাম উদ্ধৃতি দিলেন। অন্য তিনজনেরও উদ্ধৃতিটি ভালরকম জানা, তাঁরা মাথা নাড়লেন।

ডেপুটি ডাইরেক্টর এবারে প্রশ্ন রাখলেন, "তাহলে কোনো আধুনিক মুসলমান এবং আল-কায়দার উচ্চপদস্থ সক্রিয় কর্মী আল-ইসরা বলতে কি বোঝাবে?"

চারজন শিক্ষাবিদ এইবারে নড়েচড়ে বসলেন। এই প্রথম তাঁরা বুঝতে পারলেন যে আরবী ভাষায় লেখা দলিলটি এন.এস.এর হাতে মজুত আছে।

"এই ডকুমেন্টটা আপনারা হাতে পেয়েছেন।" হ্যারি হ্যারিসন মন্তব্য করলেন। "নিশ্চয়ই যথেষ্ট সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল এটা?"

"অবশ্যই। আমরা যাতে এটা না দেখতে পাই, সে চেষ্টা করতে গিয়ে দু'জন নিহত হয়েছে।"

"আচ্ছা, বুঝতে পারছি," ডঃ জোলি কিছুক্ষণ খুব মন দিয়ে তাঁর হাতে ধরা পাইপটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অন্য তিনজন চুপ করে বিভিন্ন বস্তুর ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। অনেকক্ষণ পরে জোলি আবার কথা বললেন ঃ "আমার মনে হচ্ছে, ওরা কোনো বিশেষ একটা কর্ম-পরিকল্পনা বা প্রোজেক্ট বোঝাতে চাইছে। ছোটখাটো কাজ নয়—তাহলে 'আল-ইসরা' বলতো না।"

"বড় অপারেশন?" অন্য অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন।

"একটা কথা ভাল করে শুনুন," জোলি ঝুঁকে বসলেন। "ভক্তিশীল মুসলমানেরা —অন্ধ এবং গোঁড়া জঙ্গিরা তো বটেই—কেউই 'আল-ইসরা' কথাটাকে হালকাভাবে নেয় না। তাদের চোখে 'আল-ইসরা' এমন একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা, যা সারা দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে। এখন যদি কোনো কিছুর সাঙ্কেতিক নাম ওরা 'আল-ইসরা' দিয়ে থাকে, তার মানে জেনে রাখুন, ব্যাপারটা অতি অবশ্যই বিশাল মাপের।"

"পুরো ডকুমেন্টে কোথাও কোনো ইঙ্গিত আছে কি, যাতে বোঝা যায় ব্যাপারটা কি ধরনের?"

ডঃ জোলি তাঁর তিন সহকর্মীর দিকে চোখ ফেরালেন। তিনজনেই নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল, অথবা মাথা নাড়ল।

"বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নেই," জোলি বললেন। "দুই লেখকই প্রোজেক্টটার সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে—ব্যস এইটুকুই। আমি বিশ্বাস করি আমার সহকর্মীরাও আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন যে, এছাড়া আমাদের আর কিছু বলা

BanglaBook.org

ধা করার নেই। ব্যাপারটা কি—তা আপনাদেরই অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে হবে। আবারও বলছি, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে সাংঘাতিক কিছু—বাজারে ব্যাগে ভরা বোমা ফেলে রাখা, বা নাইটক্লাবে বিস্ফোরণ, বা বাস উড়িয়ে দেওয়া—এ ধরনের জঙ্গি কাজকর্মকে ওরা কখনই 'আল-ইসরা' নাম দেবে না।"

এই মিটিংয়ের যাবতীয় কথাবার্তা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে রেকর্ড হচ্ছিল। এই বিশেষ বাড়িটিতে এটাই প্রথা। এখানে কোনো মিটিংয়েই কেউ লিখিত নোট নেয় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিটিং-এ উপস্থিত দু'জন গোয়েন্দা অফিসারই সব কথাবার্তার প্রতিলিপি তৈরি করে তারপর দু'জনের সম্মিলিত রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন। সকাল হওয়ার আগেই সশস্ত্র সামরিক কুরিয়ারের মাধ্যমে সিল করা খামটা পৌঁছে যাবে সোজা হোয়াইট হাউসে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির টেবিলে।

ওয়াশিংটনে ফেরার সময় টেরি মার্টিন ও বেন জোলি একসঙ্গে একটা বিরাট লিমোসিনে আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। মস্ত গাড়িটা একটা কাচের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত। পার্টিশনের ওপারে সামনের সিটে ড্রাইভার এবং এক সামরিক অফিসার। আপাতরুক্ষ আমেরিকান শিক্ষাবিদ চুপ করে ডানদিকের জানালা দিয়ে শরৎকালীন প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলেন। বয়সে ছোট ইংরেজ অধ্যাপকটিও তার বাঁদিকের জানালা দিয়ে বাদামী, হলুদ ও কালচে ঝরা পাতার সমারোহের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কত কি চিন্তা করছিল।

টেরি মার্টিনের মনে পড়ছিল চারটি মানুষের কথা, যে চারজনকে সে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে। গত দশ মাসের মধ্যে এই চারজনের তিনজন তাকে চিরকালের মতো ছেড়ে চলে গেছে। বছরের গোড়ার দিকে গেলেন তার বাবা ও মা। দু'জনেরই বয়স হয়েছিল সত্তরের ওপর। চল্লিশের কিছু কমবেশি বয়স্ক দুই ছেলেকে ছেড়ে দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে পরলোকের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছেন। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের ক্যান্সার ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাবাকে। স্বামীকে হারিয়ে তাদের মা বেশিদিন একাকী জীবন যাপন করতে পারলেন না। দুই ছেলেকে আলাদা করে দুটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখে তিনি এক শিশিভর্তি ঘুমের বড়ি খেয়ে অনন্ত যাত্রা শুরু করলেন। মাথার বালিশের পাশে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেছেন ছেলেদের উদ্দেশে কয়েকটি শব্দ ঃ "তোমাদের বাবার কাছে চললাম।"

টেরি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। দুটি মানুষের প্রেরণা ব্যতীত তার পক্ষে স্বাভাবিক জীবন কাটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই দু'জনেই তার প্রাণাধিক প্রিয়। একজন তার প্রিয়তম বন্ধু, দীর্ঘকায় ও সুদর্শন গর্ডন। কিন্তু গত মার্চ মাসের এক রাতে ডিনারের পর বাড়ির কাছের রাস্তায় পায়চারি করার সময় এক মাতাল চালক উন্মত্ত বেগে ধেয়ে আসা তার গাড়িটা দিয়ে পিষে দিয়ে গেল গর্ডনকে, মুহূর্তে নির্বাপিত হ'ল টেরির প্রিয় সবুজ, সজীব জীবনের প্রদীপ।

এই তীব্র মানসিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার মতো মনের জোর তার ছিল না। কিন্তু এই

BanglaBook.org

সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল তার বড় ভাই মাইক। এক সপ্তাহ ধরে তার লণ্ডনের ফ্ল্যাটে সঙ্গে ছিল মাইক। তার সাহচর্য এবং জীবনমুখী কথাবার্তা টেরিকে বিষাদের অতলান্ত খাদের কিনারা থেকে ফিরিয়ে এনেছে জীবনের মূল স্রোতে।

সেই ছোটবেলায় ইরাকে বড় হয়ে ওঠার সময় থেকেই মাইক তার হীরো—আদর্শ পুরুষ। পরে ইংল্যাণ্ডে হার্টফার্ডের কাছে হেইলিবেরি পাবলিক স্কুলে দু' ভাই পড়বার সময়েও মাইকের প্রতি টেরির শ্রদ্ধা ও ভালভাসায় কোনো ঘাটতি হয়নি, কখনো।

শারীরিক ও মানসিক সব দিক দিয়েই মাইক বরাবর টেরির সম্পূর্ণ বিপরীত। টেরির গায়ের রঙ ইংরেজসুলভ গোলাপী ফর্সা; মাইক রোদে পোড়া বাদামী বর্ণ। টেরি বরাবরই নরমসরম, শ্লথ গতি, ভীতু, মোটাসোটা ও গোলগাল। মাইক পেশীবহুল, দুর্দান্ত ক্ষিপ্র, অতীব সাহসী এবং স্বনির্ভর। হঠাৎ টেরির মনে পড়ল হেইলিবেরির সেই চ্যাম্পিয়নশিপ রাগবি ম্যাচটার কথা। মাইকের সেই বছর হেইলিবেরিতে পড়া শেষ হতে যাচ্ছে। ফাইনাল ম্যাচে ঢের শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একা রুখে দাঁড়িয়ে এবং নিজের সহ খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল মাইক। খেলার শেষে মাঠ থেকে বেরোবার সময় উল্লসিত টেরির দিকে তাকিয়ে ডানহাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধরে মাইক বলেছিল, "ভাই, আমরা পেরেছি।"

সেইদিন থেকে টেরি মাইককে বীরের আসনে বসিয়ে পুজো করে এসেছে বরাবর। মাইকের মতো চরম সাহসের সঙ্গে সব রকম বিরুদ্ধতার মোকাবিলা করতে আর কাউকে দেখেনি টেরি।

টেরি মার্টিন ও বেন জোলিকে নিয়ে সামরিক লিমোসিন ছুটছিল মেরীল্যাণ্ড রাজ্যের এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। মেরীল্যাণ্ড অতিক্রম করার আগেই সূর্য অস্ত গেল। ওই একই সময়ে কিউবাতেও সূর্যাস্ত হ'ল। দক্ষিণ পশ্চিমে গুয়ানতানামো উপসাগরের তীবরর্তী কারাগারের একটি কক্ষে এক বন্দী তার ছোট ভাঁজ করা মাদুরটি খুলে বিছিয়ে দিল মেঝেতে। তারপর হাঁটু মুড়ে পূর্বমুখো বসে সে সান্ধ্যকালীন নমাজ শুরু করল। জেনারেল স্বয়ং, তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে কারাকক্ষের বাইরে একটি সৈনিক ভাবলেশহীন মুখে তাকে দেখতে লাগল। সে বহু, বহুবার এই বন্দীকে নানারকম কাজ করতে দেখে আসছে—কিন্তু তার ওপর কঠোর নির্দেশ আছে ঃ কোনো, কোনো কারণেই বন্দীর ওপর থেকে চোখ সরাবে না।

কারাগারটির ভূতপূর্ব নাম 'ক্যাম্প এক্সরে', বর্তমানে পাল্টে গিয়ে হয়েছে 'ক্যাম্প ডেলটা'। সংবাদমাধ্যমগুলি সর্বদাই উল্লেখ করে 'গিতমো' নামে—গুয়ানতানামো'র আমেরিকান সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রার্থনারত লোকটি এখানে প্রায় পাঁচ বছর ধরে বন্দী হয়ে আছে। তাকে প্রথম ধরে আনার পরে কথা আদায় করার জন্য ঘন্টার পরে ঘন্টা জেরা করা হ'ত, সঙ্গে পাশবিক মার ও অন্যান্য অত্যাচার। কিন্তু তার মুখ থেকে কখনো একটা চিৎকার দূরে থাক, একটা গোঙানিও কেউ কোনদিন শোনেনি। শতরকম লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সে একটা শব্দ কখনো উচ্চারণ করেনি। শুধু মাঝে মাঝে সে যখন তার

BanglaBook.org

উৎপীড়কদের চোখে চোখ রাখত, তখন তার দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত আক্রোশ ও ঘৃণা লক্ষ্য করে প্রশ্নকারীরা শিউরে উঠত। সুতরাং লোকটার জেদ ভাঙার জন্য তারা আরো প্রচণ্ড প্রহার ও পীড়ন শুরু করে দিত। কিন্তু না, লোকটার মনোবল তারা কিছুতেই ভাঙতে পারেনি।

মারধর অত্যাচারে যখন কাজ হ'ল না, তখন শুরু হ'ল টোপ গেলানোর চেষ্টা। আশপাশের কক্ষের অনেকগুলি বন্দী নানারকম সুবিধে পাওয়ার লোভে নিজেদের অনেক সাথীর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। কিন্তু সে তখনও নীরব থেকেছে। তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা কমেনি, উৎপীড়ন চলেছে মাসের পর মাস, তবুও তার মুখ থেকে একটি কথাও বার করা যায়নি। অন্যান্য বেশ কয়েকজন বন্দী অনেক দুষ্কর্মের জন্য তাকেই দায়ী করেছিল। কিন্তু সে সবই বানানো মিথ্যে কথা। তাকে যখন এই কথাগুলো তুলে পুনরায় জেরা করা হ'ত, সে কোনো কিছুই স্বীকারও করেনি, অস্বীকারও করেনি।

জেলের পেশাদার প্রশ্নকারীরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার জন্য ফাইলের পর ফাইল ভর্তি রিপোর্ট জমা করেছে। তাতে প্রার্থনারত ব্যক্তিটির সম্বন্ধে নানা কথা আছে, কিন্তু তার কাছ থেকে পাওয়া একটিও তথ্য নেই। পাঁচ বছর আগে, তার কারাবাসের একদম শুরুতে, দু'জন অফিসার তাকে জেরা করবার সময় নরমপন্থা অবলম্বন করেছিল। সেও তখন বেশ ভদ্রভাবেই তাদের প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত জবাবগুলির পাওয়া তথ্য থেকেই তার সম্পর্কে কিছু জানা গিয়েছিল, আর কিছুই না।

কিন্তু সমস্যাটা তখন থেকে আজ পর্যন্ত একই রয়ে গেছে। প্রশ্নকারীরা কেউই তার কথার মানে বোঝে না, কারণ সে সবসময় তার মাতৃভাষায় কথা বলে। সুতরাং জেরা করার সময় সর্বদাই দোভাষী সঙ্গে রাখতে হয়। এই দোভাষীদেরও কিন্তু নিজস্ব স্বার্থ আছে। তথাকথিত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ফাঁস হলে দোভাষীদের কিছু সুবিধা মেলে। সে কারণে তারাও বহু জবাবের অর্থ নিজেদের মতো বিকৃত করে নেয়, যাতে করে ধৃত লোকটার উপর নানারকম কাল্পনিক দুষ্কর্মের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায়। তার ফলে জেরা আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়—দোভাষীর কাজের মেয়াদও ক্রমশ বাড়ে।

ক্রমান্বয়ে চার বছর জেরা করার পর জেল কর্তৃপক্ষ তার গায়ে একটা তকমা এঁটে দিল—অসহযোগী। সোজা কথায় অনমনীয়—এর কাছ থেকে কথা আদায় করা অসম্ভব। ২০০৫ সালে তাকে উপসাগরের অন্য তীরে নতুন তৈরি 'ক্যাম্প ইকো'-তে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এখানে সেলগুলো অনেক ছোট, সাদা চুনকাম করা দেওয়াল, লোহার দরজায় সব সময় তালা দেওয়া থাকে। কেবলমাত্র রাত্রে বন্দীরা কিছুক্ষণের জন্য জেল প্রাঙ্গণে পায়চারি করার সুযোগ পায়। এই এক বছর ধরে মক্কার দিকে মুখ করে প্রার্থনারত বন্দীটি সূর্যের মুখ দেখেনি।

BanglaBook.org

তার কোনো পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন আছে বলে জানা যায়নি। কোনো দেশের সরকার তার খবর জানতে চায় না। কোনো উকিল তার পক্ষ নিয়ে আদালতে যায়নি কখনো। নৃশংস জোরার দাপট সইতে না পেরে তার চারপাশের অনেক বন্দী মানসিক

ভারসাম্য হারিয়েছে, তাদের অনেকেই স্থায়ীভাবে পাগলা গারদের বাসিন্দা। সে কিন্তু সারাক্ষণ শুধু চুপ করে থাকে, আর কোরান পড়ে।

সে যখন প্রার্থনা করছিল, তখন তার সেলের বাইরে প্রহরী বদল হ'ল। ডিউটি শেষে যে প্রহরীটি চলে যাচ্ছিল, সে হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা রত লোকটির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মন্তব্য করল, "হতচ্ছাড়া আরবী বদমায়েশ।"

নতুন প্রহরীটি মাথা নেড়ে তার ভুল ভাঙিয়ে দিল ঃ "লোকটা আরবী নয়—ও আফগান।"

"তাহলে টেরি," বেন জোলি লিমোসিনের প্রশস্ত আসনে অল্প ঘুরে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের সমস্যাটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হচ্ছে?"

"ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না, তাই না?" টেরি মার্টিন উত্তর দিল। "আপনি আমাদের দুই গোয়েন্দা বন্ধুর মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিলেন? ওরা শুরু থেকেই যা সন্দেহ করেছে, আমরা সেটাকেই নিশ্চিত করলাম। নতুন কিছু তো বলিনি। আমরা যখন চলে এলাম, তখন ওদের দু'জনকেই খুব ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছিল।"

"আমরা আর কি বা বলতে পারতাম! এই আল-ইসরা অভিযানটা কি, তা ওদেরই খুঁজে বার করতে হবে।"

"কিন্তু কিভাবে?" টেরি জিজ্ঞেস করল।

"তা দেখো, আমি এই গুপ্তচরদের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত আছি। মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আমার সাধ্যমতো ওদের সাহায্য করছি বহুদিন, সেই ১৯৬৭ সালের জুন মাসে মিশর-ইজরায়েলের ছ'দিনব্যাপী যুদ্ধের সময় থেকে। এদের খবর জানার বহু কায়দা আছে—প্রথমত, শত্রুপক্ষের ভেতরে এদের চর থাকে; তাছাড়া বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর, ট্যাপ করা ফোন বা রেডিও ট্রান্সমিটারে আড়ি পাতা, হারিয়ে যাওয়া ফাইল খুঁজে বার করে তথ্য উদ্ধার, বিমান বা উপগ্রহ থেকে ছবি তোলা; এর সঙ্গে আছে কম্পিউটার, যার সাহায্যে হাজার হাজার তথ্য কয়েক মিনিটের মধ্যে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে বা মিলিয়ে নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়। আমার মনে হয় ওরা ধাঁধাটার সমাধান করবেই, অভিযানটা ঠিক বানচাল করে দেবে। ভুলে যেও না যে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। ১৯৬০ সালে যখন গ্যারি পাওয়ার্সকে সোয়ার্ডলভস্কের ওপর সোভিয়েত রাশিয়া গুলি করে নামিয়েছিল, বা ১৯৬২ সালে যখন ইউ-টু বিমান কিউবার ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর ফটো তুলেছিল—তুমি তো বোধহয় তখনও জন্মাওনি, তাই না?" টেরি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বেন জোলি সশব্দে হাসলেন।

"হয়তো আল-কায়দার ভেতরে ওদের কেনো চর আছে," টেরি বলল।

"সন্দেহ আছে," জোলি মন্তব্য করলেন। "কেউ যদি সে রকম থাকত, তাহলে সে এতদিনে অভিযানের নেতাদের মুখোশ খুলে দিত। অন্তত তাদের সদর দপ্তরের খোঁজ আমরা পেয়ে যেতাম। আমেরিকান বিমান বহর তাহলে সেটা এতদিনে বোমা

BanglaBook.org

মেরে উড়িয়ে দিত।"

"তাহলে আল-কায়দার ভেতরে এরা কাউকে গোপনে ঢুকিয়ে দিতে পারে। সে ব্যাপারটা খোঁজ করে জানিয়ে দিতে পারে।"

বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটি এবারে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

"না টেরি, তুমি ভাল রকমই জানো সেটা অসম্ভব। জন্মসূত্রে আরবী কাউকে যদি ঢোকানো যায় কোনোমতে, কিছুদিনের মধ্যেই সে পুরো ঘুরে যাবে—দেখা যাবে সে আমাদেরই বিরুদ্ধে কাজ করছে। আর আরবী নয় এমন কেউ—ওকথা ভুলে যাও। আমরা দু'জনেই ভালমতো জানি যে প্রতিটি আরবী লোক তার বিস্তারিত পরিবার, তথা গোষ্ঠী, তথা সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত। যে কোনো আরবী পদবীর মধ্যে এগুলোর উল্লেখ থাকে। কাজেই পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে খোঁজ করলেই জাল ব্যক্তিটি ধরা পড়ে যাবে।

"তা ছাড়াও, যদি বা তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে জাল নাম-পদবী সব নিখুঁত—তাহলেও সে লোকটার চেহারা, ভাষা, কথা বলার ধরন এবং ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ শতকরা একশো ভাগ সঠিক ও নিখুঁত হতে হবে। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তে হবে। উচ্চারণে একটা বর্ণও যদি ভুল হয়, চরমপন্থী জঙ্গিরা সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে। তাল সুর ভঙ্গি—কোনো কিছুতে একটুও খুঁত থাকা চলবে না।"

"ঠিক," টেরি বলল। "তবুও....এমন কেউ যদি হয়, যার কোরানের বিশেষ অংশগুলো পুরো মুখস্থ, যার ছদ্মনামের পরিবারটাকেও খুঁজে বার করা অসম্ভব...."

"ওকথা ভুলে যাও। কোন পাশ্চাত্যদেশীয় লোকের পক্ষে আরবী লোকজনদের সঙ্গে বসবাস করে নিজেকে আরবী বলে চালানো অসম্ভব।"

"আমার দাদার পক্ষে সম্ভব," বলে উঠল টেরি। চরম অসাবধান এই মন্তব্যটা করে ফেলেই সে চমকে উঠল। পারলে বোধহয় সে নিজের জিভটাই কেটে বাদ দিয়ে দিত! ইশ্, কি আহাম্মকের মতো ভুল করল সে! তাড়াতাড়ি বেন জোলির দিকে তাকিয়ে দেখল সে। ....নাঃ, সব ঠিকই আছে। ডঃ জোলি খেয়াল করেননি। তাঁর মধ্যে কোনো বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। তাঁর গলা দিয়ে একটা "হুম!" জাতীয় আওয়াজ বেরোলো শুধু। বোঝাই গেল, বিষয়টা সম্বন্ধে তাঁর আর আগ্রহ নেই। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে ওয়াশিংটন ডি.সি'র উপকণ্ঠের এলাকার প্রকৃতি দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

টেরি সামনের দিকে তাকাল। কাচের ওপারে আওয়াজ যাওয়া সম্ভব নয়। সামনে বসা ড্রাইভার ও সামরিক অফিসার স্থির হয়ে সামনের দিকেই তাকিয়ে আছে। থাক বাবা, কারও কানে যায়নি কথাটা। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসল। গাড়ির ছাদ, জানালার ফ্রেম ইত্যাদি সে ভাল করে নজর করল। কোথাও কোনো মাইক্রোফোন চোখে পড়ল না। সব ঠিকই আছে তাহলে—

টেরি মার্টিন বুঝতে পারল না যে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তার আলগা, বেফাঁস মন্তব্যের জের যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

BanglaBook.org

কোরান কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত রিপোর্টটা শনিবার ভোরের আগেই তৈরি হয়ে গেল। রিপোর্টটা হাতে পাওয়ার পরে বেশ কয়েকজন মানুষের সপ্তাহান্তিক ছুটিটা একেবারেই মার গেল। এই মানুষদের মধ্যে একজন মারেক গুমিনি, সি.আই.এর ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ অপারেশনস্। ভোরবেলায় তার ঘুম ভাঙাল একটি জরুরি টেলিফোন কল। তাকে বলা হ'ল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার অফিসে চলে আসতে। কেন বা কি জন্য এই জরুরি তলব, তা জানা গেল না।

এই 'কেন'র উত্তর মিলল সে তার অফিসে পৌঁছনোর পর। ওয়াশিংটনের আকাশে তখন সবে ভোরের গোলাপী আলোর আভা ফুটতে শুরু করেছে। দূরে প্রিন্স জর্জেস কাউন্টিতে পাহাড়গুলোর মাথায় লেগেছে সূর্যের প্রথম আলোর ছোঁয়া। নীচে চেসাপীক উপসাগরের দিকে বহমান প্যাটুক্সেন্ট নদীর জল তখনো অন্ধকারেই ঢাকা।

গুমিনির অফিস 'ল্যাংলি' নামে খ্যাত সি.আই.এর সদর দপ্তরের ছ'তলায়। জোড়া টাওয়ার ধ্বংসের পরে হুবহু একই রকম দেখতে আর একটা বাড়ি সামনেই তৈরি হয়েছে। ফলে গুমিনির অফিস বাড়িটাকে সকলেই পুরোনো ল্যাংলি বলেই ডাকা শুরু করেছে।

সি.আই.এর ডাইরেক্টর পদে সাধারণত কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সংস্থা পরিচালনা করে আসলে দুই ডেপুটি ডাইরেক্টর—একজন অপারেশনস্-এর ভারপ্রাপ্ত এবং তার কাজ পৃথিবী চুঁড়ে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা। অন্যজন ইনটেলিজেন্স বা গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। তার কাজ প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সেগুলির থেকে দরকারি তথ্যগুলি বেছে নিয়ে ঘটনার একটা গোটা ছবি তৈরি করা।

এই দু'জনের নীচে আছে দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। একজন কাউন্টার-ইনটেলিজেন্স বিভাগটি দেখাশোনা করে। তার প্রধান কাজ অন্য দেশের গুপ্তচর এবং নিজের দেশের বিশ্বাসঘাতকদের কবল থেকে সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা। অন্যজন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বা কাউন্টার টেররিজম্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। এটিই বর্তমানে সি.আই.এর ব্যস্ততম বিভাগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে মধ্য প্রাচ্য থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই প্রায় সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়।

১৯৪৫ সালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শুরু থেকেই ডি.ডি. অপারেশনস্-এর পদে কোনো সোভিয়েত রাশিয়া বিশেষজ্ঞকেই নিয়োগ করা হ'ত। তার সঙ্গে সহযোগিতা করতো সোভিয়েত বিভাগ এবং উপগ্রহ ও পূর্ব ইউরোপ বিভাগ। এই দুটি বিভাগের অফিসারদের মধ্যে ডি.ডি.ও. পদে উন্নীত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট রেষারেষি ছিল। মারেক গুমিনিই প্রথম আরব তথা মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ যে ডি.ডি.ও. পদে নিযুক্ত হয়েছিল। যুবক

BanglaBook.org

বয়সে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার সময় তাকে কাজ করতে হ'ত প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। সেই সময়ে সে আরবী ও ফারসি এই দুটি ভাষায় বেশ উচ্চস্তরের দক্ষতা অর্জন করে। ফলে আরবী এবং ইরানি, ইরাকি ও কুয়েতি সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রশ্নাতীত।

সি.আই.এর সদর দপ্তরে দিন রাত ব'লে কিছু নেই। বছরে ৩৬৫ দিন চব্বিশ ঘন্টাই সি.আই.এ. জেগে থাকে। তা সত্ত্বেও শনিবারের এই ভোরবেলা গুমিনির পছন্দসই সুগন্ধি ও কড়া কালো কফি তৈরি করার মতো লোক কাউকে পাওয়া গেল না। গুমিনি নিজেই কফি তৈরি করে কয়েকটা চুমুক দেওয়ার পরে তবেই তার ঘুম ছাড়ল। এইবার সে গালার সীলমোহর দিয়ে আটকানো পাতলা ফাইলটা খুলে বসল।

ফাইলের বিষয়বস্তু কি হবে তা তার মোটামুটি জানাই ছিল। কারণ ব্রিটিশ এস. আই.এস. এবং পাকিস্তানী সি.টি.সি'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিযান চালিয়ে সি.আই. এ.-ই পেশোয়ারে আসল জিনিসটা হস্তগত করেছে। পেশোয়ার ও ইসলামাবাদের চরেরা তাদের বড়কর্তা, অর্থাৎ গুমিনির কাছে এই ব্যাপারে সমানেই বিশদ রিপোর্ট পাঠিয়ে যাচ্ছে। কাজেই গুমিনির কাছে আনুষঙ্গিক তথ্যের অভাব নেই।

ফাইলের মধ্যে ছিল আল-কায়দার অর্থনৈতিক বিশারদের ল্যাপটপ থেকে পাওয়া যাবতীয় তথ্য, পরিষ্কারভাবে টাইপ করা। কিন্তু অবশ্যই তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল দুটি আরবী ই-মেল, মোট তিনটি পাতায় বিস্তৃত। গুমিনির কথ্য আরবী অত্যন্ত দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু আরবী পড়ে বোঝার ব্যাপারে তার অসুবিধে হয়। ফলে বারংবার তাকে ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নিতে হচ্ছিল। কোরান কমিটির বক্তব্য পড়েও সে বিস্মিত হ'ল না। সে আগে থাকতেই জানতো যে 'আল-ইসরা', নবী মহম্মদের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, এক্ষেত্রে কোনো একটা বিশেষ জঙ্গি অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম হতে বাধ্য।

এখন গুমিনির প্রথম কাজ হ'ল সি.আই.এর তরফে এই বিষয়ের একটা সাঙ্কেতিক নাম ঠিক করা, যে নামে আমেরিকান তথা পাশ্চাত্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ব্যাপারটাকে চিনবে। 'আল-ইসরা' নামটা প্রথমেই বর্জন করতে হবে। তা না হ'লে সন্ত্রাসবাদী মহলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে তারা কতটুকু জানে বা জানে না। সেটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। গুমিনি তার নিজস্ব কম্পিউটারে ক্রিপটোগ্রাফি অর্থাৎ সাঙ্কেতিক লিপির ফোল্ডার খুলে তার মধ্যে ক্রিপটোনিম বা সাঙ্কেতিক নামের ফাইলটা খুলল।

সাঙ্কেতিক লিপি বিভাগ বেশ কিছু গুহ্য নাম তৈরি করে এই ফাইলে আগে থাকতেই ঢুকিয়ে রাখে। এই 'ক্রিপটোনিম ব্যাঙ্ক' অর্থাৎ গুহ্য নামভাণ্ডার থেকে 'র‍্যানডম সিলেকশন' অর্থাৎ এলোপাথাড়ি বাছাই পদ্ধতিতে কম্পিউটার নিজেই যে কোনো একটি নাম বেছে দেয়। এই পদ্ধতির সুবিধে হ'ল কোনো বিষয়ের কি গুহ্যনাম দেওয়া হচ্ছে, তা কেউই জানতে পারে না। শুধুমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছেই নামটা পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই নামে সাঙ্কেতিক লিপি বিভাগ গুহ্য নাম হিসেবে নানারকম মাছের নাম ব্যবহার করছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটারের পর্দায় যে নামটা ভেসে উঠল, তা হ'ল 'প্রোজেক্ট স্টিংরে', অর্থাৎ 'কর্মপরিকল্পনা শঙ্কর মাছ'। ফাইলের ওপর মারেক গুমিনি এই নামটাই লিখে দিল।

ফাইলের শেষ পাতাটা শনিবার গভীর রাতেই যোগ করা হয়েছে। পাতায় লেখা বিষয়বস্তু অতি সংক্ষিপ্ত। হাতের লেখা যে ব্যক্তিটির, তিনি বেশি কথা বলা বা লেখা কোনোটাই পছন্দ করেন না। নীচে সই দেখে বোঝা গেল যে তিনি জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান অধিকর্তা। গুমিনি পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তার হাতে পৌঁছনোর আগে ফাইলটা তিনহাত ঘুরে এসেছে—প্রথমে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির প্রধান স্টিভ হ্যাডলি, তারপরে জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তর এবং তারপরে হোয়াইট হাউস, অর্থাৎ খোদ রাষ্ট্রপতি।

শেষ পাতাটা জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানের নিজস্ব লেটারহেড প্যাড থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে কালো কালিতে লেখা ঃ

আল-ইসরা কি?
এটা কি পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণুঘটিত,
না কি প্রচলিত অস্ত্রাভিযান?
খুঁজে বার করো ঃ কি, কখন, কোথায়?
সময়সীমা ঃ এখনই
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ঃ কিছু নেই
তোমার ক্ষমতা ঃ চরম ও অবাধ

জন নিগ্রোপন্টি

বড় অক্ষরে লেখা নামের ওপরে চেনা দস্তখত। আমেরিকায় মোট উনিশটি গুপ্ততথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা আছে। গুমিনির হাতে ধরা চিঠিটা এই উনিশটি সংস্থার ওপরেই তার সর্বময় ও শর্তহীন কর্তৃত্বের প্রমাণপত্র। লেটারহেডের ঠিক নীচে তারই নাম লেখা—অর্থাৎ নিগ্রোপন্টি চিঠিটা তাকেই উদ্দেশ্য করে লিখেছেন। সে কাগজটা নামিয়ে রাখার মুহূর্তে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

একটি তরুণ নথিপত্রবাহক ঢুকে গুমিনির দিকে সসম্ভ্রমে আরো একটা ফাইল বাড়িয়ে ধরল। ছেলেটি দৃশ্যতঃই বেশ নার্ভাস। এত উচ্চপদস্থ কারো কাছে সম্ভবত এর আগে তার আসার সুযোগ ঘটেনি। গুমিনি তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হেসে ঘাড় নাড়ল। ছেলেটির হাতে ধরা ক্লিপবোর্ডে সই করে প্রাপ্তি স্বীকার জানিয়ে গুমিনি অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ছেলেটির পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরেই সে নতুন ফাইলটার সীল ভাঙল।

নতুন ফাইলটা ফোর্ট মীডের এক সহকর্মীর মূল্যবান উপহার। তার ভেতরে দু'পাতা জুড়ে ওয়াশিংটন ফিরে যাওয়ার সময় দু'জন কোরান বিশারদের কথোপকথনের হুবহু প্রতিলিপি। দু'জনের একজন আমেরিকান ও অন্যজন ইংরেজ। এই ইংরেজ পণ্ডিতটির বলা শেষ বাক্যটি এন.এস.এর প্রেরক ব্যক্তিটি লাল কালিতে দাগিয়ে তার পাশে দুটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে থাকাকালীন মারেক গুমিনির সঙ্গে ব্রিটিশ চরদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার অন্যান্য আমেরিকান সহকর্মীরা সাদ্দাম হুসেনের শাসনাধীন ইরাকের সাংঘাতিক পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিল না। সেই কারণে তারা প্রধানত নিজেদের মধ্যেই মেলামেশা করতো। পৃথিবীর প্রধান শক্তিধর দেশের প্রতিভূ হিসেবে তাদের

BanglaBook.org

মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও কাজ করতো নিঃসন্দেহে। গুমিনি বরাবরই এইসব অর্থহীন সংস্কারের ঊর্ধ্বে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সে ভালমতোই জানতো যে এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে সি.আই.এর প্রকৃত সহযোগী বন্ধু ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। জর্ডন নদী থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্যবর্তী এই বন্ধ্যা, রুক্ষ অঞ্চল সম্পর্কে যা কিছু রহস্যময় ও গোপনীয় তথ্য বা জ্ঞান প্রয়োজন, ব্রিটিশরাই সেই জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র মালিক।

ব্রিটিশদের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক দেড়শো বছরেরও বেশি পুরোনো। প্রাচীন ইরাকি সাম্রাজ্যের দখলদার ও শাসক হওয়ার সুবাদে অসংখ্য ব্রিটিশ আমলা ও অভিযাত্রী এখানকার রুক্ষ মরুপ্রান্তর, ন্যাড়া পাহাড় ও চারণভূমি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশটার কোণে কোণে। আজ সেই অঞ্চলগুলোই কার্যত চরম বিপজ্জনক টাইম বোমায় পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটিশরাই এ দেশটাকে সবচেয়ে ভাল করে চেনে ও জানে।

ব্রিটিশ গুপ্তচরমহলে সি.আই.এ'র সাঙ্কেতিক নাম 'দ্য কাজিন্‌স' অর্থাৎ খুড়তুতো বা মামাতো ভাই। লণ্ডনে অবস্থিত সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আমেরিকানদের কাছে পরিচিত ফ্রেণ্ডস বা দ্য ফার্ম নামে (বন্ধুসকল বা প্রতিষ্ঠান)। এই এস.আই.এস.-এর এক এজেন্টের সঙ্গে গুমিনির ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। দু'জনে একসঙ্গে অনেক আমোদ-প্রমোদ যেমন করেছে, তেমনই নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে, এমনকি কয়েকবার চরম বিপদেরও মোকাবিলা করেছে। সে সব অস্থির দিনগুলি এখন স্মৃতিমাত্র। গুমিনি বর্তমানে অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। স্টিভ হিল (সেই বন্ধু) এখন ফার্মের ভক্সহল ক্রসের সদর দপ্তরে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিভাগের প্রধান।

'স্টিভের সঙ্গে একটা আলোচনা করেই দেখা যাক,' গুমিনি ভাবল। 'কোনো ক্ষতি তো নেই, বরং ভাল কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।' পেশোয়ারের ল্যাপটপ থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে, তা যেমন আমাদের কাছে আছে, তেমনই ব্রিটিশদের কাছেও আছে। সাঙ্কেতিক আরবী চিঠি দুটো এবং সেগুলোর কোরান প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি নিয়ে আমাদের মতো ওরাও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে ইতিমধ্যে।'

মারেক গুমিনির কাছে একটা জিনিস ছিল যেটা সম্ভবত ব্রিটিশ সংস্থার কাছে নেই—সেটা হ'ল মেরীল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে ওয়াশিংটন ডি.সি. অভিমুখী একটি গাড়িতে বসে এক ইংরেজ শিক্ষাবিদের উচ্চারিত একটি আপাত উদ্ভট মন্তব্য। গুমিনি তার টেবিলের একটা দেরাজ খুলে একটা ছোট টেলিফোন বার করে তাতে একটা নম্বর ডায়াল করল। দপ্তরের কেন্দ্রীয় সুইচবোর্ড চালু আছে বটে, কিন্তু সি.আই.এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পদাধিকার বলে নিজস্ব স্যাটেলাইট ফোন পেয়ে থাকেন। যোগাযোগ রক্ষাকারী কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হওয়ার দরুন এই ফোনগুলির স্পীড ডায়ালিং ব্যবস্থা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর যে কোনো ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

লণ্ডনের কাছেই সারে কাউন্টির একটি সাদামাটা বাড়িতে একটা ফোন বাজতে শুরু করল। ল্যাংলিতে সকাল আটটা, লণ্ডনে দুপুর একটা। বাড়ির বাসিন্দারা মধ্যাহ্ন

BanglaBook.org

ভোজে বসার উপক্রম করছিল। তিনবার বাজার পরে একটি পুরুষ কণ্ঠ গুমিনির কলে সাড়া দিল। স্টিভ হিল সকাল থেকে গল্‌ফ্ খেলে বাড়ি ফিরে শনিবারের জন্য বিশেষ করে রাঁধা রোস্ট বীফের টুকরো সবেমাত্র মুখে তুলতে যাচ্ছিল।

"হ্যালো?"

"স্টিভ? মারেক বলছি।"

"ওহ্ মাই ডিয়ার, তুমি কোথায়? এদিকে এসেছো নাকি?"

"আমি অফিসে আমার ডেস্কে বসে আছি। তোমার ফোনটা 'সিকিওর মোডে' নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?"

"নিশ্চয়। দু' মিনিট পরে ফোন করো।" গুমিনি শুনতে পেল স্টিভ তার স্ত্রীকে বলছে, "ডার্লিং, রোস্টটা একটু চাপা দিয়ে রাখো।" তারপরেই রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ঠিক দু' মিনিট পরে আবার কল করল গুমিনি। লণ্ডন থেকে ভেসে আসা স্টিভ হিলের কণ্ঠস্বর কিছুটা পাতলা লাগল, কিন্তু ফোন কলটা এখন পুরোপুরি বৈদ্যুতিন নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে, কেউ ট্যাপ করে শুনতে পারবে না।

"কি ব্যাপার, মারেক? আবার কি ঝামেলায় জড়ালে?" স্টিভ জিজ্ঞেস করল।

"আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি, বন্ধু," মারেক অল্প শব্দ করে হাসল। "ব্যাপারটা পেশোয়ার সংক্রান্ত। ও ব্যাপারে আমার কাছে যা খবরাখবর আছে, আশা করি তোমার কাছেও তাই।"

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। আমি কাল সন্ধেবেলাই সবটা পড়ে শেষ করেছি। ভাবছিলাম তুমি কখন ফোন করবে।"

"স্টিভ, আমার কাছে একটা খবর আছে, যেটা বোধহয় তোমার কাছে নেই। লণ্ডন থেকে একজন অধ্যাপক আমাদের এখানে কিছুদিনের জন্য এসেছে। গতকাল সন্ধেবেলা তার মুখে একটা আলগা মন্তব্য শোনা গেছে। সেই সূত্র ধরেই তোমাকে ফোন করছি। ব্যাপারটা সোজাসুজি বলি। তুমি মার্টিন নামে কাউকে জানো?"

"মার্টিন—পদবী কি?"

"মার্টিনই পদবী। তারই অধ্যাপক ভাই ডঃ টেরি মার্টিনের মুখে এই মন্তব্যটা শোনা গেছে। ....কিছু মনে করতে পারছো?"

স্টিভ হিল ফোনের রিসিভারটা শক্ত করে চেপে ধরে কিছুক্ষণ তার সামনের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, সে মার্টিনকে ভাল মতোই চেনে। ১৯৯০-৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় স্টিভ নিজে ছিল সৌদি আরবে, গুপ্ত তথ্য বিভাগের অন্যতম নিয়ন্ত্রক অফিসার। অধ্যাপক মার্টিনের ভাই সেই সময়ে চোরাপথে বাগদাদে ঢুকে একটা বাগানে সাধারণ মালি হিসেবে কাজ করতো। সাদ্দাম হুসেনের ভয়ঙ্কর গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়িয়ে সে বেশ কিছুদিন ধরে গুপ্ত ট্রান্সমিটারে ইরাকি সরকারের বহু গোপন তথ্য পাচার করেছিল। সাদ্দামেরই এক মন্ত্রী তাকে খবর সরবরাহ করতো।

"হয়তো মনে করতে পারি," স্টিভ বলল। "কেন?"

"আমি তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলতে চাই," গুমিনি উত্তর দিল। "আমি

BanglaBook.org

তোমার কাছে চলে যেতে পারি। কোম্পানির গ্রুমম্যান জেট প্লেন তৈরিই আছে।"

"তুমি কবে আসতে চাও?" স্টিভ জিজ্ঞেস করল।

"আজ রাতেই। আমি প্লেনেই ঘুমিয়ে নেব। লণ্ডনে পৌঁছে প্রাতরাশ করব।"

"ঠিক আছে। আমি নর্থহোল্টের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে রাখছি।"

"ওহ্ স্টিভ, আর একটা কথা—আমার পৌঁছনোর আগে তুমি এই মার্টিনের সম্বন্ধে তথ্য ভরা ফাইলটা বার করে রাখতে পারবে? আমি গিয়ে পুরো ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব।"

লণ্ডন থেকে পশ্চিমে অক্সফোর্ডের দিকে যে রাস্তাটা গেছে, তার ওপরেই রয়্যাল এয়ারফোর্সের নর্থহোল্ট বিমান ঘাঁটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বছর দুয়েক ধরে যখন হিথরো বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছিল, তখন নর্থহোল্টই ছিল লণ্ডনের সরকারি বিমানবন্দর। হিথরো তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে স্বভাবতই নর্থহোল্টের গুরুত্ব কমে যায়। শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দরটি ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন বড় কোম্পানির ছোট বড় জেট প্লেন নামাওঠার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নর্থহোল্ট রাজকীয় বিমানবাহিনীর সম্পত্তি। ফলে ব্রিটেনের সরকারি সংস্থাগুলি দরকার পড়লে আইনমাফিক রীতিনীতি কাটছাঁট করে উড়ানের ব্যবস্থা করে থাকে। সব থেকে বড় সুবিধা হ'ল বিমানবাহিনী এসব ক্ষেত্রে কঠোর নিরাপত্তা বজায় রাখে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই এই জাতীয় উড়ানগুলির গোপনীয়তা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ল্যাংলির খুব কাছেই সি.আই.এর নিজস্ব বিমানক্ষেত্র। সেখানে সব সময় কয়েকটি জেট প্লেন উড়ানের জন্য তৈরি অবস্থায় রাখা থাকে। নিগ্রোপন্টির সই করা কাগজটির জোরে গুমিনি সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক ও দ্রুতগামী 'গ্রুমম্যান ফাইভ' জেট প্লেনটিতে চড়ে লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হ'ল। বিমানটির ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে আরামে ঘুমিয়ে সে নর্থহোল্টে নেমে দেখল স্টিভ হিল তার জন্য অপেক্ষা করছে।

গুমিনি ভেবেছিল স্টিভ হিল তাকে ভক্সহল সেতু পেরিয়ে টেমস্ নদীর দক্ষিণ তীরে এস.আই.এস-এর সদর দপ্তর ভক্সহল ক্রসে নিয়ে যাবে। তার বদলে হিল তাকে নিয়ে গেল নর্থহোল্ট থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ক্লাইভডেন হোটেলে। হোটেলটা আগে ছিল এক লর্ডের প্রাসাদ। তার চারদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা বিশাল ফুল-ফলের বাগান। এইখানে হিল একটা ছোট স্যুইট ভাড়া করে নিয়েছে। 'রুম সার্ভিস' আছে, সুতরাং নীচে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার দরকার নেই। নিভৃতে ও গোপনে আলোচনার জন্য উপযুক্ত স্থান।

আমেরিকান কোরান কমিটির বিশ্লেষণ খুঁটিয়ে পড়ার সময় স্টিভ লক্ষ্য করল যে শেলটেনহ্যামের দপ্তর থেকে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা প্রায় হুবহু এক। সব শেষে সে পড়ল লিমোসিনে ভ্রমণরত দুই শিক্ষাবিদের কথোপকথনের প্রতিলিপি।

"বোকার হদ্দ!" শেষ বাক্যটা পড়ার পরে সে মন্তব্য করল। "বয়স্ক আরবী বিশারদ লোকটিই সঠিক। এরকমটা করা অসম্ভব। শুধুমাত্র অনর্গল আরবী বলতে পারলেই হবে না। অন্য ব্যাপারগুলোই আসল। কোনো অমুসলমান বিদেশীর পক্ষে ওদের চোখ এড়ানো অসম্ভব।"

"শোনো", মারেক গুমিনি বলল, "আমার কাছে নির্দেশ এসেছে একেবারে

BanglaBook.org

সর্বোচ্চ তলা থেকে। কাজটা আমাকে করতেই হবে। তুমি কি বলছো?"

"আল-কায়দার কাউকে খুঁজে বার করো," স্টিভ হিল বলল। "পিটুনি দিয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করো।"

"স্টিভ, আল-কায়দার সর্বোচ্চ স্তরের লোক ছাড়া অন্য কেউ এই পরিকল্পনা বা অভিযান সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবে না। আমরা যদি সেরকম উঁচুতলার কোনো জঙ্গির পরিচয় জানতাম, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তুলে নিতাম। কিন্তু সেরকম কারো পরিচয় বা অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনোরকম তথ্য বা খবর নেই।"

"তাহলে অপেক্ষা করো, নজরদারি জারি রাখো। কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও, এই বিশেষ শব্দগুলো উল্লেখ করবেই করবে।"

"আমেরিকাতে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে "আল-ইসরা" মানে যদি জোড়া মিনার ধ্বংসের মতোই আর একটা বিশাল দৃষ্টি-আকর্ষক ধ্বংসলীলার পরিকল্পনা হয়, তাহলে এর লক্ষ্যবস্তু নিঃসন্দেহে আমেরিকাতেই অবস্থিত। আল-কায়দার উচ্চপদস্থ কাউকে আমরা ধরতে পারবো এবং তার কাছ থেকে গোটা পরিকল্পনাটা জেনে যাব, এ ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিকের পর্যায়ে পড়ে। এই অলৌকিক ঘটনাটি কবে আপনা হতে ঘটবে, সেজন্য ওয়াশিংটন ডি.সি. আমাদের সময় দিতে একেবারেই রাজি নয়। তাছাড়া, আল-কায়দার কাছে নিশ্চয়ই এতদিনে খবর পৌঁছে গেছে যে ল্যাপটপটা আমাদের আওতায় এসে গেছে। ফলে তারা হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে কথা বলার সময় বাদে অন্য কোথাও এই শব্দগুলো ব্যবহার করবে না।"

হিল বলল, "তাহলে আর একটাই কাজ করা যেতে পারে। সঠিক জায়গামতো খবর ছড়িয়ে দাও যে আমরা সব কিছু জেনে গেছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। আল-কায়দা তাহলে পুরো ব্যাপারটাই পরিত্যাগ করবে।"

"হতে পারে, আবার নাও হতে পারে," শুমিনি বলল। "কিন্তু আমরা তো জানতে পারব না। 'প্রোজেক্ট স্টিংরে' বাতিল করা হয়েছে, না বানচাল হয়ে গেছে, আমরা তো তা জানতে পারব না। আর যদি এর একটাও না হয়? যদি ব্যাপারটা ঘটে? মাধ্যমটা কি, তা তো জানতেই হবে। আমার বস্ যেরকম বলেছেন—মাধ্যমটা পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণুঘটিত না কি প্রচলিত অস্ত্র? কখন? কোথায়? ....তোমার এই মার্টিন কি আরবদের ধোঁকা দিয়ে তাদের মধ্যে আরব সেজে থাকবার ক্ষমতা ধরে?"

"অনেকদিন আগে তার এই ক্ষমতা ছিল," হিল অনিচ্ছুক স্বরে জবাব দিল। "এখন তুমি নিজেই কথা বলে দেখো। এই নাও ওর ফাইল।"

ফাইলটা কাগজপত্র সহ এক ইঞ্চি পুরু। সাধারণ কার্ডবোর্ড ফাইল, ওপরে মার্কিং কলমে শুধু লেখা "কর্নেল মাইকেল মার্টিন"।

মার্টিন ভাইদের দাদামশায়, অর্থাৎ মা'র বাবা, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দার্জিলিঙে চা বাগান চালাতেন। তিনি এমন একটা কাজ করেছিলেন যা তখনকার দিনে অকল্পনীয় ছিল—তিনি একটি ভারতীয় তরুণীকে বিয়ে করেন।

হিমালয়ে ব্রিটিশ টি-প্ল্যান্টারদের জগৎটা ছিল ছোট এবং দুর্গম। চা বাগানের ইংরেজ মালিক ও ম্যানেজাররা যথেষ্ট নাক-উঁচু, দাম্ভিক মানুষ ছিল। তাদের বউরা আসতো ইংল্যাণ্ড থেকে। যদি বা ভারতে কেউ বিয়ে করতো, তাহলে কনে হ'ত কোনো

BanglaBook.org

উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের মেয়ে। মাইক এবং টেরি তাদের দাদামশায়ের ছবি দেখেছিল। তাঁর নাম টেরেন্স গ্র্যাঞ্জার—লম্বা, গোলাপি মুখ, সোনালি গোঁফ, দাঁতে চেপে ধরা পাইপ, হাতে বন্দুক; বাঘ শিকারের সখ ছিল। ছবিতে একটা গুলি করে মারা বাঘের ওপর একটা পা চাপিয়ে গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন।

অ্যালবামের পরের পাতাতেই এক অতীব সুন্দরী বঙ্গ ললনার ছবি—মিস ইন্দিরা বোস অতি শান্ত, স্নেহপরায়ণ ও শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। চা কোম্পানির বড় সাহেবরা সকলে মিলে কিছুতেই টেরেন্স গ্র্যাঞ্জারকে এই বিয়ে না করার জন্য রাজি করাতে পারলেন না। তাঁকে বরখাস্ত করাও মুশকিল, কারণ তাহলে কোম্পানির বদনাম হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। শেষে সমস্যার একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান খুঁজে বার করা গেল। নববিবাহিত দম্পতিকে ব্রহ্মদেশের সীমানা ঘেঁষে আসামের এক দুর্গম, বন্য অঞ্চলের চা বাগানে বদলি করে দেওয়া হ'ল।

গ্র্যাঞ্জার ও তাঁর তরুণী বাঙালি পত্নী কিন্তু এটাকে মোটেই শাস্তি হিসেবে নিলেন না। বরং নানারকম পশুপাখি ও অজানা গাছপালায় পরিপূর্ণ দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের সহজ, সরল জীবন তাঁদের অপরিমেয় এক সুখ শান্তির সন্ধান দিল। ১৯৩০ সালে সুজানের জন্ম হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও হিংস্রতা এই সুখী পরিবারটিকে ছুঁতে পারল না প্রথমে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ হয়ে যুদ্ধ আসামে ঢুকে পড়ল। এর এক বছর আগেই টেরেন্স গ্র্যাঞ্জার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন, যদিও তাঁর তখন যা বয়স, তাতে সক্রিয় সৈন্যরূপে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার দরকার ছিল না। জাপানি সেনাবাহিনী যখন ব্রিটিশ এবং আমেরিকান যৌথ প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে পিছু হটতে শুরু করল, সেই সময়ে ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে টেরেন্স নিহত হলেন।

চা কোম্পানি থেকে ইন্দিরা গ্র্যাঞ্জারের জন্য সামান্য পরিমাণ 'উইডো পেনশন' ধার্য করা হ'ল। অসহায় ইন্দিরা পনেরো বছর বয়স্কা কন্যা সুজানকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় তাঁর পরিচিত মহলে ফিরে গেলেন। যুদ্ধ শেষ হ'ল, কিন্তু দু' বছর পরে পুনরায় প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও ডামাডোল শুরু হ'ল। ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল। সৃষ্টি হ'ল ইসলামিক রাষ্ট্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় উত্তাল হয়ে উঠল পরিবেশ। এর কিছু আগে কলকাতাতেও ঘটে গেছে সাংঘাতিক দাঙ্গা। ইন্দিরা থাকতেন কলকাতার সাহেব পাড়ায়। ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭-এর কিছুদিন পর থেকেই ইংরেজ পরিবারগুলি বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে একে একে স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হতে লাগল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতীয়দের মধ্যে তখন ইংরেজ বিদ্বেষ ক্রমবর্ধমান। ইন্দিরা সুজানকে আর নিজের কাছে রাখতে ভরসা পেলেন না। টেরেন্সের ছোট ভাই থাকতেন ইংল্যাণ্ডের সারে কাউন্টির হ্যাস্‌লমীয়ারে, পেশায় স্থপতি, স্বভাবে পাকা ইংরেজ। ইন্দিরার অনুরোধে তিনি সুজানকে নিজের কাছে রাখতে সম্মত হলেন। সুজান ইংল্যাণ্ড চলে যাওয়ার ঠিক ছ'মাস পরে ইন্দিরা এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হলেন।

সুজান যখন তার অদেখা পিতৃভূমিতে জীবনে প্রথম এসে পৌঁছল, তখন তার বয়স সতেরো। এক বছর পড়াশোনা করে হাইস্কুল পাস করার পর তার জীবনের

BanglaBook.org

পরবর্তী তিনটি বছর কাটল ফার্নহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে নার্সের কাজ করে। একুশ বছর বয়সে, প্রাপ্তবয়স্কের অধিকার অর্জন করার পরেই, সে ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনে এয়ার হোস্টেস পদের জন্য আবেদন করল। বি.ও.এ.সি. তাকে লুফে নিল। কারণ, প্রথমতঃ সে পরমা সুন্দরী। মাথার চুল ঘন ও উজ্জ্বল বাদামি, চোখ তার বাবার মতোই নীল, গায়ের রঙ ইংরেজদের মতো ধবধবে ফর্সা। মা'র কাছ থেকে পাওয়া ভারতীয় পেলবতা এবং ইংরেজ বাবার কাঠিন্যের এক চমকপ্রদ সমন্বয়। এবং দ্বিতীয়ত ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ও হিন্দি দুটো ভাষাতেই সে সমান দক্ষ ও স্বচ্ছন্দ।

ট্রেনিংয়ের পর বি.ও.এ.সি. তাকে নিযুক্ত করল লণ্ডন-বম্বে ও লণ্ডন-কলকাতা উড়ানগুলিতে। বিমানযাত্রা সেই সময়ে অত্যন্ত ধীরগতি ছিল। বম্বে আসতে গেলে বিমান আসতো রোম-কায়রো হয়ে বসরা; সেখান থেকে বাহ্‌রাইন-করাচি হয়ে বম্বে, সব শেষে কলকাতা। বিমানের কর্মীরা কেউই পুরো যাত্রাটা একটানা কাজ করতে পারতো না। দক্ষিণ ইরাকের বসরা বিমানবন্দরে পৌঁছে সবাই বিশ্রাম নিত। নতুন কর্মীরা বিমান নিয়ে যেত বাকি তিনটি শহরে। ১৯৫১ সালে বসরা কানট্রি ক্লাবে আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির হিসাব রক্ষক নাইজেল মার্টিনের সঙ্গে সুজানের আলাপ হল। ১৯৫২ সালে তাদের বিয়ে হ'ল।

বিয়ের দশ বছর বাদে জন্মাল তাদের প্রথম ছেলে মাইকেল। তার তিন বছর বাদে এলো টেরেন্স বা টেরি। দেখা গেল দুই সহোদর ভাইয়ের চেহারা এবং স্বভাব সম্পূর্ণভাবে একে অপরের বিপরীত।

ফাইলের ভেতরে আটকানো ফটোগ্রাফটার দিকে মারেক গুমিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। রোদে পোড়া তামাটে সাদা গাত্রবর্ণ নয়, বরং প্রকৃতিদত্ত বাদামী রঙ, কুচকুচে কালো চুল, কালো চোখ। জর্জটাউনের মোটাসোটা গোলাপি মুখ, সোনালি চুল অধ্যাপক ভাইয়ের সঙ্গে এর আদৌ কোনো মিল নেই। আগে থেকে না জানলে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে এরা সহোদর ভাই। মারেক বুঝতে পারল যে দিদিমার জিন একপুরুষ টপকে নাতির মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক বেন জোলির কথাগুলো তার মাথার মধ্যে নড়েচড়ে উঠল। আরবদের মধ্যে আরব হয়ে থাকতে গেলে যে কোনো পশ্চিমী ব্যক্তিকে কথায়, চেহারায়, আচারে এবং আচরণে শতকরা একশো ভাগ নিখুঁত হতে হবে। না হলে আল-কায়দার মধ্যে ঢুকতে পারলেও সে কয়েক দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে। বাল্য ও কৈশোরের বিভিন্ন তথ্যের ওপর গুমিনি এবার দ্রুত চোখ বোলাতে শুরু করল।

দুই ভাই-ই পড়তো অ্যাংলো-ইরাকি স্কুলে, যেখানে তাদের সহপাঠীরা প্রায় সকলেই ইরাকি। এছাড়া বাড়িতে ছিল তাদের 'ডাডা' বা আয়া ফতিমা। আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিতে পুরোদস্তুর নৈপুণ্য অর্জন করতে তাদের অসুবিধে হয়নি।

এক জায়গায় একটা ছোট ঘটনার বিবরণের ওপর গুমিনির চোখ আটকালো। সম্ভবত টেরি মার্টিনের কাছ থেকেই তথ্যটা জানা গেছে। একদিন বাগদাদের উপকণ্ঠে সাদুনে তাদের বাড়ির লনে এক পার্টি চলাকালীন সাদা ইরাকি ডিশডাশ পরিহিত বড় ছেলেটা দৌড়াদৌড়ি করছিল। তার বাবার ইরাকি অভ্যাগতরা উৎফুল্ল স্বরে মন্তব্য করেছিল, "কিন্তু নাইজেল, তোমার বড় ছেলে তো ইংরেজ নয়, ও তো পুরোপুরি

BanglaBook.org

আমাদেরই মতো!"

'পুরোপুরি আমাদেরই মতো,' মারেক গুমিনি ভাবল—অর্থাৎ পুরোপুরি ওদেরই মতো। বেন জোলির চারটে আপত্তির মধ্যে দুটো আর টিঁকছে না। চেহারায় এবং মাতৃভাষার মতোই আরবী বলার দক্ষতায় মাইক মার্টিন আরবদের মধ্যে আরব হয়ে মিশে যেতে পারে। তীব্র ও প্রগাঢ় অনুশীলন করালে কি প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার -আচরণগুলোও একে নিখুঁতভাবে রপ্ত করানো যাবে না? ভিত্তি তৈরিই আছে, নিপুণ শিক্ষকের হাতে পড়লে....

গুমিনি আরো কিছুটা পড়ল। ১৯৭২ সাল থেকে ইরাকের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেন বিদেশী কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই জাতীয়করণ হ'ল অ্যাংলো-ইরাক পেট্রোলিয়াম, যে কোম্পানির হিসাবরক্ষক ছিলেন নাইজেল মার্টিন। ইরাকের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহাওয়া দ্রুত পাল্টাতে শুরু করল। নাইজেল আরো তিন বছর ইরাকে রয়ে গেলেন। শেষ অবধি ১৯৭৫ সালে সপরিবারে ইংল্যাণ্ডে চলে এলেন। মাইকের বয়স তখন তেরো, সে হেইলিবেরি সিনিয়র স্কুলে ভর্তি হ'ল।

"একে দিয়ে কাজটা সম্ভব হতেও পারে, বুঝেছো," সে স্টিভ হিলকে বলল। "যদি যথেষ্ট ভাল করে ট্রেনিং দেওয়া যায়, আর সঙ্গে আমাদের সব রকম সহায়তা থাকে, তাহলে সত্যিই ও কাজটা করতে পারবে। ও এখন আছে কোথায়? কি করছে?"

"পুরো সামরিক জীবনটা ও কাটিয়েছে প্যারাট্রুপারস এবং স্পেশাল ফোর্সেস-এর সদস্য হিসেবে। মাঝে দু'বার অবশ্য আমাদের হয়ে কাজ করেছিল। পঁচিশ বছর সার্ভিস পূর্ণ করে গত বছর অবসর নিয়েছে। সে যাই হোক, আমি বলছি, কাজটা এভাবে হওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন স্টিভ? এর সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণগুলোই আছে।"

"সামরিক পটভূমির কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছো—বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, জন্মস্থান—আল-কায়দা প্রতিটি তথ্য দু'তিন বার করে পরীক্ষা করবে। তাছাড়া, আল-কায়দাতে একমাত্র আত্মঘাতী জঙ্গি হিসেবে তুমি সরাসরি ঢুকতে পারো। আল-ইসরার মতো বিশাল জঙ্গি কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অংশীদার হওয়ার আগে তোমাকে বেশ কয়েক বছর ওদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তোমার চরিত্র, কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি সব কিছু ওদের চোখে উচ্চস্তরের বলে প্রতিপন্ন হলে তবেই তুমি ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে পারবে। এই ব্যাপারটাই ঘটানো অসম্ভব, মারেক একেবারেই অসম্ভব। একমাত্র যদি...."

"একমাত্র যদি....কি?" উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল গুমিনি।

"আমি ভাবছিলাম যদি মার্টিনের একটা জোড়া পাওয়া যায়। যার চেহারা ওর সঙ্গে মেলে। তাহলে তার জায়গায় তার পরিচয়ে ও ঢুকে পড়তে পারবে। কিন্তু এটাও করা যাবে না। সে লোকটা যদি এখনো বেঁচে থাকে, তাহলে আল-কায়দা তা জানবে। যদি মরে গিয়ে থাকে, তাও ওরা জানবে। সুতরাং....নাঃ, এ হওয়ার নয়।"

গুমিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "এই ফাইলটা অনেক বড়। আমি এটা নিয়ে যেতে পারি?"

BanglaBook.org

"এটা একটা কপি। তবুও....কেবল তোমার দেখার জন্য?"

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। আমি ছাড়া অন্য কেউ এ ফাইল দেখবেও না, পড়বেও না। আমার ব্যক্তিগত সেফে থাকবে। কাজ না হলে সোজা পুড়িয়ে ফেলব।"

সি.আই.এর ডেপুটি ডাইরেক্টর (অপারেশনস্) সেদিনই ল্যাংলিতে ফিরে গেল। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই ভক্সহল ক্রসের দপ্তরে স্টিভ হিলের কাছে পুনরায় তার ফোন কল এলো।

"আমি তোমার কাছে আবার যাচ্ছি," কোন ভূমিকা না করে বলল গুমিনি। স্টিভ ও মারেক গুমিনি দু'জনেরই ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে যে ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের ভদ্রলোকটি হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা বন্ধুকে কথা দিয়েছেন যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 'প্রোজেক্ট স্টিংরে'র ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা করা হবে। সুতরাং স্টিভ হিলের হাত-পা বাঁধা। মাইক মার্টিনের সঙ্গে সি.আই.এর যোগাযোগ তার পক্ষে আর কিছুতেই ঠেকানো সম্ভব নয়।

"ঠিক আছে, মারেক। কোনো রাস্তা খুঁজে পেয়েছো?"

'মার্টিনের জোড়া পেয়ে গেছি," গুমিনি উত্তর দিল। "বয়সে বছর দশেক ছোট, কিন্তু চেহারায় অনেক বয়স্ক লাগে। চেহারার গড়ন, উচ্চতা একই। একই রকম তামাটে মুখ চোখ, কালো চুল দাড়ি। আল-কায়দার পুরোনো ঝানু সৈনিক।"

"শুনতে খারাপ লাগছে না। কিন্তু সে শয়তানদের সঙ্গে নেই কেন?"

"কারণ সে গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের হাতে। গুয়ানতানামোয় বন্দী হয়ে আছে।"

"লোকটা আরব?" হিল বিস্মিত বোধ করল। গত পাঁচ বছর ধরে গুয়ান-তানামোতে আল-কায়দার গুরুত্বপূর্ণ এক আরব জঙ্গি বন্দী হয়ে আছে, আর সে নিজে এ বিষয়ে কিছু জানে না?

"না। লোকটা আফগান। নাম ইজমৎ খান। আমি এখনই রওনা হচ্ছি, গিয়ে কথা বলব।"

টেরি মার্টিন এক সপ্তাহ ধরে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। ফোর্ট মীড থেকে ফিরে আসা থেকে তার মাথায় সব সময় একটাই কথা ঘুরছিল—'ওহ্ কি করে আমি ওই নির্বোধ মন্তব্যটা করলাম!' তার কি দরকার ছিল ভাইয়ের সম্বন্ধে দম্ভ করার? বেন জোলি যদি কাউকে বলে থাকে? ওয়াশিংটনে মুখে মুখে কথা ফেরে। এন.এস.এর কাছে যদি কথাটা পৌঁছে গিয়ে থাকে? দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে টেরি তার ভাইকে ফোন করল। তার ওই বিশেষ মন্তব্যটি করার পরে ইতিমধ্যে সাত দিন কেটে গেছে।

মাইক মার্টিন তার পল্লীভবনের ছাদের শেষ আস্ত টালিগুলো সাবধানে তুলে সরিয়ে রাখছিল। এইবার ছাদের ওপর জলনিরোধক ফেল্ট লাগিয়ে তার ওপর কাঠের লম্বা তক্তা পেরেক দিয়ে গেঁথে দিতে পারলেই মোটামুটি ছাদের কাজ শেষ। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই টালি বসিয়ে পুরোপুরি জলনিরোধক ছাদ তৈরি করা হয়ে যাবে। এই সময়ে তার মোবাইল ফোনের মিষ্টি রিং টোনের বাজনা কানে এলো। ফোনটা তার

BanglaBook.org

লেদার জ্যাকেটের পকেটে। জ্যাকেটটা একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা ছিল। খুব সাবধানে পুরোনো কড়িকাঠগুলো ডিঙিয়ে সে ফোনটা বার করল। স্ক্রিনে নাম ও নম্বর দেখে বুঝল ওয়াশিংটন থেকে তার ছোট ভাই ফোন করছে।

"হাই টেরি!" সে মজা করার মতো গলায় সম্ভাষণ জানাল।

ওদিক থেকে টেরির কণ্ঠস্বর বেশ নার্ভাস শোনাল। "ভাই, আমি একটা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলেছি, সেজন্য তোমার কাছে মাফ চাইছি। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে আমি এক সিনিয়র সহকর্মীর সামনে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি।"

"বাঃ চমৎকার! তা সে মন্তব্যটা কি?"

"সে যাই হোক না কেন—ভাই শোনো, যদি পাক্কা স্যুট-বুট পরা কিছু লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে—তুমি বুঝতেই পারছো আমি কাদের কথা বলছি—তুমি তাদের সোজা ভাগিয়ে দিও। আমি যে কথাটা বলেছি সেটা একেবারেই বোকা বুদ্ধুর মতো—আমি সেজন্যে আবার ক্ষমা চাইছি—কিন্তু যেরকম বললাম, সেই ধরনের লোকেরা যদি তোমার কাছে—"

গোলাবাড়ির ছাদটা অনেক উঁচু। সেখান থেকে মাইক দেখতে পেল একটা মস্ত কালচে-ধূসর রঙের জাগুয়ার গাড়ি ধীরে ধীরে আঁকাবাঁকা মেঠো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে।

"ঠিক আছে, ভাই," সে শান্ত স্বরে বলল, "মনে হচ্ছে তারা এসে গেছে।"

দুই গুপ্তচর সংস্থার দুই কর্তা ফোল্ডিং ক্যাম্প চেয়ারে বসে কথা বলছিল। একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর বসে মাইক শুনছিল। আমেরিকান লোকটি তার কথা শেষ করার পর সে নিঃশব্দে একটা ভুরু তুলে স্টিভ হিলের দিকে তাকাল। স্টিভ এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

"বল এখন তোমার কোর্টে, মাইক," স্টিভ বলল। "আমাদের সরকার এই ব্যাপারে আমেরিকান সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছে। ওরা যা চায়, বা যা কিছু ওদের দরকার, সে সব আমরা সাধ্যমতো জোগান দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে কেউ যদি 'ফেরার সম্ভাবনা নেই' এমন কোনো কাজে যেতে অস্বীকার করে, তবে তার ওপর কোনরকম চাপ সৃষ্টি করা হবে না—কিছুতেই না।"

"যে কাজটার কথা বলছ, সেটা কি ওই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে?"

"না," মারেক গুমিনি বলে উঠল, "আমাদের তা মনে হয় না। আমরা শুধু আল-কায়দার সঙ্গে যুক্ত একটা সিনিয়র লোকের নাম-পরিচয় জানতে চাই। এইরকম অনেকে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকাতেই সম্ভ্রান্ত পেশার আড়ালে লুকিয়ে আল-কায়দার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই রকম এমন একটা লোকের খোঁজ চাই যে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানে। এই খোঁজটা পেলেই আমরা তোমাকে রাত করে নিয়ে আসব। লোকটাকে ধরতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। তারপর তার কাছ থেকে কিভাবে কথা আদায় করতে হয়, তা আমরা জানি। আল-কায়দার এই গুপ্ত অভিযানটা আমরা তাহলে সমূলে বানচাল করে দিতে পারব।"

"কিন্তু ওদের মধ্যে থেকে ওদের হয়ে কাজ করা....আমার মনে হয় না আমার

BanglaBook.org

পক্ষে এখন আর আরব সেজে থাকা সম্ভব হবে। পনেরো বছর আগে বাগদাদে আমি গরীব মালি সেজে, মালির কাজ করে খবর সংগ্রহ করেছিলাম বটে। কিন্তু সে ব্যাপারটা ছিল আলাদা। সাদ্দামের গুপ্ত পুলিশবাহিনী 'মুখাবারাত'-এর কাছে আমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই তাদের জেরার মুখে পড়ারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন যা বলছ, তাতে আমাকে ওরা খুঁটিয়ে জেরা করবেই। ওদের পক্ষে সন্দেহ করাটা স্বাভাবিক। কি গ্যারান্টি আছে যে পাঁচ বছর আমেরিকানদের অধীনে থাকার পর লোকটা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়নি?"

"ঠিক কথা, আমরা জানি ওরা তোমাকে জেরা করবে। কিন্তু খুব সম্ভবত ওরা কোনো একজন উচ্চপদস্থ লোককে আনবে তোমাকে জেরা করার জন্য। এরকম জেরা বেশ কয়েকদিন ধরে চলে। সুতরাং লোকটার পরিচয় তার মধ্যে জেনে নেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না। এই জেরা চলাকালীন সুযোগ বুঝে তোমাকে পালিয়ে আসতে হবে, আর লোকটার পরিচয় জানিয়ে দিতে হবে। আমরা তোমার কাছাকাছিই থাকব সব সময়। তুমি বেরিয়ে আসতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমরা তুলে নেবো।"

গুয়ানতানামোর বন্দীটি সম্পর্কিত ফাইলটার ওপর মাইক তর্জনী দিয়ে টোকা মারল। "এই লোকটা জাতে আফগান। ভূতপূর্ব তালিবান। তার মানে জাতে পাশতুন। আমি পুশতু ভাষা তেমন ভাল বলতে পারি না। এই ষড়যন্ত্রে যদি আর একটাও আফগান জড়িত থাকে, তাহলে সে মুহূর্তের মধ্যে আমাকে ধরে ফেলবে। আমার কথা শুনলেই সে বুঝবে যে পুশতু আমার মাতৃভাষা নয়।"

"মাইক," স্টিভ হিল বলল, "বেশ কয়েক মাস ধরে দক্ষ শিক্ষকেরা তোমাকে কোচিং দেবে। তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হতে পারছ যে তুমি কাজটার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, ততক্ষণ তোমার যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। এমনকি তখনো যদি তোমার মনে হয় যে কাজটা করা সম্ভব নয়, তাহলেও তোমায় যেতে হবে না। আর তাছাড়া তুমি থাকবে আফগানিস্তান থেকে অনেক দূরে। এই আফগান মৌলবাদীদের একটা ব্যাপার আছে—ওরা নিজের দেশের বাইরে গিয়ে কোনো জঙ্গি কার্যকলাপ চালাতে চায় না। তোমার কি মনে হয়—একজন অল্পশিক্ষিত পাশতুনের মতো পুশতু উচ্চারণে বাজে আরবীতে কথা বলতে পারবে না?"

মাইক মার্টিন সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, "হয়তো পারবো। কিন্তু মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছেড়ে লোকগুলো যদি এমন কাউকে এনে হাজির করে, যে এই লোকটাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনতো? এরকমটা যদি হয়?"

আমেরিকান ও ইংরেজ দুই গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাই এ কথায় চুপ করে রইল। মাইক যা বলল তা ঘটতেই পারে এবং তার ফল কি হবে তাও কারো অজানা নয়। মারেক গুমিনি ও স্টিভ হিল দুজনেই শূন্যদৃষ্টিতে চারপাশের গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইল। মাইক মার্টিন কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ফাইলটা তুলে নিয়ে খুলে ফেলল। প্রথম পাতাটা খুলেই সে দেখতে পেল একটা ফটোগ্রাফ—সেটার দিকে তাকিয়ে সে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে গেল।

ফটোর মুখটার বয়স পাঁচ বছর বেড়ে গেছে। নির্মম অত্যাচার ও যন্ত্রণার ছাপ সেই মুখে স্পষ্ট। দেখে মনে হয় তার বয়স আরো দশ বছর বেশি। কিন্তু মাইকের চিনতে

BanglaBook.org

ভুল হ'ল না। এ সেই পর্বতকন্দরবাসী ছেলেটা—কালা'-ই-জঙ্গিতে প্রায় মরতে বসা রক্তাক্ত শরীর....

"আমি একে চিনি," সে শান্ত স্বরে বলল। "এর নাম ইজমৎ খান।"

মারেক গুমিনি চমকে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে মাইকের দিকে চেয়ে রইল। "একে তুমি চেনো মানে? তা কি করে সম্ভব? যেদিন থেকে ও ধরা পড়েছে, সেই থেকে পাঁচ বছর ধরে ও গুয়ানতানামোর একটা সেলের মধ্যে আটক হয়ে আছে।"

"আমি জানি," মাইক বলল। "কিন্তু তারও অনেক বছর আগে আমরা তোরা-বোরায় রাশিয়ান ফৌজের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়েছিলাম।"

মারেক ও স্টিভ দু'জনেরই মাইক মার্টিনের ফাইলের বিশেষ কয়েকটা পাতায় টাইপ করা তথ্যগুলো মনে পড়ে গেল। ঠিক কথা, মাইককে এক বছরের জন্য আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছিল, সোভিয়েত রাশিয়ার দখলকারীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সংগ্রামে সে মদত দিয়েছিল। সম্পূর্ণ কাকতালীয় ব্যাপার যে সেদিনের তরুণ মুজাহিদ যে ইজমৎ খানের সহায়তা করেছিল মাইক, আজ তারই জালসাজ রূপে মাইককে হয়তো যেতে হবে আল-কায়দার এক নৃশংস ও বিধ্বংসী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে। দশ মিনিট ধরে স্টিভ ও মারেক ইজমৎ খান সম্বন্ধে মাইককে জিজ্ঞাসাবাদ করল, যদি এই আফগান সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

"ইজমৎ খান এখন কিরকম?" মাইক জিজ্ঞেস করল। "ক্যাম্প ডেল্টায় তোমাদের লোকজনের খপ্পরে পাঁচ বছর ধরে রয়েছে তো, তার স্বভাব চরিত্রে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে?"

মারেক গুমিনি কাঁধ ঝাঁকাল। "লোকটা অদম্য, মাইক। দুর্দান্ত কঠিন চরিত্র। যখন প্রথম ধরে আনা হ'ল, তখন মাথায় গভীর ক্ষত, প্রচণ্ড রকম আহত। বন্দী করার সময় হিংস্র জন্তুর মতো লড়েছিল, সেই সময়েই মাথায় লাগে। প্রথমে আমাদের ডাক্তাররা ভেবেছিল যে লোকটা বোধহয় মানসিক প্রতিবন্ধী, নয়তো নির্বোধ। বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই। পরে বোঝা গেল যে মাথার আঘাত, আর সেই সঙ্গে আফগানিস্তান থেকে গুয়ানতানামো পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রা, এই দুই মিলে তার মানসিক গঠনে একটা বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে। ....এই সময়টা হ'ল ২০০১ সালের ডিসেম্বর, জোড়া মিনার ধ্বংস হওয়ার কিছুদিন পরেই। ডাক্তাররা ওকে সুস্থ করে তোলার পর জেরা শুরু করা হয়েছিল। প্রশ্নকারীদের ব্যবহার....আহ্..... মানে, ঠিক ভদ্র বা ভাল ছিল না.....

"ও তোমাদের কি বলেছিল?"

"বিশেষ কিছু না। মোটামুটি আত্মপরিচয় দিয়েছিল। তারপরে তো কিছু বলছে না দেখে থার্ড ডিগ্রি মারধর শুরু হ'ল। তাতেও কিছু হয়নি, কারণ লোকটার শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সাংঘাতিক তেজী। সুতরাং তারপরে ওকে কয়েকটা বিশেষ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল....গুপ্ত তথ্য বলে দিলে কিছু সুযোগ সুবিধে মিলবে, এই আর কি। তাতেও সাড়া দেয়নি। এখনও, কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে শুধু প্রশ্নকর্তার চোখে চোখ রেখে চুপ করে তাকিয়ে থাকে.....দৃষ্টিটা ভয়াবহ, রাগ আর ঘৃণা ভর্তি। সেই জন্যেই ওকে সব সময় তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়। আর সেলের বাইরে চব্বিশ ঘন্টা প্রহরী থাকে।

BanglaBook.org

"অন্য বন্দীদের কাছ থেকে জেনেছি যে ও কাজ চালানোর মতো আরবী বলতে পারে। আফগানিস্তানে মাদ্রাসায় কোরান মুখস্থ করতো; তার পরে আল-কায়দার কিছু আরব জঙ্গির সঙ্গে মেলামেশাও হয়েছিল। দু'জন আল-কায়দার স্বেচ্ছাসেবী ছোকরাকে আমরা ওর সঙ্গে কিছুদিন একই সেলে রেখেছিলাম—যদি কিছু কথা বেরোয়, এই আশায়। ওই দু'জনই জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক। ওরা দু'জনে জবানবন্দীতে বলেছে যে ইজমৎ খানকে ওরা কিছুটা ইংরেজি বলতে শিখিয়েছিল। ওদের দু'জনকে আমরা ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ পাঠিয়েছি।"

মাইক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্টিভ হিলের দিকে তাকাল। সে বলল, "এই দু'জনকেই ফের গ্রেপ্তার করে আটক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।"

হিল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। "নিশ্চয়ই, সে ব্যবস্থা হবে।"

ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠাণ্ডাও বাড়ছে ক্রমশ। তারা যেখানে বসেছিল, তার কাছেই এক জায়গায় বেশ কিছু শুকনো ডালপালা এবং পুরোনো কাঠের টুকরো স্তূপ করে রাখা ছিল। মাইক উঠে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে ফেলল। মারেক গুমিনি চেয়ার থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙে পায়চারি শুরু করল। মাইক ফের তার আসনে বসে আগুনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে কিছু চিন্তা করতে লাগল। তার চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল একটা ন্যাড়া, রুক্ষ, পাথুরে পাহাড়ের সানুদেশ। কয়েকটা বড় বড় পাথরের আড়ালে দু'জন মানুষ—তাদের থেকে কিছুটা দূরে একটা সোভিয়েত 'হাইণ্ড' হেলিকপ্টার, তার মেশিনগান দু'টোর নল ঘুরে যাচ্ছে তাদের দিকে—মাথায় আলগা পাগড়ি বাঁধা ছেলেটা ফিস ফিস করে বলছে, "আংলিজ, আমাদের কি ওরা মেরে ফেলবে?" গুমিনি ঘুরে এসে উবু হয়ে বসে একটা লম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে আগুনটা খোঁচাল। একরাশ স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে মাইকের চোখের সামনে থেকে ছবিটাকে সরিয়ে দিল।

"তুমি তো বড় কাজ হাতে নিয়েছ, মাইক," গুমিনি বলল। "এ তো পেশাদার মিস্ত্রিদের কাজ। তুমি সব কাজ একা নিজের হাতে করছো?"

"যতটা পারছি," মাইক উত্তর দিল। "পঁচিশ বছর পরে এই প্রথম আমি নিজের জন্যে অবসর সময় পেয়েছি।"

"পেশাদারদের দিয়ে কাজ করানোর মতো টাকা তোমার হাতে নেই, তাই না?"

মাইক নীরবে কাঁধ ঝাঁকাল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, "একটা চাকরি আমি ইচ্ছে করলেই পেতে পারি। শুধু লণ্ডনেই বিশ-পঁচিশটা সিকিউরিটি এজেন্সি রয়েছে। শুধু ইরাকের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই সুন্নী মুসলিম কোটিপতি ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকরা নিজেদের জন্যে আর তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যে শ'য়ে শ'য়ে দেহরক্ষী নিয়োগ করেছে। আমেরিকান ও ব্রিটিশ কূটনীতিকদের জন্যেও এখনও প্রচুর দেহরক্ষীর চাহিদা রয়েছে। ওখানে গেলে আমি প্রতি সপ্তাহে যা রোজগার করতে পারব, সৈনিক হিসেবে ছ'মাসে তা কামাতে পারিনি।"

"কিন্তু তার মানে তো সেই আবার রুক্ষ, বন্ধ্যা, বালির রাজ্যে ফেরৎ যাওয়া—পদে পদে বিপদ আর মৃত্যু। তুমি তো এসব থেকে অবসর নিয়েছো, তাই না?"

"তা তুমি আমার কাছে কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছো? আল-কায়দার সঙ্গে ফ্লোরিডার

সমুদ্র সৈকতে আমোদ প্রমোদ?"

গুমিনি অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে হাসল। তারপর হাসিমুখেই বলল, "মাইক, আমেরিকানদের বহু ব্যাপারে লোকে দোষ দেয়, কিন্তু আমাদের যারা সাহায্য করে, তাদের দক্ষিণা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কৃপণতা করি, একথা কেউ বলতে পারবে না। আমি যদি তোমাকে পেশাদার উপদেষ্টার পদে নিযুক্তির একটা প্রস্তাব দিই? পাঁচ বছরের চুক্তি, প্রতি বছর দু' লক্ষ ডলার পারিশ্রমিক। এ দেশের বাইরে যেখানে বলবে, তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে টাকা পৌঁছে যাবে, এখানে ইনকাম ট্যাক্স দপ্তর কিছু জানবে না। তোমাকে কাজ করার জন্যে রোজ কোথাও যেতেও হবে না। কোনো বিপজ্জনক দায়িত্ব আর কখনো দেওয়া হবে না তোমাকে।"

মাইক মার্টিন সোজাসুজি সি.আই.এর ডেপুটি ডাইরেক্টরের চোখে চোখ রাখল। "তুমি ডেভিড লীন পরিচালিত 'লরেন্স অফ অ্যারেবিয়া' দেখেছো, মারেক? আমার সবচেয়ে প্রিয় মুভি। তার একটা দৃশ্যের কথা তোমাকে বলি ঃ টি.ই.লরেন্স শেখ আউদা আবু তাই-কে বলছে তার সৈন্যদল নিয়ে আকাবা আক্রমণে ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দিতে। পরিবর্তে আউদা যত টাকা চাইবে, ব্রিটিশদের তরফ থেকে তত টাকা দেওয়া হবে। আউদা এ কথার উত্তরে বলছে, 'আউদা ইংরেজি শোনার লোভে আকাবা যাবে না। আউদা তার প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে আকাবা যাবে, কারণ তা-ই তার ইচ্ছে, তাতেই তার আনন্দ।"

মাইক উঠে দাঁড়িয়ে স্টিভ হিলকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমার বাড়িটা চারপাশ থেকে ওপর-নীচ সমস্তটা জলনিরোধক ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক যে অবস্থায় বাড়িটা এখন আছে, আমি ফিরে এসে যেন সেই অবস্থায় পাই।

স্টিভ হিল ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল। "তাই হবে," সে বলল।

"আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসছি। বেশি কিছু নেই, ডিকিতেই ধরে যাবে।"

এই ভাবেই 'প্রোজেক্ট স্টিংরে'-র বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের প্রত্যাঘাতের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হ'ল। দু'দিন পরে কম্পিউটারের র‍্যাণ্ডম সিলেকশন পদ্ধতিতে অভিযানটার নাম দেওয়া হ'ল 'অপারেশন ক্রোবার।'

আফগান ইজমৎ খান একদিন মাইকের বন্ধু ছিল। তার সম্পর্কে সে যা জানত সব তথ্যই সে স্টিভ ও মারেককে জানিয়েছিল—শুধু একটা তথ্য সে গোপন রেখেছিল, হয়তো তার মনে হয়েছিল তথ্যটা তেমন জরুরি নয়, সি.আই.এ বা এস.আই.এস.-এর ওটা না জানলেও চলবে। 'জাজি' নামে একটা জায়গায় পর্বত কন্দরে কিছু আরব একটা লুকোনো হাসপাতাল চালাতো। সেইখানে একজনের সঙ্গে মাইকের একটা সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হয়েছিল। এই তথ্যটা সে চেপে গিয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

হ্যাম্পশায়ারের ফলের বাগানে বসে নেওয়া সিদ্ধান্তের জের টেনে দুই গোয়েন্দা কর্তাকে আরো বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত আদায় করতে হ'ল। প্রথমেই তাদের রাজনীতিক ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়ার জন্য আবেদন করতে হ'ল। ব্যাপারটা অল্প কথায় বলা গেল, কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়। কারণ মাইক মার্টিন প্রথমেই একটা অবশ্য পালনীয় শর্ত দিয়েছিল যে, অপারেশন ক্রোবার সম্পর্কে খুব বেশি হলে ১০-১২ জনের বেশি লোক যেন কিছু না জানে। এই শর্তটা গুমিনি এবং হিল দু'জনেই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল।

শর্তটার হেতু এবং উদ্দেশ্য হিল ও গুমিনি দু'জনেরই খুব ভালভাবে জানা ছিল। যদি পঞ্চাশটা লোক কোনো একটা আগ্রহজনক ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্তত একজন শেষ অবধি ব্যাপারটা জনসমক্ষে ফাঁস করবেই। কাজটা যে সে ইচ্ছে করে বা বদমায়েশি করার অভিপ্রায়ে করবে এমন নয়—কিন্তু কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে তার মুখ আলগা হবেই হবে।

মারাত্মক পরিস্থিতিতে শত্রু পরিবৃত অবস্থায় যে সব গুপ্তচরেরা ছদ্মবেশে বা মিথ্যে পরিচয়ে কাজ করে, তারা সর্বদা একটা চাপা উৎকণ্ঠায় ভোগে—এই বুঝি কিছু ভুল করলাম, এই বুঝি ওরা সত্যিটা টের পেয়ে গেল! আবার নিজের দোষ না থাকলেও কিছু এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে যেটা তাদের হাতের বাইরে। এগুলোকে বলা হয় 'ফ্লুক', অর্থাৎ একান্তই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। কিন্তু এই সব কিছুর ওপরে একটা দুশ্চিন্তা প্রত্যেক গুপ্ত যোদ্ধাকে কুরে কুরে খায়—পাছে সে ধরা পড়ে এবং অকথ্য অত্যাচার ও অমানুষিক জেরার ধকল সইতে না পেরে তার মৃত্যু হয়, কারণ কোনো এক নির্বোধ কোথাও কোনও বারে বা রেস্তোরাঁয় নেশার ঝোঁকে গুপ্ত কথাটি ফাঁস করে দিয়েছে!

সুতরাং 'যত কম লোক জানে ততই মঙ্গল' এই শর্তটিকে গুমিনি ও হিল বিনা বাক্যব্যয়ে সায় দিল। ওয়াশিংটনে জন নিগ্রোপন্টে এককথায় সায় দিয়ে জানালেন যে একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ কিছু জানবে না। তাঁর তরফ থেকে অনুমতি পেতেও দেরি হ'ল না। স্টিভ হিল ব্রিটিশ সরকারের এক বিশেষ পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ক্লাবে ডিনার করার সময় তাঁকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাল। তিনিও একইভাবে মার্টিনের শর্তে সায় দিলেন এবং হিলকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এই পর্যন্ত হ'ল চারজন।

BanglaBook.org

কিন্তু গুমিনি ও হিল দু'জনকেই নানা ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়। ফলে চব্বিশ ঘন্টাই 'অপ্ ক্রোবার' নিয়ে ব্যস্ত থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দুজনেরই দরকার একজন করে দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সহকারী, যারা প্রতিদিন প্রতিটি মিনিট শুধু ক্রোবার

সম্পর্কিত কাজ করবে। গুমিনি অনেক ভেবে চিন্তে সি.আই.এর সন্ত্রাস দমন শাখা থেকে একজন আরবী বিশেষজ্ঞকে বাছল। মাইকেল ম্যাকডোনাল্ড হাতের সব কাজ ফেলে রেখে একদিনের মধ্যেই লণ্ডন উড়ে গেল। যাওয়ার আগে তার বউকে জানিয়ে গেল যে সরকারি কাজে তাকে বেশ কিছুদিন বিদেশে থাকতে হবে। কোথায়? না, নিজের বউকেও ম্যাকডোনাল্ড তা জানাল না।

স্টিভ হিল তার নিজের দপ্তর থেকেই গর্ডন ফিলিপ্‌স্ নামে তার বহু দিনের বিশ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞকে নিজের ফার্স্ট ডেপুটি নিয়োগ করল। গুমিনি ও হিল একটা বিষয়ে স্থির মতৈক্যে পৌঁছল যে, 'অপ্ ক্রোবার'-এর প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে একটা করে বানানো গল্প অন্যদের জন্য রেকর্ড করা হবে—সর্বোচ্চ স্তরের দশ জনের বাইরে কেউই যেন না জানে যে আল-কায়দার মধ্যে একজন পাশ্চাত্য চরকে ছদ্ম পরিচয়ে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে।

ল্যাংলি এবং ভক্সহল ক্রসে সরকারিভাবে জানানো হ'ল যে ম্যাকডোনাল্ড ও ফিলিপস্‌কে ছ'মাসের জন্য বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই ছ'মাস তাদের বিশেষ তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

ভক্সহল ক্রসের দপ্তরে স্টিভ হিল দুই ডেপুটিকে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর সে 'ক্রোবার' কি এবং কেন সেই বিষয়ে পনেরো মিনিট ধরে বোঝাল। ম্যাকডোনাল্ড এবং ফিলিপ্‌স্ দু'জনেই সব শোনার পরে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল। হিল এইবার তাদের লণ্ডনের বাইরে গ্রামের দিকে একটা 'নিরাপদ বাড়ি'তে নিয়ে গেল। এখন থেকে এই বাড়িটাই তাদের ব্যক্তিগত কাজের জায়গা এবং বাসস্থান, যতদিন না ক্রোবার তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, বা কোনো চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছয়।

দু'জন জামাকাপড় পাল্টে নিজের নিজের ঘরগুলিতে কুড়ি মিনিট পরে বসার ঘরে এসে হিলের মুখোমুখি হ'ল। হিল দু'জনকে একটা করে কাগজপত্র ভর্তি মোটা ফাইল দিয়ে বলল, "আগামীকাল সন্ধের মধ্যে আমি একটা অপারেশনস্ হেড কোয়ার্টার ঠিক করে ফেলব তোমাদের জন্যে। তার আগে তোমাদের চব্বিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি—এই ফাইলে যা কিছু আছে, সব মুখস্থ করে ফেলবে। চব্বিশ ঘন্টা পরে ফাইলটা জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। এই যে ছবিটা দেখছো, এই লোকটিই অনুপ্রবেশ করবে। যতদিন না একটা কোনো ফয়সালা হচ্ছে, ততদিন তোমরা ওর সঙ্গে কাজ করবে, ওর জন্যে কাজ করবে। আর এই হচ্ছে সেই লোক, "হিল একটা পাতলা ফাইলের দুটি কপি দু'জনের সামনে ফেলল, "যার পরিচয়ে ও যাচ্ছে। বুঝতেই পারছো, যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক কমই আমরা জানি। কিন্তু আমেরিকানরা কয়েকশো ঘন্টা জেরা চালিয়ে লোকটার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারেনি। এই ফাইলটাও মুখস্থ করবে। ঠিক চব্বিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি।"

হিল চলে যাওয়ার পরে বাড়ির একমাত্র কাজের লোক তথা রাঁধুনিকে বলে বড় এক পট কফি আর কিছু ভাজাভুজি আনিয়ে দুই ডেপুটি পড়া শুরু করল।

১৯৭৭ সালে ফার্নবরো এয়ার শো দেখতে গিয়ে পনেরো বছরের স্কুল ছাত্র মাইক

BanglaBook.org

মার্টিন প্রথম প্রেমে পড়েছিল। না, কোনো নীল নয়না স্বর্ণকেশী বালিকার সঙ্গে নয়। তার বাবা আর ছোট ভাই নীল আকাশে প্রচণ্ড গর্জন করে উড়ে যাওয়া ফাইটার ও বম্বার প্লেন আর সেগুলির নানা কসরৎ দেখতেই মশগুল ছিল। মাইক আকৃষ্ট হ'ল যখন প্যারাশুট রেজিমেন্টের স্টান্ট টিম 'রেড ডেভিলস্' প্যারা-জাম্পিংয়ের কসরৎ দেখানো আরম্ভ করল। সেই কোন উঁচুতে শূন্যে উড়ন্ত বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্যারাশুট ছাড়াই ডাইভ দিয়ে নেমে আসতে আসতে প্যারা-সৈনিকরা হঠাৎ মাথার ওপর খুলে নিচ্ছে বিশাল ছাতার মতো প্যারাশুট, অসামান্য কৌশলের সঙ্গে প্রত্যেকে এসে নামছে মাটিতে, ঠিক চিহ্নিত জায়গাটুকুর মধ্যে—কিশোর মাইক রেড ডেভিলস্-এর প্রেমে পড়ল। সেই মুহূর্তেই সে ঠিক করে ফেলল সে কি হ'তে চায়।

১৯৮০ সালে হেইলিবেরি স্কুলে পড়ার শেষ বছরে সে প্যারা রেজিমেন্টে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখে পাঠাল। সেপ্টেম্বর মাসে অলডারশট রেজিমেন্টাল ডিপোতে সে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেল। পৌঁছনোর পরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগল চারপাশ—সামনে একটা পুরোনো ডাকোটা বিমান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর্নহেম সেতু দখল করার সময় প্যারা সৈনিকরা এই বিমানটি থেকেই ঝাঁপ দিয়েছিল। তার মুগ্ধ দৃষ্টিচারণে বাধা দিল এক প্যারা-সার্জেন্ট। তার সঙ্গে আরও চারজন সদ্য হাইস্কুল পাস করা ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেল ইন্টারভিউ কক্ষে।

মাইককে ইন্টারভিউতে ডাকার আগেই প্যারা-রেজিমেন্ট তার স্কুলের জীবনপঞ্জী পরীক্ষা করে নিয়েছিল। তার পরীক্ষার ফল থেকে সহজেই বোঝা গেল যে ছাত্র হিসেবে সে নেহাতই মাঝারি, কিন্তু অ্যাথলিট হিসেবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। প্যারা-রেজিমেন্টের এই রকম ছেলেই দরকার। ফলে ইন্টারভিউতে সে সহজেই উতরে গেল। তার ট্রেনিং আরম্ভ হ'ল অক্টোবর মাসের শেষে। মোট বাইশ সপ্তাহব্যাপী কঠোর পরিশ্রম—১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস অবধি।

প্রথম চার সপ্তাহ ধরে চলল দৌড়ঝাঁপ, ব্যায়াম, অস্ত্র শিক্ষা এবং রণাঙ্গনের কায়দা-কৌশল শিক্ষা। পরের দু' সপ্তাহ এগুলোর সঙ্গে যোগ হ'ল ফাস্ট এইড, সিগন্যালস্ শিক্ষা এবং পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধে বাঁচার কৌশল ও সাবধানতা শিক্ষা।

সপ্তম সপ্তাহে যোগ আরও শারীরিক ব্যায়াম ও কসরৎ, আগের চেয়ে অনেক কঠিন। তবে অষ্টম ও নবম সপ্তাহে ট্রেনিং-এর যে অধ্যায়টি শেষ করতে হ'ল, তার কাছে ব্যায়াম বা শারীরিক কসরৎ কিছু নয়। এই দুই সপ্তাহ জুড়ে চলল শারীরিক ও মানসিক সহনশীলতার পরীক্ষা। ওয়েলসের ব্রেকন পাহাড়ে ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীত ও তুষারপাতের মধ্যে পিঠে পুরো বোঝা নিয়ে চলল অভিযান। ওয়েলসের এই অঞ্চলের আবহাওয়া অতি কুখ্যাত। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে অনেক স্বাস্থ্যবান লোক হাইপোথার্মিয়ায় (দেহের তাপমাত্রার দ্রুত ও অস্বাভাবিক কমে যাওয়া) মারা গেছে।

শিক্ষানবিশদের সংখ্যা এই দুই সপ্তাহে অনেক কমে গেল। দশম সপ্তাহে কেন্ট কাউন্টির হাইদ-এ রাইফেল ও পিস্তল শুটিংয়ের মহড়া হ'ল। মাইকের উনিশতম

BanglaBook.org

জন্মদিনটি সবেমাত্র গেছে। মহড়ায় প্রমাণ হ'ল যে সে অতি উচ্চশ্রেণীর নির্ভুল লক্ষ্যভেদকারী, রাইফেল ও পিস্তল দুটোতেই।

একাদশ ও দ্বাদশ সপ্তাহ দুটি হ'ল 'পরীক্ষা সপ্তাহ'—গাছের ছোট বড় গুঁড়ি কাঁধে নিয়ে কাদা, বৃষ্টি, তুষারপাতের মধ্যে ন্যাড়া পাহাড়ে যত দ্রুত সম্ভব ওঠানামা করা।

"পরীক্ষা-সপ্তাহ?" ফিলিপ্‌স্ বিড়বিড় করে বলল, "আগেরগুলো কি ছিল?"

পরীক্ষা-সপ্তাহের পরে যে ক'জন তরুণ টিকে রইল, তারা পরম আকাঙ্ক্ষিত লাল 'বেরে' টুপি পেল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত বাছাই করা অংশ প্যারাশুট রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সৈনিকদের স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন হ'ল এই লাল বেরে। এরপরে আরও তিন সপ্তাহ ব্রেকন পার্বত্য অঞ্চলে চলল নকল যুদ্ধের মহড়া, প্রতিরক্ষার অনুশীলন, পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ এবং কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে সত্যিকারের গুলি চালিয়ে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার অনুশীলন। তখন জানুয়ারি মাসের শেষ, ব্রেকনস্ অঞ্চল সাদা বরফের আচ্ছাদনে মোড়া, কোথাও কোনো প্রাণ বা রঙের চিহ্নমাত্র নেই। রাত্তিরে ঘুমোতে হ'ত উন্মুক্ত জায়গায় স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে—আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল।

অবশেষে ষোলো থেকে উনিশ সপ্তাহ পর্যন্ত হ'ল সেই বিষয়ের ট্রেনিং, যার জন্যে মাইক মার্টিন প্যারা-রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিল—রয়্যাল এয়ার ফোর্সের অ্যাবিংডন ঘাঁটিতে প্যারাশুট নিয়ে উড়ন্ত বিমান থেকে ঝাঁপ দেওয়ার অনুশীলন। এই ট্রেনিংয়ের শেষে হ'ল 'উইংস্ প্যারেড'। লাল বেরে টুপি পরে প্যারা-বাহিনীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক প্রতীক 'উড়ন্ত রূপোলী ডানা' পিন দিয়ে এঁটে দেওয়া হ'ল প্রতিটি সফল শিক্ষার্থীর বুকে। সেই রাতে মাইক ও তার সাথীদের প্রথম আনন্দ করার অবকাশ মিলল; অলডারশটের প্রাচীন '১০১ ক্লাবে' উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ভরপুর পার্টি অনুষ্ঠিত হ'ল।

ট্রেনিং-এর শেষ দু' সপ্তাহ—একুশতম ও বাইশতম—জুড়ে চলল চূড়ান্ত পর্যায়ের যুদ্ধ কৌশল অনুশীলন এবং সেই সঙ্গে কুচকাওয়াজের মহড়া। প্যারা-রেজিমেন্টের সৈনিকদের ভাষায় 'শেষ পাঁচিল'। অবশেষে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন—অনুষ্ঠিত হ'ল 'পাস-আউট প্যারেড।' গর্বিত অভিভাবকেরা বিস্মিত ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাততালি দিতে দিতে দেখলেন তাঁদের আনাড়ি, অনভিজ্ঞ সন্তানেরা কেমন নিখুঁত, বলিষ্ঠ সৈনিক হয়ে উঠেছে।

সিনিয়র অফিসাররা গোড়া থেকেই মাইক মার্টিনকে আলাদা করে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তার আচার-আচরণ, দক্ষতা ও শক্ত সমর্থ, কষ্টসহিষ্ণু শরীর নিরীক্ষণ করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই ছেলেটির মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে অফিসার হওয়ার স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে মাইককে পাঠানো হ'ল স্যাণ্ডহার্স্টের রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে। সেখানে নতুন প্রবর্তিত সংক্ষিপ্ত সিলেবাস নিয়ে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক দুই পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে বেরোলো মাইক। মাসটা ছিল ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর। প্যারা-রেজিমেন্টে ফিরে যাওয়ার পরে তার পদমর্যাদা হ'ল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। মাইকের বয়স তখন কুড়ি। তার চোখে ভবিষ্যৎ গৌরব অর্জনের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নটি মোটেই বাস্তবে পরিণত হ'ল না।

BanglaBook.org

প্যারাশুট রেজিমেন্ট তিনটি ব্যাটালিয়নে বিভক্ত। মাইককে 3 প্যারা ব্যাটালিয়নে নিয়োগ করা হ'ল। প্রতি তিন বছরের মধ্যে এক বছর একটি করে ব্যাটালিয়নের ওপর অলডারশটের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই বছরের জন্য এই ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সাধারণ পদাতিক সৈন্যে রূপান্তরিত হয়। তাদের জন্য কোনো প্যারাশুটিং-এর কাজ থাকে না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে তাদের বাহন হয় আর্মি ট্রাক। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এই এক বছর তাদের কাজ করতে হয়। প্যারা-সৈনিকরা তেতো ওষুধ গেলার মতো করে এই বছরটা কাটিয়ে দেয়। তাদের সান্ত্বনা একটাই—প্রতি ব্যাটালিয়নের ঘাড়ে এই দায়িত্ব পড়ে ছ' বছর অন্তর।

সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট মাইক মার্টিন রিক্রুট প্ল্যাটুন-এর কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হ'ল। তার কাজ হ'ল নতুন ছেলেদের তৈরি করা, বাইশ সপ্তাহের ট্রেনিং-এর মাধ্যমে যতজন সম্ভব উপযুক্ত প্যারা-সৈনিক তৈরি করা। হয়তো পুরো বছরটা তাকে এই কাজই করতে হ'ত, যদি না সুদূর আর্জেন্টিনার স্বেচ্ছাচারী শাসক লিওপোল্ডো গ্যালটিয়েরি ১৯৮২ সালের ২রা এপ্রিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করতেন। 3 প্যারা ব্যাটালিয়নের ওপর সমরমন্ত্রক থেকে নির্দেশ এলো তৈরি থাকার জন্য, যে কোনো সময় তাদের ফকল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে।

ব্রিটেনের তৎকালীন দুর্দমনীয় প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের আদেশে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি বিশেষ ব্রিটিশবাহিনী বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ জাহাজে চড়ে রওনা হয়ে গেল আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তের দিকে। দক্ষিণ মেরুর কাছে ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে তখন সাংঘাতিক শীতের বৃষ্টি, সমুদ্র অশান্ত ও উত্তাল।

মাইক মার্টিন ছিল 'ক্যানবেরা' জাহাজে। ক্যানবেরা প্রথম গিয়ে ভিড়ল অ্যাসেনশন দ্বীপে—মানচিত্রে একটি বিন্দুর মতো ছোট্ট এই দ্বীপটিতে তখন দক্ষিণ গোলার্ধের শীত পুরোপুরি জেঁকে বসেছে, সব সময় চাবুক হাঁকড়াচ্ছে শনশনে তীব্র ঝোড়ো বাতাস। এইখানে কয়েকদিন যাত্রা স্থগিত রইল, কারণ শেষবারের মতো আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে চেষ্টা চলল যদি গ্যালটিয়েরি ফকল্যাণ্ডস থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেন। অথবা যদি মার্গারেট থ্যাচারকে প্রতি আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত করা যায়। কিন্তু দু'জনের কেউই পিছোতে রাজি হলেন না। ফলে 'ক্যানবেরা' ফের তার যাত্রা শুরু করল; তার আগে চলল অভিযানের একমাত্র বিমানবাহী জাহাজ 'আর্ক রয়্যাল।'

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রতি-আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। মাইক ও তার দলকে 'ক্যানবেরা' থেকে তুলে নিয়ে কয়েকটা 'সী কিং' হেলিকপ্টার তাদের নামিয়ে দিল বিভিন্ন কয়েকটা সামরিক ভেলার মধ্যে। তখন গভীর রাত, প্রচণ্ড ঝড় বইছে, সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টি। অশান্ত আবহাওয়ার মোকাবিলা না করতে পেরে একটা হেলিকপ্টার ঠিকরে পড়ল সমুদ্রে, তার উনিশজন আরোহী সৈন্য সকলেই ডুকে মারা গেল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই প্রকৃতির রোষ ছিনিয়ে নিল এতগুলি প্রাণ—সকলেই স্পেশাল এয়ার সার্ভিস রেজিমেন্টের সৈনিক।

BanglaBook.org

মাইক ও তার অধীনস্থ তিরিশ জন সৈন্য 3 প্যারা ব্যাটালিয়নের বাকি সৈনিকদের সঙ্গে সান কার্লোস নামে একটা জায়গায় অবতরণ করল। ফকল্যাণ্ডসের মূল দ্বীপে অবস্থিত রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলি থেকে এ জায়গাটা অনেক দূর। ফলে 3 প্যারাকে কোনো আক্রমণের মুখে পড়তে হ'ল না। তাদের কিছু পরেই পৌঁছল ব্রিটিশ মেরিন্‌স্। অবতরণের পরে এতটুকুও বিশ্রামের অবকাশ মিলল না। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কাদা ভেঙে সৈন্যরা রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

তাদের প্রত্যেকের পিঠে সামরিক সরঞ্জাম ভর্তি মস্ত বড় রুকস্যাক, এত ভারি যে মনে হচ্ছিল যেন একটা মানুষকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এরই মধ্যে উড়ে এলো একটা আর্জেন্টিনীয় 'স্কাইহক' যুদ্ধ বিমান। তার নজর এড়াতে কাদার মধ্যেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হ'ল সকলকে। যুদ্ধ বিমান অবশ্য তাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল উপকূলের দিকে, তার লক্ষ্য ব্রিটিশ রণতরীগুলি। যদি জাহাজগুলোকে বোমা মেরে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তীরে উঠে আসা সৈন্যরা এমনিতেই ফাঁদে আটকাবে, তাদের খতম করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ব্রিটিশদের আসল শত্রু ছিল হাড়-কাঁপানো তীব্র ঠাণ্ডা আর অবিরাম বৃষ্টি। তাদের চারপাশের ভূ-প্রকৃতি চরম বন্ধ্যা, একটি গাছেও সেখানে জন্মায় না।

প্রথম আশ্রয়ের দেখা মিলল মাউন্ট লংডন ও তার সন্নিহিত পর্বত শ্রেণীর কোলে পৌঁছনোর পর। এখানে পাওয়া গেল এস্ট্যানসিয়া হাউস নামে বিশাল একটা বিস্তৃত খামার, সম্পূর্ণ খালি, আশেপাশে কোনো লোকবসতি নেই। 3 প্যারা ব্যাটালিয়ন এই খামারে তাদের ক্ষণস্থায়ী ঘাঁটি তৈরি করে প্রস্তুত হ'ল তাদের আসল কাজের জন্য—যে কাজ করার জন্য তাদের দেশ সাত হাজার মাইল দূরে এই দুর্গম দেশে তাদের পাঠিয়েছে। ১২ই জুনের রাত্রিকে চিহ্নিত করা হ'ল অভিযান শুরুর সময় হিসেবে। অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারেই রয়েছে আর্জেন্টিনীয় সৈন্যবাহিনী।

স্থির করা হয়েছিল যে গভীর রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে নিঃশব্দ অভিযান চালানো হবে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে পাহাড় পেরোনোর কিছু পরেই মাইকের প্ল্যাটুনের কর্পোরাল মিলনের পা পড়ল একটা ল্যাণ্ড মাইনের ওপর। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, আর সেই সঙ্গে তীব্র আলোর ঝলকানি—মিলনের দেহের একটি টুকরোও খুঁজে পাওয়া গেল না। আর পর মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল প্রমত্ত যুদ্ধের কোলাহল। আর্জেন্টিনীয় মেশিনগানগুলো থেকে আরম্ভ হ'ল অবিরাম গুলি বর্ষণ, একের পর এক 'ফ্লেয়ার' উড়ল আকাশে, মাউন্ট লংডনের উপত্যকা সূর্যালোকিত দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

3 প্যারার সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল—হয় পিছিয়ে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়া, নয়তো এগিয়ে যাওয়া। তারা এগিয়েই গেল। ভোর হওয়ার আগে মাউন্ট লংডন তাদের দখলে এসে গেল। আর্জেন্টিনীয়রা পিছু হটে যাওয়ার পরে দেখা গেল তেইশ জন ব্রিটিশ সৈন্য মৃত, চল্লিশ জন আহত।

জীবনে এই প্রথম, যখন তার দু'পাশ দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুটে যাচ্ছিল আর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছিল সাথী সৈনিকরা, তখন মাইক মার্টিন মুখের মধ্যে একটা

BanglaBook.org

তেতো স্বাদ অনুভব করছিল—ভয়ের স্বাদ। এই ভয় কিন্তু তাকে বাড়তি উদ্যম, একটা অচেনা প্রেরণা জোগাল। সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগোল, মৃত্যু তাকে ছুঁতে পারল না। তার নিজের তিরিশ সৈন্যের প্ল্যাটুনে ছ'জন নিহত হ'ল, ন'জন আহত।

মাউন্ট লংডনের পাশের খাড়াইটা যারা আগলাচ্ছিল, সেই আর্জেন্টিনীয় সৈনিকগুলি প্রায় সকলেই অনিচ্ছুক যোদ্ধা। তারা কেউই উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক নয়। রৌদ্রকরোজ্জ্বল 'পাম্পাস' তৃণভূমির বাসিন্দা এই অল্পবয়সী ছেলেগুলো প্রাণ দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল না। ফলে ধেয়ে আসা ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের ওপর চড়াও হবার উপক্রম করতেই তারা তাদের বাঙ্কার ও ফক্সহোল ছেড়ে, বহু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে পোর্ট স্ট্যানলির দিকে চোঁ-চাঁ দৌড় লাগাল। কনকনে ঠাণ্ডা, বৃষ্টি আর কাদা থেকে রেহাই পাওয়াই তাদের লক্ষ্য, যুদ্ধ করা বা জেতার কোনো ইচ্ছেই তাদের ছিল না।

ভোরবেলা দীর্ঘ শৈলশিরার ওপর দাঁড়িয়ে মাইক মার্টিন দেখল পূবদিকে সূর্য উঠছে। নীচে আলোকিত হয়ে উঠছে শহর। সেই মুহূর্তে সে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করল, যে মহান সর্বশক্তিমানকে সে এতদিন মনে স্থান দিতে অস্বীকার করেছে। সে হাঁটু গেড়ে বসে পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করল, প্রতিজ্ঞা করল যে বাকি জীবনে সে কখনো তাঁকে ভুলবে না।

যে সময়ে দশ বছর বয়সী মাইক মার্টিন বাগদাদে তার বাবার আনন্দিত ইরাকি অভ্যাগতদের সামনে বাগানে ছোটাছুটি করছিল, সেই সময়ে তার থেকে হাজার মাইল দূরে একটি ছেলের জন্ম হচ্ছিল।

পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তানের জালালাবাদের দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে, তার পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে 'স্পিন ঘর' বা সাদা পাহাড়। এই পর্বত শ্রেণীর সর্বোচ্চ শিখর বিখ্যাত তোরা বোরা। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিভাজন রেখা রূপে এই পর্বতশ্রেণীটি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ, জনহীন পাহাড়গুলোর শিখর সারা বছর তুষারে ঢাকা থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্য ডিগ্রির ঢের নীচে, পাহাড়গুলো সেই কয়েকমাস বরফে আবৃত, ধবধবে সাদা।

স্পিন ঘর আফগানিস্তানের অংশ। কিন্তু এই পর্বতশ্রেণীর শুরুতে রয়েছে 'সফেদ কোহ্' বা সাদা শিখর, সেটি পাকিস্তানের অন্তর্গত। জালালাবাদের উর্বর শস্যভূমির প্রাণ এই পর্বতশ্রেণী। মৌসুমী বায়ু এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সমভূমিটিকে বৃষ্টিপাতে সিক্ত করে তোলে এবং স্পিন ঘরে উৎপন্ন অনেকগুলি বড় ছোট নদীর বরফগলা জলে উচ্চাবচ উপত্যকাগুলির মাটি হয়ে উঠেছে উর্বর। এই উপত্যকাগুলিতে ছোট ছোট জমিতে কৃষকেরা চাষ করে অথবা ফলের বাগান তৈরি করে। এছাড়া বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ভেড়া ও ছাগল চরিয়ে বহু আফগান জীবনযাপন করে।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্য কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। জীবন এখানে রুক্ষ ও কঠিন, কারণ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে গেলে যে সব উপাদানের দরকার, সেগুলি প্রায় মেলে না বললেই চলে। চাষের জমিগুলি ছোট এবং ছড়ানো-ছেটানো। প্রতিটি শস্যভূমিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক একটি উপজাতি সম্প্রদায়ের বাসভূমি। ব্রিটিশ

BanglaBook.org

শাসকেরা কোনোদিন এদের পুরোপুরি বশ মানাতে পারেনি। এই পাঠান বা পাশতুন উপজাতিভুক্ত মানুষগুলি প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা ও অকুতোভয়। চিরকাল এরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে হিংস্রভাবে লড়াই করে এসেছে। গিরিকন্দর ও গুহার আড়াল থেকে 'জেজেল' নামে লম্বা গাদাবন্দুক হাতে পাঠানদের অভ্রান্ত নিশানার শিকার হয়েছে বহু বিদেশী হানাদার। ব্রিটিশ সৈন্যেরা এদের ঘাঁটাতে ভয় পেত।

১৯৭২ সালে এই রকম একটি পাহাড়ি উপত্যকায় মালোকো-জাই নামে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। চারপাশের অন্যান্য গ্রামগুলোর মতো এরও নামকরণ হয়েছিল, এর প্রতিষ্ঠাতা যোদ্ধার নামে। গ্রামে পাঁচিল ঘেরা পাঁচটা আলাদা অঙ্গন ছিল—প্রতিটির জনসংখ্যা মোটামুটি কুড়ি-একুশ। এরা সকলেই একটাই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পুরো গ্রামের মোড়ল ছিল নূরি খান। গ্রীষ্মকালের সন্ধেবেলা এই নূরি খানের অঙ্গনে গ্রামের পুরুষরা জড়ো হয়ে গরম, দুধচিনিবিহীন চা পান করতে করতে নানা কথাবার্তায় সময় কাটাতো। সব ক'টি অঙ্গনেই বসবাসের কুটির এবং পশুদের খোঁয়াড়গুলো দেওয়াল ঘেঁষে তৈরি। তাদের প্রবেশ পথ ভেতর দিকে। ভরা গ্রীষ্মেও সূর্য ডুবে যাবার কিছুক্ষণ পর থেকেই পাহাড়ি এই অঞ্চলটায় কনকনে ঠাণ্ডা পড়তো, ফলে অঙ্গনের মাঝখানে জ্বলতো একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড, তার তাপ পৌঁছতো সব ক'টি কুটিরেই।

পরিবারের মেয়েদের থাকার কুটিরটা কিছুটা বড় মাপের, একটু দূরে অঙ্গনের এক কোণে। সেদিন সন্ধেবেলা গল্পগুজবের ফাঁকে মাঝে মাঝে পুরুষেরা কান পেতে শুনছিল কোনো মহিলা কণ্ঠ উচ্চগ্রামে ওঠে কিনা। নূরি খানের স্ত্রী তার চতুর্থ সন্তানের প্রসব বেদনায় কাতর। সন্ধের নমাজের সময় তার স্বামী আল্লার কাছে একটি পুত্র সন্তানের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানিয়েছে। তার একটিই ছেলে, বয়স আট, আর তার পরে দুটি মেয়ে। পুত্র সন্তান চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, কারণ ছেলেরাই তো ভেড়া চরাতে নিয়ে যাবে, আর প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারাই তো বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করবে।

ক্রমে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। অগ্নিকুণ্ডের কেঁপে কেঁপে ওঠা আলোয় বাজপাখির মতো নাক আর দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখগুলো নজরে আসছিল। হঠাৎ একজন ধাত্রী দৌড়ে বেরিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রম অথচ উৎফুল্ল স্বরে ঘোষণা করল যে নূরি খানের দ্বিতীয় পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। নূরি খানের তামাটে মুখে ঝকঝকে হাসি ফুটে উঠল।

'আল্লাহ আকবর!" সে চেঁচিয়ে উঠল। তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সমবেত সজোর প্রতিধ্বনি শোনা গেল, "আল্লাহ আকবর!" পর মুহূর্তেই সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের 'জেজেল'-এর নল আকাশের দিকে উঁচিয়ে ট্রিগার টিপলো। যুগপৎ গুলির শব্দে প্রকম্পিত হ'ল রাতের নিস্তরঙ্গ বাতাস। এর পরে কিছুক্ষণ ধরে চলল গর্বিত পিতাকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দনের পালা। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার প্রতি ধন্যবাদ উৎক্ষিপ্ত হ'ল আকাশের দিকে—তিনি তাঁর পরম ভক্ত ভৃত্যের প্রার্থনা শুনেছেন এবং তাকে আর একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছেন।

পাশের অঙ্গনগুলির থেকে পুরুষেরা সবাই বেরিয়ে এসেছিল। একজন চেঁচিয়ে

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করল, ''ছেলেকে কি নামে ডাকবে, ঠিক করেছো?''

''আমার ঠাকুরদাদার নামে আমি এর নাম রাখছি ইজমৎ,'' বলে উঠল নূরি খান। কয়েকদিন বাদে এক ইমাম এসে যখন নবজাতককে আশীর্বাদ করলেন, তখন তিনিও নামটি অনুমোদন করলেন।

শিশু ইজমৎ আর পাঁচটা পাশতুন বাচ্চার মতোই বেড়ে উঠতে লাগল। সে যথাসময়েই হাঁটতে ও কথা বলতে শিখল। কিছুটা বড় হওয়ার পর দেখা গেল সে প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে এবং তার হাত পা চলে দারুণ ক্ষিপ্রগতিতে। যে সব কাজে শারীরিক শক্তি লাগে, সেগুলোতে সে তার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিত। ফলে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই সে ভেড়ার পাল নিয়ে গ্রীষ্মকালে অনেক উঁচুতে ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরে যাওয়া শুরু করে দিল। আশপাশে তার মা-মাসি-পিসিরা ধারালো কাস্তে দিয়ে খাস কেটে জড়ো করে আঁটি বাঁধার কাজে ব্যস্ত থাকতো—এই ঘাস তাদের ঘোড়া ও গবাদি পশুদের খাদ্য। আর তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ইজমৎ মাঝে মাঝেই একা অভিযান চালাতো আশেপাশে, আরও উঁচুতে।

মেয়েদের কুটিরে থাকতে তার ভাল লাগতো না। ছ' বছর বয়সে শেষ অবধি তাকে সন্ধেবেলা বড়দের সঙ্গে বসার অনুমতি দেওয়া হ'ল। উঠোনে জ্বালানো আগুনের আভায় আলোকিত জায়গাটুকু নিকষ কালো অন্ধকারে ঘেরা, চারপাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো সব পাহাড়। এরই মাঝে বসে সে তার বাবা-কাকাদের মুখে শুনতো কেমন করে প্রবল পরাক্রমশালী পাঠান বাহিনী 'আংলিজ' সেনাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। দেড়শো বছর আগের অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের কাহিনী, বলার ধরণে মনে হ'ত যেন গতকালের ঘটনা।

ইজমৎ-এর বাবা নূরি খান ছিল গ্রামের সবচেয়ে ধনী লোক। তার ধনসম্পদ ছিল গরু, ভেড়া আর ছাগলের পাল, সেই সঙ্গে একাধিক ঘোড়া। সেই প্রত্যন্ত আফগান গ্রামে এর চেয়ে বড় সম্পদের কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। এই পশুপালনের কাছ থেকে পাওয়া যেত মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম। এছাড়া অবিশ্রাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছোট ছোট জমি চাষ করে ফলানো হ'ত গম আর ভুট্টা। যার থেকে তৈরি হ'ত রুটি। এর সঙ্গে ছিল প্রচুর তুঁতে ও আখরোট গাছ। সারা বছরের জ্বালানি আর শুকনো বাদামের জোগান আসতো এইসব ফলবাগান থেকে। আখরোট পেষাই করে তৈরি হ'ত রান্নার তেল।

গ্রাম ছেড়ে বেরোনোর দরকার পড়তো না—অন্তত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যে। ইজমৎ খানেরও জীবনের প্রথম আট বছর গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই কেটেছিল। পাঁচটি পরিবারের জন্যে ছিল একটি ছোট মসজিদ, প্রতি শুক্রবার তারই সামনে অনুষ্ঠিত হতো জুম্মাবারের প্রার্থনা। নূরি খান অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিল, উদারপন্থী ও নিয়মনিষ্ঠ, কিন্তু কোনোভাবেই গোঁড়া মৌলবাদী নয়।

এই পার্বত্য প্রদেশের বাইরে যে আফগানিস্তান, আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে তার পরিচিত ছিল ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান বা আফগান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নামে। ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল কমিউনিস্ট সরকার। অন্তর্দেশীয় উপজাতিগুলির

BanglaBook.org

ওপর অবশ্য এই সরকারের মতবাদের কোনো প্রভাব ছিল না। তাদের কাছে কমিউনিজম্ ছিল নাস্তিকতার সমার্থক। কিন্তু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আফগান সরকার কখনো নাক গলাতো না। রাজধানী কাবুল এবং অন্যান্য শহরের বাসিন্দা আফগান স্ত্রী-পুরুষ ছিল পরমতসহিষ্ণু ও নরমপন্থী। অন্ধ, জঙ্গি গোঁড়ামি এদের জীবনে প্রভাব ফেললো এর বেশ কয়েক বছর পরে। সেই সময়ে আফগান মেয়েরাও স্কুলে-কলেজে পড়তো, বোরখার ব্যবহার ছিল না বললেই চলে এবং ফ্যাশন-দুরস্ত রেস্তোরাঁ, নাচগান ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ শুধু স্বাভাবিকই ছিল না, সরকারের তরফ থেকে এসব ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হ'ত। কমিউনিস্ট গোয়েন্দা পুলিশের নজর ছিল কেবলমাত্র রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি, ধর্মীয় অনুশাসন ভাঙার জন্য তারা কাউকে হেনস্থা করতো না।

বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে মালোকো-জাই গ্রামের দুটি যোগসূত্র ছিল। একটি ছিল চোরাকারবারী 'কুচি' যাযাবরের দল। এরা মাঝে মধ্যে চোরাই সামগ্রী নিয়ে তাদের খচ্চরবাহিনী সহ স্পিন ঘরের দুর্গম পথ দিয়ে পাকিস্তানের পরাচিনার শহরের দিকে যেত। সরকারি সৈন্য ও পুলিশে ভরা খাইবার গিরিপথ ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে এরা সযত্নে এড়িয়ে চলতো। আফগান সমভূমি ও তার শহরগুলির লোকজনের গতিবিধি, দূরবর্তী কাবুলে সরকার নতুন কোনো আইন প্রবর্তন করল কিনা এবং সীমান্তের বাইরের দেশ পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের খবরাখবর পাওয়া যেত এদের কাছে।

দ্বিতীয় যোগসূত্র ছিল গ্রামের একমাত্র রেডিওটি—নূরি খানের সযত্নে রক্ষিত সম্পত্তি। কুচিদের কাছ থেকে কেনা ব্যাটারি লাগিয়ে রেডিওটা যখন চালানো হ'ত, তখন শর্টওয়েভের নানা কর্কশ আওয়াজের মধ্য দিয়ে শোনা যেত বি.বি.সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের পাশতুন বিভাগের প্রোগ্রাম। বাইরের দুনিয়ার যে ছবি এই প্রোগ্রাম থেকে পাওয়া যেত, তার সঙ্গে কাবুল সরকারের বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলতো না। অবশ্য তাতে মালোকো-জাইয়ের বাসিন্দাদের মধ্যে কোনো হেলদোল হতো না। এসব ঘটনা ঘটছে সেই কোন সুদূর বিদেশে, তাদের জীবনের সঙ্গে ওসব ব্যাপারের কোনো যোগই ছিল না।

সব মিলিয়ে ইজমৎ খানের শৈশব ও বাল্যকাল অপরিমেয় শান্তির মধ্যে কেটেছিল। তারপরে....বাল্যকাল ছাড়িয়ে যখন সে কৈশোরে পা রাখল, তখন এলো রাশিয়ান ফৌজ।

কে ঠিক কাজ করছে আর কে করছে ভুল, এসব নিয়ে মালোকো-জাইয়ের বাসিন্দারা কোনরকম মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করল না। তারা জানতও না যে আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপতির ওপর তার বিজ্ঞ সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, কারণ রাষ্ট্রপতি তার রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কাছে কেবল একটাই ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ চেহারায় দেখা দিল যে, একটা বিশাল সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কয়েকশো সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্কসহ সোভিয়েত উজবেকিস্তান থেকে আমুদরিয়া নদ পেরিয়ে সালাং গিরিপথ দিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছে এবং কাবুল অধিকার করে নিয়েছে। তাদের রাজধানী

BanglaBook.org

কাবুল এখন বিদেশী হানাদারদের দখলে। তখনও পর্যন্ত এ লড়াই ইসলাম বনাম নাস্তিকতার লড়াই নয়। বিদেশীদের এই হামলা এবং কাবুল দখল সমগ্র আফগান জাতির অপমান!

ইজমৎ খান যে প্রথাগত শিক্ষা পেয়েছিল, তা নেহাতই প্রাথমিক। সে কোরান থেকে নমাজের শ্লোকগুলি মুখস্থ করেছিল। এই শ্লোকগুলি সবই আরবীতে লেখা। আরবী ভাষা সে মোটেই বুঝতো না। এক ইমাম মাঝে মাঝে দূর থেকে এসে শ্লোকগুলি মুখস্থ করাতেন। কার্যত, ইজমৎ সহ গ্রামের সব ছেলের শিক্ষার ভার ছিল নূরি খানের হাতে। নূরি খান তাদের প্রার্থনা করাতো এবং পুশতু ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখিয়েছিল। এর সঙ্গে প্রাথমিক অঙ্ক, অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শেখানো হতো।

ইজমতের জীবনে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিল তার বাবা নূরি খান। তার বাবার কাছ থেকে শেখা 'পাখতুনওয়ালি সংহিতা', অর্থাৎ ন্যায় ও নীতির যে মূল নিয়মাবলী পাশতুন তথা পাঠানদের জীবনের কেন্দ্র, নূরি খান সেই নিয়মগুলি গ্রামের বালক ও কিশোরদের মনে বদ্ধমূল করে গেঁথে দিয়েছিল। 'পাখতুনওয়ালি'র মূল নিয়ম তিনটি ঃ আত্মসম্মান, আতিথেয়তা এবং অপমানের প্রতিশোধ। যে কোনো পাঠানের এই তিনটি অবশ্য কর্তব্য। হামলা চালিয়ে মস্কোর সরকার আফগানিস্তান ও আফগান জাতিকে অপমান করেছে। এই অপমানের প্রতিশোধ অবশ্য কর্তব্য।

প্রতিশোধ তথা প্রতিরোধের যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হ'ল পার্বত্য প্রদেশে। প্রতিরোধীরা নিজেদের নাম দিল 'মুজাহিদিন'—ঈশ্বরের যোদ্ধা। উপজাতীয় মৌলানা ও ইমামদের সম্মেলন 'শূরা' থেকে নির্দেশ এলো তাদের কি করতে হবে এবং কেমন পদ্ধতিতে।

মুজাহিদরা 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর খবর রাখতো না। কিন্তু শূরা থেকে বলা হ'ল যে তাদের সাহায্য করার জন্য ক্ষমতাশালী বন্ধু রাষ্ট্র আছে, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু। কথাটা যুক্তিপূর্ণ। প্রবাদেই আছে, 'আমার শত্রুর শত্রু হ'ল আমার বন্ধু।' এদের মধ্যে প্রথম হ'ল পাকিস্তান, পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বললেই চলে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক, মৌলবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক। ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জিয়ার সঙ্গে 'ইসাই' (খ্রিস্টান) রাষ্ট্র আমেরিকার গভীর বন্ধুত্ব; এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার বন্ধু 'আংলিজ' দেশ—আফগানদের প্রাচীন শত্রু, এখন রুশের শত্রু।

ফকল্যাণ্ডসে সরাসরি যুদ্ধ ও মৃত্যুর মোকাবিলা করার পরে মাইক মার্টিন একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হ'ল যে, সে নিজের জন্য সঠিক পেশা নির্বাচন করেছে। সব রকম বিরুদ্ধতা ও বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কিছুদিন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির মোকাবিলা করল। কিন্তু ওখানে সক্রিয় যুদ্ধ বা সত্যিকার বিপজ্জনক কাজ কম ছিল। সে তার দল নিয়ে প্রধানতঃ ঘুরে ঘুরে নজর রাখতো শুধু। খুব শীঘ্র সে এই একঘেয়ে কাজে হাঁপিয়ে উঠলো। শেষে ১৯৮৬ সালের বসন্তকালে সে এস.এ.এস. অর্থাৎ স্পেশাল অ্যাকশন সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন জানালো।

প্যারা-রেজিমেন্ট থেকে বেশ কিছু সৈনিক এস.এ.এস. বা সংক্ষেপে স্যাস-এ যোগ

BanglaBook.org

দেয়, কারণ দুটি বিভাগের যুদ্ধ সংক্রান্ত শিক্ষণ পদ্ধতি মোটামুটি একই রকম। কিন্তু স্যাসের পরীক্ষায় পাস করা অনেক শক্ত। মার্টিনের আবেদনপত্রে তার আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তির উল্লেখ দেখে রেজিমেন্ট তার প্রতি আগ্রহ দেখাল কিন্তু প্রথমে তাকে একটা নির্বাচনী কোর্স সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে হবে—তবেই তাকে নির্বাচিত করা হবে বলে জানিয়ে দিল স্যাস দপ্তর।

প্যারা, পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, এমনকি ইঞ্জিনীয়ার বাহিনী থেকেও স্যাস-এর এজেন্ট নেওয়া হয়। শারীরিক ও মানসিক স্তরে অত্যন্ত কর্মক্ষম ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না। মাইক ছ' সপ্তাহব্যাপী প্রাথমিক নির্বাচনী কোর্সটা কৃতিত্বের সঙ্গেই শেষ করল।

কোর্সটা একটাই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দিনেই একজন সার্জেন্ট সহাস্য মুখে জানালো ঃ "এই কোর্সে আমরা তোমাদের কোনোরকম প্রচলিত ট্রেনিং দেবো না। আমরা প্রতি পদে তোমাদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করবো।" কথাটা মিথ্যে নয়। এই কোর্সে যারা যোগ দেয়, তারা আগে থাকতেই যথেষ্ট শক্ত সমর্থ ও বলিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও শতকরা মাত্র দশ জন এই প্রাথমিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারে। এই প্রচণ্ড কঠোরতা খুবই দরকারি, এতে পরে অনেক সময় বাঁচে।

নির্বাচিত হওয়ার পরে শুরু হ'ল অবিশ্রান্ত ট্রেনিং, যার মধ্যে একটা ছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে কঠোর প্রকৃতি ও নির্দয় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার শিক্ষা। সবশেষে এক মাস ধরে হ'ল জেরা প্রতিরোধ করার ট্রেনিং। 'প্রতিরোধ' শব্দটার মানে এখানে সাংঘাতিক অত্যাচার ও যন্ত্রণাকর জেরার সামনে চুপ করে থাকা। এই চরম ধাপটিতে উত্তীর্ণ হতে না পারলে স্যাসে যোগদানের আশা ছেড়ে অনেকেই তাদের ভূতপূর্ব ইউনিটে ফিরে যেত।

১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মকালের শেষদিকে মাইক যোগ দিল ২২ নম্বর স্যাস ইউনিটে। সে উন্নীত হ'ল ক্যাপ্টেন পদে। তার অধীনে থাকল 'এ' স্কোয়াড্রন, যার সদস্যেরা সকলেই প্যারাট্রুপার। প্যারা রেজিমেন্টে থাকাকালীন মাইকের আরবী ভাষার নৈপুণ্য কোনো কাজে আসেনি, কিন্তু স্যাস তাকে এজন্য সাগ্রহে বরণ করে নিল। আরব দুনিয়ার সঙ্গে স্যাসের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৪১ সালে আরবের পশ্চিম মরুভূমিতে স্যাসের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সেই থেকে বালুকাময় এই রুক্ষ দেশটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

ব্রিটেনের সামরিক মহলে একটা রসিকতা চালু আছে যে স্যাসই একমাত্র সামরিক ইউনিট যেটি সরকারের ঘরে লাভের টাকা জমা করে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্যি নয়, কিন্তু একেবারে মিথ্যেও নয়। সারা পৃথিবীতে দেহরক্ষী হিসেবে স্যাসের সদস্যদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। দেহরক্ষীদের ট্রেনিং দেওয়া স্যাসের আর একটা কাজ। গোটা আরব দেশ জুড়ে সমস্ত শেখ ও আমীররা তাদের দেহরক্ষীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্যাসের সৈনিকদের নিয়োগ করে থাকে। এ কাজের জন্য তারা অত্যন্ত ভাল টাকা দেয়। মাইক ও তার স্কোয়াড্রনের কিছু বাছাই সদস্যকে প্রথমেই পাঠানো হ'ল সৌদি আরবের রিয়াধে। সেখানে তাদের কাজ হ'ল সৌদি জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ট্রেনিং

BanglaBook.org

দেওয়া। কাজটা মাইক বেশ উপভোগ করছিল, কিন্তু হঠাৎ ১৯৮৭ সালে তাকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

হিয়ারফোর্ডের স্টার্লিং লাইনসে রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে বসে কম্যাণ্ডিং অফিসার খেদোক্তি করলেন, "দ্যাখো মার্টিন, ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ নয়, আমি যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু কি করবে বলো, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সরাসরি নির্দেশ—'ফার্ম' তোমাকে কিছুদিনের জন্য ধার নিতে চাইছে—তোমার ওই আরবী ভাষা-সংস্কৃতির ব্যাপারটা....বুঝছো?"

'দ্য ফার্ম', অর্থাৎ সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, সংক্ষেপে এস.আই.এস। আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মাইকের গভীর জ্ঞানের কথা তাদের কানেও পৌঁছেছে। মাইককে তারা বিশেষ কোনো গুপ্ত কাজে ব্যবহার করতে চায়।

"ওদের নিজস্ব আরবী ভাষাবিদ নেই?" মাইক জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়ই, অবশ্যই আছে—একটা পুরো বিভাগ ভর্তি। কিন্তু ওরা আরবী বলা বা লেখাপড়ার ব্যাপারে তোমাকে চাইছে না। কাজটাও আদপে আরবে নয়। ওরা চাইছে এমন কাউকে যে আফগানিস্তানের একদম ভেতরে গিয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে কাজ করবে। এবং স্বভাবতই ওসব দুর্গম জায়গায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাজকর্ম সম্বন্ধে খবরও পাঠাবে।

মাইক জানতে পারল যে পাকিস্তানের সামরিক শাসক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বটে, কিন্তু একটা কথা সরাসরি বলে দিয়েছে—কোনো পশ্চিমী দেশের সৈন্যকে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমেরিকা থেকে মুজাহিদদের জন্যে যে বিপুল সাহায্য আসছে, তার নিয়ন্ত্রণে আছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই.। গোপন পথে মুজাহিদিন বাহিনীগুলির হাতে এই সাহায্যের জিনিসপত্র তাদেরই পৌঁছে দেওয়ার কথা। নিঃসন্দেহে, সেই সব সাহায্যের অনেকটাই পাকিস্তানে রয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের রুগ্ন অর্থনীতির পক্ষে সে ব্যাপারটা বেশ ভালই। কিন্তু জিয়াউল হক কিছুতেই চায় না যে তার দেশের মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানে চোরা পথে ঢুকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যরা মুজাহিদিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সশস্ত্র লড়াই করুক। সেরকম কিছু সৈন্য যদি রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে সোভিয়েত সরকার আন্তর্জাতিক স্তরে হইচই বাধিয়ে দেবে যে পাকিস্তান সরকার এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে। তার ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের শত্রুতা মোটেই তার কাম্য নয়।

মুজাহিদিন কম্যাণ্ডারদের মধ্যে পাকিস্তানের পছন্দের লোক ছিল গুলবুদিন হেকমতিয়ার। কিন্তু অবস্থা খতিয়ে দেখে ব্রিটিশ সামরিক দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে হেকমতিয়ারের চেয়ে তাজিক কম্যাণ্ডার শাহ্ মাসুদকে সাহায্য দেওয়া অনেক বেশি দরকার। কারণ হেকমতিয়ার বা আরো কিছু কম্যাণ্ডারের মতো মাসুদ পাকিস্তানে বা ইউরোপে কোথাও বসে হাত কামড়াচ্ছে না। সে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে এবং তার অধীন বাহিনী রাশিয়ানদের অনেক বেশি ক্ষতি করছে। মুশকিল হ'ল, এই সাহায্য কিভাবে মাসুদের কাছে সরাসরি পৌঁছানো যায়, তা ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

কারণ মাসুদের গতিবিধি সবই আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

সুতরাং শাহ মাসুদের সঙ্গে ব্রিটিশদের একটা সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন। খাইবার বাদে অন্য কোনো গিরিপথ দিয়ে চোরাপথে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যাবে—কিছু পাউণ্ড বা ডলারের বিনিময়ে কাবুল সরকারের সমর্থক কোনো আফগান পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে যাবে। আফগানিস্তানে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, একজন আফগানের বিশ্বস্ততা তুমি কিনে নিতে পারবে না, কিন্তু কিছুদিনের জন্যে তুমি তা ভাড়া করতে পারো।

এস.আই.এস-এর সদর দপ্তরে দু'জন উচ্চপদস্থ আধিকারিক মাইককে পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করছিল। "ক্যাপ্টেন", তাদের একজন বলল, "এক্ষেত্রে আসল কথাটা হ'ল অস্বীকার করার ক্ষমতা। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কোনো সক্রিয় সদস্য শাহ মাসুদের হয়ে কাজ করছে, একথাটা যেন কিছুতেই প্রমাণ না করা যায়। সেইজন্যে তোমাকে স্যাস থেকে পদত্যাগ করতে হবে—সরকারিভাবে, সব আসল কাগজপত্র তৈরি হবে। অবশ্যই, যখনই তুমি ফিরে আসবে, তখনই তোমাকে ফের নিজের পদে নিয়ে নেওয়া হবে।"

মাইক হেসে বলল, "ধন্যবাদ। আপনি খুবই ভদ্রলোক। তাই বললেন, 'যখন ফিরে আসব', —'যদি ফিরে আসো' নয়। কিন্তু একটা কথা—স্যাসের একটা অত্যন্ত গোপন 'বিপ্লবী যুদ্ধ বিভাগ' আছে। সারা পৃথিবীর সমস্ত কমিউনিস্ট সরকারগুলোকে নানারকম চোরাগোপ্তা কাজ চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করাই এই বিভাগের কাজ। আমাকে তো এই বিভাগেও বদলি করা যেত।"

"না", অন্য আধিকারিকটি বলল। "তোমার কাজটা আরো অনেক বেশি গোপন। আমাদের যে ইউনিটের মাধ্যমে তুমি কাজটা করবে, আমরা সেই ইউনিটের নাম দিয়েছি 'ইউনিকর্ন'। কারণ কাল্পনিক জীব ইউনিকর্নের মতো এরও কোনো অস্তিত্ব নেই —না কাগজে-কলমে, না কারো মনে। দশ থেকে বারো জনের বেশি সক্রিয় সদস্য এই ইউনিটে কখনোই থাকে না। এই মুহূর্তে আছে মাত্র চারজন। আমাদের নিজেদের একজন লোককে আফগানিস্তানের ভেতরে ঢোকানো ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। যেমন বললাম, সেরকম একজন আফগান গাইড তোমাকে পাঞ্জশির উপত্যকায় শাহ্ মাসুদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেবে।"

"তার জন্যে উপহার নিয়ে যেতে হবে?" মাইক জিজ্ঞেস করল।

"কিছু নমুনা মাত্র", প্রথম আধিকারিকটি বলল। "একটা লোক যতটা নিয়ে যেতে পারে। পরে আমরা খচ্চরের কনভয় দিয়ে অনেক বেশি জিনিস পাঠাবো, যদি মাসুদ তার নিজের লোকেদের দক্ষিণে পাঠায়, সীমান্ত থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। প্রথমে তার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া দরকার, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।"

"আর উপহার?"

"নস্যি। ব্রিটিশ নস্যি মাসুদের খুব প্রিয়। ওহ্, আর দুটো ব্লোপাইপ ক্ষেপণাস্ত্র। ঘন ঘন বিমান হানার চোটে ইদানিং মাসুদ উদ্‌ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তোমাকেই ওর লোকেদের শেখাতে হবে কেমন করে ক্ষেপণাস্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়। আমার হিসেবে

BanglaBook.org

এই শরৎকাল থেকে শুরু করে খুব বেশি হলে ছ'মাস তোমাকে থাকতে হবে। কি মনে হচ্ছে তোমার? কেমন লাগছে?"

রাশিয়ান দখলদারির ছ'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল—আফগানরা কখনো যে কাজটা করে উঠতে পারেনি, সেটা এখনও পারছে না। কাজটা হ'ল সমস্ত উপজাতি একত্রিত হয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করা। ইসলামাবাদে বেশ কয়েক সপ্তাহ তর্কবিতর্ক চলার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সাফ জানিয়ে দিল যে তাদের কাছে যে ক'টি মুজাহিদিন বাহিনীর নাম নথিভুক্ত আছে, সেগুলি ছাড়া অন্য কারুকে তারা আমেরিকার দেওয়া টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে না। এর ফলে দেখা গেল রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইরত মুজাহিদিন বাহিনীর সংখ্যা মোট সাত। এই সাতটা দলের প্রতিটির একজন করে রাজনৈতিক নেতা ও একজন সেনাপতি ছিল। এদের নাম হয়ে গেল 'দ্য পেশোয়ার সেভেন'।

এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বাহিনী ছিল যার নেতা ও সেনাপতি কেউই পাশতুন নয়। অধ্যাপক রব্বানি ও তার বিখ্যাত যোদ্ধা শাহ্ মাসুদ উভয়েই উত্তরাঞ্চলের তাজিক। সীমান্তের ওপারে তাজিকিস্তান এদের দু'জনেরই আদি বাসস্থান। মাসুদ ছাড়া বাকি ছ'টি দলের তিনটির নেতাদের ডাকনাম হয়ে গেল 'গুচ্চি কম্যাণ্ডারস'। এরা তিনজনই বিপদসঙ্কুল আফগানিস্তানে প্রবেশ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে নিরাপদে বিদেশে বসেছিল। ইটালিয়ান ফ্যাশন সংস্থা 'গুচ্চি'র স্যুট এদের খুব পছন্দ ছিল। আফগানদের জাতীয় পোশাকের বদলে এরা গুচ্চির তৈরি পাশ্চাত্য পোশাক পরাই বেশি পছন্দ করতো।

বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জন—সইয়াফ ও হেকমতিয়ার—অন্ধবিশ্বাসী ও গোঁড়া মৌলবাদী মুসলমান। বিশেষ করে হেকমতিয়ার প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ও নৃশংস লোক। সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে দেখা গিয়েছিল যে, সে যত না রাশিয়ান সৈন্য নিধন করেছে, তার চাইতে তিন গুণেরও বেশি আফগানদের হত্যা করেছে।

ষষ্ঠজন মোল্লা মৌলভি ইউনিস খালিস নাঙ্গারহর প্রদেশের পাশতুন উপজাতিদের অবিসম্বাদী নেতা। ইজমৎ খানের গ্রাম মালোকো-জাই এই প্রদেশেরই অন্তর্গত। ইউনিস খালিস পণ্ডিত মানুষ, ধর্মপ্রচারকও বটে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো গোঁড়ামি ছিল না, বরং দয়ালু ও বিবেচক মানুষ হিসেবেই সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো। তার এই উদারপন্থার জন্য হেকমতিয়ার তাকে ঘৃণা করতো।

সাতজনের মধ্যে ইউনিস খালিসের বয়স সবচেয়ে বেশি, ষাটের ওপর। এর পরবর্তী দশ বছর ধরে সে তার উপজাতীয় যোদ্ধাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে নিজে রাশিয়ান অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে রাশিয়ান সেনাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল। যখন সে নিজে থাকতে পারতো না, তখন বাহিনীর নেতৃত্ব দিত আবদুল হক।

১৯৮০ সালে স্পিন ঘরের উপত্যকাগুলিতে পুরোদমে লড়াই শুরু হয়ে গেল। জালালাবাদের ভেতর দিয়ে সোভিয়েত বাহিনী হু হু করে ঢুকে উপত্যকার কোণে

BanglaBook.org

কোণে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে চলতে লাগল পার্বত্য গ্রামগুলোর ওপর তাদের বিমান হানা। নূরি খান ইউনিস খালিসকে তার সেনাপতিরূপে স্বীকার করে নিয়েছিল এর আগেই। এইবার খালিসের তরফে তাকে নিজস্ব 'লশ্‌কর' বা কৃষক যোদ্ধাবাহিনী তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হ'ল।

স্পিন ঘর বা সাদা পাহাড়ে গায়ে ছড়ানো আছে অসংখ্য গুহা ও গিরিকন্দর। গ্রামের গৃহপালিত পশুগুলোকে বিমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে নূরি খান সমস্ত ছাগল ভেড়াগুলোকে এই সব গুহা ও কন্দরে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। বিমান হানার সময় গ্রামের লোকেরাও এসব জায়গায় আশ্রয় নিত। কিছুকাল পরে নূরি খান সিদ্ধান্ত নিল যে গ্রামের মহিলা ও শিশুদের সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। ছোট দলটাকে সামলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজন পুরুষকে সঙ্গে দেওয়া দরকার। পেশোয়ার বা তার কাছে কোথাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বার করে তাদের দেখভাল করার জন্যেও এই পুরুষটিকে দরকার হবে। সেখানে কতদিন থাকতে হবে তা বলা অসম্ভব, কিন্তু গ্রামে থাকলে তাদের জীবন তো বিপন্ন হবেই, উপরন্তু সংগ্রামরত যোদ্ধারাও লড়াইয়ে পুরোপুরি মন লাগাতে পারবে না। ভেবেচিন্তে 'মাহ্‌রাম' হিসেবে নূরি খান তার নিজের বাবাকেই বেছে নিল। বৃদ্ধের বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি, হাত পায়ের জোরও কমে এসেছে, কিন্তু মানসিক চিন্তাশক্তি অটুট। পথে কোনো সঙ্কট দেখা দিলে মাথা খাটিয়ে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার যথেষ্টই আছে।

সুতরাং দ্রুত যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া হ'ল। মাল বওয়া ও গাড়ি টানার জন্য বেশ কয়েকটা গাধা ও খচ্চর জোগাড় করতে কয়েকদিন লাগল। ইজমৎ খানের বয়স তখন আট, দেখে মনে হয় দশ। বয়সের তুলনায় তার শারীরিক বৃদ্ধি বেশি। অন্যান্য বাচ্চাদের মতো গ্রাম ছেড়ে যেতে তার প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু নূরি খানের কথা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যাত্রা শুরুর সময়ে তার চোখ জলে ভরে গেল। প্রথমে তার বড় ভাই ও তারপরে বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল, বোঝাল যে এই যাত্রায় তার দাদুকে মদত দেওয়ার জন্যই তাকে যেতে হচ্ছে। চোখের জল মুছে তার মাকে একটি খচ্চরের পিঠে বসিয়ে লাগাম টেনে রওনা হয়ে গেল ইজমৎ। নির্বাসন থেকে সে ফিরতে পেরেছিল সাত বছর পরে, দখলদার রাশিয়ান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। পনেরো বছর বয়সেই তার মধ্যে যে শীতল হিংস্রতা লক্ষ্য করা গেল, তা দেখে অন্য আফগানরাও শিউরে উঠতো।

নিজ নিজ বাহিনীর আইনসঙ্গত পরিচয় তৈরি করার জন্য সাত সেনাপতি সাতটি রাজনৈতিক দল তৈরি করল। নামেই রাজনৈতিক পার্টি, শাসনকার্যে তাদের কিছুমাত্র হাত ছিল না। কিন্তু দুনিয়ার চোখে প্রত্যেক মুজাহিদ কোনো না কোনো পার্টির সদস্য হওয়ার ফলে তাদের সংগ্রামও একটা আইনি অধিকার অর্জন করল। ইউনিস খালিস তার প্রতিষ্ঠিত পার্টির নাম দিল 'হিজব্‌-ই-ইসলামি'; তার অধীনস্থ সকলেই এই পার্টিতে যোগ দিল। পেশোয়ারের কাছে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় একটা তাঁবুময় শহর গড়ে উঠল। এই শহরের বাসিন্দা আফগান উদ্বাস্তুরা। ইজমৎ জীবনেও রাষ্ট্রসংঘের নাম শোনেনি। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের একটা ব্যবস্থা তার মনোমতো হ'ল ঃ প্রত্যেক তথাকথিত

BanglaBook.org

রাজনৈতিক পার্টির লোকেরা আলাদা আলাদা ক্যাম্পে থাকবে এবং কোনো পার্টির লোক অন্য পার্টির ক্যাম্পে ঢুকতে পারবে না।

আর একটা সংস্থার লোকেরা খাবার, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করছিল। তাদের চিহ্ন একটা লাল রঙের ক্রস। এটাও ইজমৎ আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কষ্ট করে পাহাড় পেরিয়ে আসার পরে এদের দেওয়া গরম স্যুপ খেতে তার ভালোই লাগত। পশ্চিমী দেশ থেকে আসা উপহারগুলো এইভাবে রাষ্ট্রসংঘ ও জেনারেল জিয়াউল হকের মাধ্যমে বিতরণ হতে লাগল। কিন্তু আর একটা শর্ত আরোপ করা হ'ল ঃ যে কোনো ক্যাম্পেই ছেলেরা যা শিক্ষা পাবে, তা শুধু মাদ্রাসায়, এবং তাদের শিক্ষা হবে মূলত কোরান-নির্ভর। সমস্ত পার্টির এই মিলিত ফতোয়া রাষ্ট্রসংঘ মেনে নিল।

মাদ্রাসাগুলোর সমস্ত খরচ আসতো সৌদি আরব থেকে। সেখানকার গোপন দাতারা কোরান শিক্ষক ইমামদের নিয়মিত মাইনেও দিত। বস্তুত, অধিকাংশ ইমাম ছিল সৌদি আরবেরই বাসিন্দা। তারা মাদ্রাসাগুলিতে সমবেত আফগান বালক ও কিশোরদের ওয়াহাবি মতে দীক্ষিত করে তুলল। ইসলামের এই ব্যাখ্যাটি সর্বাপেক্ষা কঠোর ও গোঁড়া। সৌদি আরবে প্রধানত এই ওয়াহাবি মতই স্বীকৃত। ফলে পশ্চিমী খ্রিস্টান সমাজের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল ভবিষ্যতের নাগরিক এই পুরো আফগান সম্প্রদায়গুলির মগজ ধোলাই করে তাদের অন্ধ বিশ্বাসী, গোঁড়া, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ করে গড়ে তোলা হ'ল।

নূরি খান সুযোগ পেলেই তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যেত। বছরে দু'তিন বার তার বড় ছেলের হাতে লস্করের পরিচালনার ভার দিয়ে সে রুক্ষ পার্বত্য পথ দিয়ে প্রচুর কষ্ট করে আসতো। প্রতিবারই আসার পর দেখা যেত তার বয়স যেন অনেকটা বেড়ে গেছে। ১৯৮৭ সালে ইজমৎ লক্ষ্য করল তার বাবার মুখ বলিরেখায় আকীর্ণ, অত্যন্ত কৃশ ও ক্লিষ্ট। নূরি খান জানাল যে তার বড় ছেলে রাশিয়ান বিমানের বোমা বর্ষণে নিহত হয়েছে। ইজমৎ-এর বয়স তখন ঠিক পনেরো। নূরি খান তার পিঠে হাত রেখে জানাল যে এইবার তাকে ফেরৎ যেতে হবে, তার মুজাহিদ হওয়ার সময় এসে গেছে।

ইজমৎ-এর বুক গর্বে ফুলে উঠল। মহিলারা তার যাওয়ার খবর শুনে কান্নাকাটি করল। তার ঠাকুরদাদা বিড়বিড় করে অস্পষ্টভাবে কিছু বলে তার মাথায় হাত রাখল। বৃদ্ধের শরীর খুবই খারাপ, আর একটা শীত টিকবে কিনা সন্দেহ। ইজমৎ খান এই সমস্ত আবেগ উপেক্ষা করে তার বাবা ও অন্য আটজন মুজাহিদের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। পেশোয়ার থেকে পশ্চিমে পাহাড় পেরিয়ে নাঙ্গারহর প্রদেশ তার গন্তব্য। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে যুদ্ধ।

ইজমৎ খান যখন মালোকো-জাই ছেড়ে গিয়েছিল, তখন সে মাত্র আট বছরের ছেলে। সাত বছর বাদে যে ইজমৎ ফিরে এলো সে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ, শারীরিক এবং মানসিক দু'দিক থেকেই। প্রথম যা তার চোখে পড়ল তা এক নিদারুণ ধ্বংসের সমারোহ। মালোকো-জাই ও তার চারপাশের ভূ-প্রকৃতি চূর্ণ-বিচূর্ণ, তছনছ হয়ে গেছে। পাথর ও আখরোট কাঠ দিয়ে তৈরি কুটিরগুলো সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সুখোই যুদ্ধ ও

BanglaBook.org

বোমারু বিমান এবং মেশিনগান সমৃদ্ধ হাইগু হেলিকপ্টারে উড়ে আসা রাশিয়ান সেনারা উত্তরে শাহ্ মাসুদের এলাকা পাঞ্জশির থেকে শুরু করে পাকতিয়া ও শিনকে পাহাড় পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

সমভূমির বাসিন্দাদের আফগান সেনাবাহিনী এবং ভয়ঙ্কর গুপ্ত পুলিশ 'খাদ' পুরো দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসীরা এবং বিভিন্ন শহর থেকে পালিয়ে গিয়ে যারা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, এদের কিছুতেই দমানো যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ানবাহিনী এদের হার মানাতে পারেনি। বিমানবাহিনী সব সময় পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ান পদাতিক বাহিনীর ওপর সমানে অকস্মাৎ এবং অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নাজেহাল করে দিয়েছিল। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে রাশিয়ান সামরিক কনভয়গুলো বেশি দূর এগোনোর আগেই গুহায় ওঁত পেতে থাকা মুজাহিদদের সাঙ্ঘাতিক আক্রমণের শিকার হচ্ছিল। আকাশপথে ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছনো রুশ সেনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে চোরাপথে মুজাহিদিন বাহিনীগুলোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল আমেরিকান বিমান বিধ্বংসী 'স্টিঙ্গার' ক্ষেপণাস্ত্র। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাশিয়ান যুদ্ধ বিমানগুলি বেশি নীচে নেমে বোমাবর্ষণ করতে সাহস করতো না। অনেক উঁচু থেকে বোমা ফেলে লাভ কিছু হচ্ছিল না—অধিকাংশ বোমাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে এত বেশি সংখ্যক বিমান ও হেলিকপ্টার ঘায়েল হ'ল যে সোভিয়েত সেনা দপ্তর রীতিমতো আশঙ্কিত হয়ে পড়ল। এর সঙ্গে পদাতিক বাহিনীতে আহত ও মৃতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। অসংখ্য সৈন্য নানা রোগেও মারা যাচ্ছিল। রাশিয়ানদের মনোবল দ্রুত ভাঙছিল।

আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশে রুশ-আফগান যুদ্ধের মতো নৃশংস ও বর্বর যুদ্ধ পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গেছে। যুদ্ধে বন্দী করার বালাই ছিল না বললেই চলে। যারা গুলি-বোমার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে মরতো, তারা ভাগ্যবান। পাহাড়ি আফগানরা বিশেষ করে রাশিয়ান বৈমানিকদের সাংঘাতিক ঘৃণা করতো। ঘায়েল বিমান থেকে প্যারাশুটে করে নেমে পড়া যে বৈমানিকরা জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়তো, তাদের জ্বলন্ত রোদের মধ্যে খুঁটিতে বেঁধে ধারালো ছোরা দিয়ে পেটের মাঝখানটা চিরে দেওয়া হতো। পেটের ভেতরের অন্ত্র ও নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসে ঝুলতে থাকতো। প্রচণ্ড রোদের তাপে হতভাগ্য সৈনিকটির সারা শরীর ভাজা হয়ে যেত। এর সঙ্গে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়ে ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সইবার পরেই মৃত্যু এসে তাদের রেহাই দিতো।

আর যদি এমন কেউ ধরা পড়তো, যার বিমানের আক্রমণে কিছু মুজাহিদের মৃত্যু হয়েছে, তাকে সঁপে দেওয়া হ'ত পশুদের ছাল ছাড়ানোর ওস্তাদ কসাইদের হাতে। অন্য তরফেও নিষ্ঠুরতা কিছু কম ছিল না। আফগানদের নির্দয়তা যদি ব্যক্তিগত, তো রাশিয়ানদের নৃশংসতা ছিল সর্বব্যাপী। সুখোই যুদ্ধ বিমানগুলো পাহাড়ে যা কিছু নড়তে দেখতো—তা সে স্ত্রী, শিশু, পশু যাই হোক—সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর নাগাড়ে মেশিনগান থেকে গুলি বৃষ্টি করতো। নতুবা বোমা মারতো। এর সঙ্গে সমস্ত পাহাড় ও উপত্যকাগুলে জুড়ে তারা বিমান থেকে মাইন ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই মাইনগুলো অতি

BanglaBook.org

উন্নত শ্রেণীর, বিমান থেকে পড়ে আপনা হতেই জমির ভেতর ঢুকে যায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছু আগে দেখা গেল শুধু মাইনের ওপর অজান্তে পা পড়ার ফলে দশ লক্ষেরও বেশি আফগান খোঁড়া হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ আফগান মারা গিয়েছিল যুদ্ধে, পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল।

রিফিউজি ক্যাম্পে থাকাকালীন ইজমৎ খান বেশ ভালই বন্দুক-পিস্তল চালাতে শিখে গিয়েছিল। চোরাপথে ক্যাম্পে এইসব আগ্নেয়াস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে ঢুকতো, এবং শক্ত সমর্থ ছেলেদের সেগুলো চালানোর গোপন ট্রেনিং দেওয়া হ'ত। পুরো ব্যাপারটায় আমেরিকানদের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। ইজমৎ-এর প্রিয় অস্ত্র ছিল কালাশনিকভ—কুখ্যাত এ.কে-৪৭। এই সোভিয়েত রাশিয়ান অস্ত্রটা তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছিল সবচেয়ে বেশি—একে ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় জঙ্গির সবচেয়ে প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এই এ.কে-৪৭। আমেরিকানরা যে আফগান মুজাহিদদের হাতে এই রাইফেলটাই লড়াই চালানোর জন্য দিচ্ছিল তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। যে কোনো মৃত রাশিয়ান সৈন্যের প্যাক থেকে এই বন্দুকের বুলেট সহজেই পেয়ে যেত আফগানরা। তাঁর ফলে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তাদের কাছে কার্তুজ পৌঁছে দেওয়ার ঝামেলা এড়ানো যেত। এই রাইফেল ছাড়া মুজাহিদদের একরকম রকেটচালিত গ্রেনেডও সরবরাহ করতো আমেরিকা ও ব্রিটেন উভয়েই। এই গ্রেনেডগুলো উৎক্ষেপণ করা সোজা এবং মাঝারি দূরত্বে সাঙ্ঘাতিক কার্যকরী।

বয়স পনেরো হলেও ইজমৎ খানকে দেখে মনে হ'ত আঠারো বা উনিশ বছর বয়সী তরুণ। ছোটবেলা থেকেই তার শারীরিক শক্তি যথেষ্ট। এবার পাহাড়ে ফিরে আসার পর কঠোর জীবন যাপনের ফলে মানসিক দৃঢ়তাও বৃদ্ধি পেল দশ গুণ। অন্যান্য পাশতুন মুজাহিদদের মতো সেও কিছুদিনের মধ্যেই পাহাড়ি ছাগলের মতো অক্লেশে তরতর করে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শিখে গেল। তার চলাফেরায় কোনো ক্লান্তির ছাপ খুঁজে পাওয়া যেত না। কয়েকশো ফিট টানা ওঠার পরেও তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকতো, একটুও হাঁপাতো না সে।

গ্রামে ফিরে আসার এক বছর বাদে একদিন হঠাৎ তার বাবা তাকে ডেকে পাঠালো। নূরি খানের গুহায় পৌঁছে সে দেখল সেখানে এক অচেনা আগন্তুক হাজির। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পুরুষটির মুখ রোদে পোড়া তামাটে রঙের, গালে কালো চাপদাড়ি। তার পরণে ধূসর রঙের পশমী শালোয়ার-কামিজ, পায়ে মজবুত ট্রেকিং বুটজুতো। শালোয়ারের ওপর লোকটি একটা হাতাহীন চামড়ার জ্যাকেট পরেছিল। তার পেছনে জমিতে রাখা রয়েছে একটা বিরাট বড় রুকস্যাক আর ভেড়ার চামড়ায় জড়ানো দুটো টিউব। লোকটির মাথায় জড়ানো পাশতুনি পাগড়ি।

"ইনি আমাদের বন্ধু এবং অতিথি", নূরি খান বললো। "ইনি আমাদের সাহায্য করতে এবং আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করতে এসেছেন। এই টিউব দুটো এবং ওঁকে পাঞ্জশিরে শাহ্ মাসুদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

ইজমৎ খান আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার বাবার কথাগুলো ঠিকমতো তার মাথায় ঢোকেনি তখনও।

"ইনি কি আফগান?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না। ইনি 'আংলিজ'।

ইজমৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। আংলিজ তো তাদের পুরোনো শত্রু! মাদ্রাসার ইমাম তো সমানেই আংলিজদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করতেন। এই লোকটা নিঃসন্দেহে কাফের, বিধর্মী, 'নাসরানি', খ্রিস্টান—এরা তো চিরকাল ধরে দোজখের আগুনে পুড়বে! আর এই লোকটাকে কিনা তাকে একশো মাইল পাহাড় পেরিয়ে উত্তরের মহান উপত্যকায় নিয়ে যেতে হবে? কে জানে কত দিন রাত এর সান্নিধ্যে কাটাতে হবে!... কিন্তু তার বাবা তো খাঁটি লোক, ভক্ত মুসলমান—তিনি তো একে তাঁর বন্ধু বলছেন—তা কি করে হয়?

ইংরেজ লোকটি আলতো করে তার তর্জনী দিয়ে ইজমৎ-এর বুকের ওপর টোকা দিয়ে বলল, "আস্‌সালাম আলেইকুম, ইজমৎ খান।"

ইজমৎ-এর বাবা অথবা পরিবারের অন্য কেউ আরবী বলতে পারতো না, যদিও পার্বত্য প্রদেশে রুশদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে অনেক আরবদেশী স্বেচ্ছা যোদ্ধা এসে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে আফগানদের বিশেষ মেলামেশা ছিল না। আরবরাও নিজেদের নিয়েই থাকতো। ফলে আফগানদের আরবী শেখার বিশেষ সুযোগ হয়নি। কিন্তু সাত বছর পেশোয়ারে থাকাকালীন ইজমৎ বেশ কয়েকবার আদ্যোপান্ত কোরান পাঠ করেছিল। কোরান আরবী ভাষায় লেখা। তাছাড়া মাদ্রাসার ইমাম সৌদি আরবের লোক, তিনি তাঁর মাতৃভাষা সৌদি আরবীতেই কথা বলতেন। ফলে কাজ চালানোর মতো আরবী ইজমৎ শিখে গিয়েছিল।

"আলেইকুম আসসালাম", সে অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিল। "আপনার নাম?"

"মাইক", আগন্তুক উত্তর দিল।

"মা-ইক্!" অদ্ভুত নাম।

"ঠিক আছে। এখন চলো একটু চা খাওয়া যাক," তার বাবা বলল। তাদের গ্রামের দশ মাইল দূরে একটা গুহায় আপাতত তাদের আশ্রয়স্থল। তাদের ছোট গ্রাম বিমান থেকে ফেলা বোমায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। গুহার শেষপ্রান্তে, অনেকটা ভেতর দিকে, একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। এতটা ভেতরে যাতে কোনো ধোঁয়া গুহামুখ দিয়ে বাইরে না বেরোয়। সোভিয়েত যুদ্ধ বিমান যখন তখন উড়ে আসে, ধোঁয়া নজরে এলেই বোমা বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে।

"আমরা আজ রাতটা এখানেই শোব", নূরি খান বলল। "ভোরবেলা উঠে

BanglaBook.org

তোমরা দু'জন উত্তরমুখো রওনা হয়ে যাবে, আমি যাব দক্ষিণে। আব্দুল হক লোকজন নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। জালালাবাদ-কান্দাহার রোডে দু' একদিনের মধ্যেই একটা বড় অপারেশন করতে হবে।"

ঝলসানো ছাগলের মাংস আর চালগুঁড়ো দিয়ে তৈরি আফগানি পিঠে দিয়ে নৈশাহার সেরে তারা সকলে শুয়ে পড়ল। ভোর হওয়ার আগে উত্তরের যাত্রী দু'জন রওনা হয়ে গেল। গোলকধাঁধার মতো ঘুরপাক খাওয়া সঙ্কীর্ণ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যুক্ত ছোট ছোট অনেকগুলো উপত্যকার মধ্যে দিয়ে তাদের যাত্রাপথ। উপত্যকাগুলোতে লুকানোর মতো আশ্রয় মিলবে। কিন্তু পাহাড়গুলো সবই গাছপালাবিহীন, খাড়া ও রুক্ষ পাথরের দেওয়াল। লুকানো দূরে থাক, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করাবার মতো খাঁজ বা গুহাও অমিল। সুতরাং রাতে চাঁদের আলোয় পাহাড় পেরোনোই ভাল, দিনের বেলা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যাত্রা।

দ্বিতীয় দিনেই তাদের ওপর দুর্ভাগ্যের খাঁড়া নামল। তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য তারা রাত থাকতেই রওনা হয়েছিল। আলো ফোটবার পরে দেখা গেল তাদের সামনে ছড়ানো একটা বিরাট পাথুরে ঢিবি, ওপরের অংশটা ছোট ছোট পাথরে ভর্তি, প্রায় সমতল। যদি একটা রাশিয়ান হেলিকপ্টার উড়ে আসে, তাহলে লুকোবার কোনো জায়গা নেই। এই জায়গাটা পেরিয়ে গেলেই ফের একটা গুহা-গর্ততে ভর্তি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এপারে অপেক্ষা করার মানে সারা দিনটা নষ্ট হবে। ইজমৎ বলল যে তাহলে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ঢিবিটা মাত্র পাঁচ-ছ'শো গজ চওড়া, পেরোতে মোটেই বেশি সময় লাগবে না। সুতরাং দিনের আলোর মধ্যেই পা চালিয়ে চলে যাওয়া যাবে। ....ঢিবিটার ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছবার পরেই ট্যাকা-ট্যাকা-ট্যাকা-ট্যাকা করে হেলিকপ্টারের ঘুরন্ত পাখার আওয়াজ পাওয়া গেল।

দ্বিরুক্তি না করে দু'জনেই ঝাঁপ দিয়ে পাথুরে জমির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, নিস্পন্দ মৃতদেহের মতো। কিন্তু পিঠ থেকে রুকস্যাকটা খুলে তারপর ঝাঁপ দিতে মাইকের কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল। জমিতে নিজেকে আছড়ে ফেলার আগের মুহূর্তে মাইক দেখতে পেল ওপারের পাহাড়টার মাথা ছাড়িয়ে দানবের মতো উঠে আসছে একটা রাশিয়ান মিল মি-২৪ডি হেলিকপ্টার, যার প্রচলিত নাম 'হাইণ্ড'। তার দুই দুই পাইলটের একজন নিশ্চয় নীচে একটা মুহূর্তের নড়াচড়া লক্ষ্য করেছিল, কারণ হেলিকপ্টারটা ঘুরে সোজা তাদের দিকে উড়ে এলো। জোড়া আইসোটভ ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। তার সঙ্গে ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের ট্যাকা-ট্যাকা-ট্যাকা-ট্যাকা শব্দ।

মাইক দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়েছিল। সামান্য মাথা ঘুরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে প্রকাণ্ড হেলিকপ্টারটারের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে পাইলট দু'জন তাদের দেখতে পেয়েছে। একজন পাইলট সামনের সীটে, তার পেছনের সীটে অন্যজন। দু'জনেই সোজা তার দিকেই তাকিয়েছিল। পর মুহূর্তেই হেলিকপ্টার গোঁৎ খেয়ে নেমে আসতে শুরু করল। এইভাবে খোলা জায়গায় হাইণ্ডের শিকার হবে? মাইক দ্রুত মাথা ঘোরাল। একশো গজ দূরে কয়েকটা মাঝারি প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ, প্রায়

BanglaBook.org

চার-সাড়ে চার ফুট উঁচু। পুরোটা না হলেও, কিছুটা আড়াল পাওয়া যাবে। সে সজোরে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। চোখের পলক না পড়তে রুকস্যাকের পাশে রাখা দুটো টিউবের একটা তুলে নিয়েই প্রাণপণে দৌড় লাগাল পাথরের স্তূপটার দিকে।

দৌড়তে দৌড়তে মাইক শুনতে পাচ্ছিল তার পেছনে তীরবেগে ছুটে আসা আফগান ছেলেটার পায়ের শব্দ, আর সেই সঙ্গে হাওয়ার তীব্র শনশনানি, আর সব কিছু ছাপিয়ে দানবিক হাইশু হেলিকপ্টারের গর্জন। এই মরণপণ দৌড় শুরু করার আগের মুহূর্তে মাইক লক্ষ্য করেছিল যে হেলিকপ্টারটার পেটের নীচে রকেট ও বোমা রাখার খাপগুলো খালি। তাদের সামনে এটাই একমাত্র ক্ষীণ আশার রেখা। মাইক মুখ হাঁ করে জোরে শ্বাস টানতে টানতে প্রার্থনা করল যে সে যা ভাবছে তাই যেন সঠিক হয়।

পাইলট সিমোনভ ও তার সহকারী পাইলট গ্রিগরিয়েভ ভোরবেলা উড়ান শুরু করেছিল। গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর এসেছিল যে সামনের একটা উপত্যকায় বেশ কিছু মুজাহিদ ঘাঁটি গেড়েছে। অনেক উঁচু থেকে প্রথমে বোমা ফেলে তারপর নীচে নেমে এসে সামনের পাহাড়ের গুহাগুলো লক্ষ্য করে একের পর এক রকেটগুলো চার্জ করেছিল তারা। কোনো মানুষের দেখা মেলেনি। শুধু বেশ কয়েকটা ছাগল ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। ছাগল থাকা মানেই মানুষও আছে। সিমোনভ মেশিনগানের গুলিতে ছাগলগুলোকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। একজনও মুজাহিদকে দেখতে না পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ আর রাগে সে মেশিনগানের চেম্বার প্রায় খালি করে ফেলেছিল।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরার সময় আবার উঁচুতে উঠে গিয়ে জালালাবাদে সোভিয়েত ঘাঁটির দিকে হেলিকপ্টারের মুখ ঘুরিয়ে নেবার একটু পরেই গ্রিগরিয়েভের নজরে এসেছিল বাঁদিকে একটা ছোট্ট কিছু নড়াচড়ার আভাস। তারপরেই সে নিজেও দেখতে পেয়েছিল দুটো মানুষকে। মানুষ দুটো ছুটতে শুরু করতেই সে মেশিনগানটাকে সুইচ টিপে চালু করেই ডাইভ দিল। দু' হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছনোর পর সে দেখল ছুটন্ত লোক দুটো পাথরের স্তূপের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছে। দেরি না করে সে ট্রিগার টিপে ধরল। মেশিনগানের দুটো ব্যারেল থেকে এক ঝাঁক গুলি বেরোনোর পরেই সব নিঃশব্দ হয়ে গেল। সিমোনভ বুঝতে পারল গুলি শেষ। সে নিজেকেই গালি দিতে লাগল—ইশ্, এখানে দুটো মুজাহিদ পালিয়ে যাচ্ছে, আর সে কিনা ছাগল মেরে তার গুলিগুলো খরচ করে বসেছে! সে হেলিকপ্টারের মুখ ঝটিতি ঘুরিয়ে নিয়ে একটা অধবৃত্তাকার বাঁক মেরে পাহাড় টপকে পেছনের উপত্যকার ওপর চলে গেল।

মাইক ও ইজমৎ খান পাথরের স্তূপটার আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসেছিল। ইজমৎ কৌতূহল ভরে দেখতে লাগল তার আংলিজ অতিথিকে। মাইক দ্রুত তার ভেড়ার চামড়ার কেসটা খুলে একটা ছোট টিউব বার করল। ইজমৎ চুপ করে লক্ষ্য করতে লাগল সে কি করে। সে টের পাচ্ছিল তার ডান পায়ের উরুতে কোনো সাড়া নেই। পাথরের আড়ালে যাওয়ার জন্য শেষ লাফটা মারার সময় তার মনে হয়েছিল কেউ যেন তার উরুতে সজোরে একটা ঘুষি মারল। কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা হচ্ছিল না, শুধু অসাড়তা, উরুটায় কোনো অনুভূতি টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

BanglaBook.org

শাহ্ মাসুদের কাছে যে দুটো 'ব্লোপাইপ' ক্ষেপণাস্ত্র উপহার হিসেবে নিয়ে যাচ্ছিল, তারই একটা নিয়ে মাইক ক্ষিপ্র হাতে বিভিন্ন অংশগুলো জোড়া লাগাচ্ছিল। আমেরিকান 'স্টিঙ্গার' ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ক্ষমতাশালী নয় 'ব্লোপাইপ'—কিন্তু এটা অনেক হালকা আর জোড়া লাগালেও অনেক সহজ।

'ব্লোপাইপ' বেশ পুরোনো ডিজাইনের সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল; অর্থাৎ সেই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র যেগুলি মাটি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণ করা হলে তাড়া করে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে। এই ক্ষেপণাস্ত্র নানা ধরনের হয়। সব থেকে বড় ও ক্ষমতাশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো র‍্যাডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কয়েকটার আবার ছুঁচলো ডগায় একটা ছোট্ট র‍্যাডার লাগানো থাকে। আর একরকম ক্ষেপণাস্ত্র প্রধানত রাতের অন্ধকারে ছোঁড়া হয়—সেগুলোর থেকে ইনফ্রা-রেড বা অবলোহিত রশ্মি নির্গত হয়ে নিকষ কালো অন্ধকারেও গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়া সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তাপ বা উষ্ণতা সন্ধানী। এগুলি উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুর ইঞ্জিন থেকে বেরোনো তাপের দিকে নির্ভুল লক্ষ্যে তাড়া করে গিয়ে আঘাত হানে। 'ব্লোপাইপ' এই সবগুলির তুলনাতেই অনেক সহজ ও প্রাথমিক ডিজাইনে তৈরি। এর ডগায় একটা ছোট রেডিও রিসিভার বা বেতার গ্রাহকযন্ত্র লাগানো থাকে। উৎক্ষেপণকারী মানুষটি নিজের হাতে একটি ট্রান্সমিটার বা বেতার তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ তার হাতে একটা শক্তিশালী রিমোট কন্ট্রোল, যা দিয়ে সে উড়ন্ত ক্ষেপণাস্ত্রটার গতিপথ নির্ধারণ করে।

এইটাই ব্লোপাইপের সবচেয়ে বড় অসুবিধে। একটা বিমান যখন তার দিকে আক্রমণ করার জন্য সোজা ধেয়ে আসছে, তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেপণাস্ত্রটাকে ডাইনে-বাঁয়ে কিম্বা ওপরে-নীচে চালনা করে শত্রু বিমানের গায়ে আঘাত করা সহজ কাজ নয়। এর ফলে অনেক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপক সৈনিক আক্রমণকারী বিমানের গুলি খেয়ে মারা গেছে এবং অনেক ব্লোপাইপও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে নিষ্ফলা আছড়ে পড়েছে মাটিতে। কারণ কোনো কিছুর আড়ালে থাকলে রিমোট কন্ট্রোল কাজ করে না। উন্মুক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার সময়ে শত্রু বিমান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা গুলির থেকে বেঁচে যাওয়া নেহাতই দৈব অনুগ্রহ।

দ্বিস্তর রকেটটাকে ঝটিতি উৎক্ষেপক টিউবের মধ্যে ভরে দিয়ে মাইক ব্যাটারি চালু করে দিল। এরপরে টিউবটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে তাতে লাগানো দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখল হাইণ্ড হেলিকপ্টারটা সোজা তার দিকেই উড়ে আসছে। দূরবীনের কাচের ভেতরের ছোট ক্রসটাকে হেলিকপ্টারের নাকের ওপর স্থির নিশানা করে মাইক ট্রিগার টিপল। প্রচণ্ড হু-উ-শ শব্দ করে উত্তপ্ত গ্যাসের প্রবাহ ছাড়তে ছাড়তে ক্ষেপণাস্ত্রটা সোজা উড়ে গেল। এইবারে সেটা হেলিকপ্টারটাকে ধ্বংস করতে পারবে কিনা তা সম্পূর্ণ মাইকের হাতে ধরা রিপোর্ট কন্ট্রোলের উপর নির্ভরশীল। হাইণ্ড হেলিকপ্টারটা তখন তার থেকে মোটামুটি চোদ্দশো গজ দূরে। এইবার পাইলট সিমোনভ ছোট মেশিনগানটা থেকে গুলি চালানো শুরু করল।

হাইণ্ডের ডগা ঘিরে চারটে ব্যারেল দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে তিরিশটা করে বুড়ো

BanglaBook.org

আঙুলের সাইজের বুলেট ছুটে আসতে শুরু করল মাইকের দিকে। ঠিক তখনই রাশিয়ান পাইলটের চোখে পড়ল সোজা তার দিকে ধেয়ে যাওয়া ক্ষেপণাস্ত্রের ধোঁয়া। এবারে একটা প্রশ্ন খাড়া হয়ে গেল—কার স্নায়ু কঠিনতর? মাইকের না সিমোনভের?

মাইকের আশপাশ দিয়ে বুলেটের ধারা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়ে আঘাত করল পাথরের স্তূপে। চতুর্দিকে ছিটকে যেতে লাগল অজস্র পাথরের টুকরো। ঠিক তিন সেকেণ্ড হেলিকপ্টারের সোজা গতিপথ বজায় রাখল সিমোনভ। অর্থাৎ এইটুকু সময়ের মধ্যে নব্বইটা বুলেট ছুটে এলো মাইকের দিকে। এর পরমুহূর্তেই সিনোনভ ক্ষেপণাস্ত্রটাকে এড়াবার জন্যে হেলিকপ্টারের মুখ ঘোরাল। বুলেট বৃষ্টি তখনও চলছে, কিন্তু তার লক্ষ্য সরে গেছে অন্যদিকে।

জীববিজ্ঞানে একটা তথ্য প্রমাণিত—সামনে যদি অকস্মাৎ অতর্কিতে একটা কোনো সোজা তেড়ে আসা বিপজ্জনক বস্তুর আবির্ভাব হয়, তাহলে পুরুষ মানুষেরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে বাঁদিকে ঝোঁকে বা হেলে যায়—সর্বদা, সব সময়। এই কারণে রাস্তার বাঁদিক দিয়ে গাড়ি চালানো অনেক বেশি নিরাপদ, যদিও বেশি দেশে এই নিয়ম চালু নেই। যে কোনো ড্রাইভার সামনে অকস্মাৎ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখলে তৎক্ষণাৎ আতঙ্কিত হয়ে বাঁদিকে গাড়ি ঘোরায়। এর ফলে তার গাড়িটা রাস্তার পাশের ফুটপাথে উঠে যাওয়া বা মাঠে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ এবং প্রাণহানির সম্ভাবনাও কম। এই কারণে যে সব দেশে রাস্তার ডানদিক দিয়ে গাড়ি চলে, সে সব দেশে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা অনেক বেশি।

সিমোনভের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। ক্ষেপণাস্ত্রটাকে তীব্র বেগে সোজা তার দিকে ধেয়ে আসতে দেখেই সে প্রচণ্ড আতঙ্কের বশে বাঁদিকে হেলিকপ্টার ঘোরাল।

ইতিমধ্যে ব্লোপাইপের রকেটের প্রথম স্তরটা খসে পড়ে যেতে তার গতিবেগ বেড়ে গিয়ে সুপারসোনিক অর্থাৎ শব্দের চেয়ে দ্রুত হয়ে দাঁড়াল। সিমোনভ বাঁদিকে ঘোরার হয়তো বা আধ সেকেণ্ড আগে মাইক রিমোট কন্ট্রোলের গতি নির্ধারক বোতামটা সামান্য ডাইনে সরিয়ে দিল। তার অনুমান সঙ্গে সঙ্গেই অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হ'ল। বাঁদিকে ঘোরামাত্রই হাইণ্ডের পেটের দিকটা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং সাঙ্ঘাতিক শক্তিশালী বিস্ফোরক বোঝাই রকেটটা সঠিক গন্তব্যে আঘাত হানল। ওয়ারহেডটার ওজন মাত্র পাঁচ পাউণ্ড, অর্থাৎ দু' কিলোগ্রামের কিছু বেশি। হাইণ্ড হেলিকপ্টারের ইস্পাতের চাদর যথেষ্ট পুরু। কিন্তু ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ছুটে আসা কোনো বস্তুর আঘাতের জোর সাঙ্ঘাতিক। আয়তনে ছোট হওয়া সত্ত্বেও ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেড হাইণ্ড হেলিকপ্টারটার পুরু ইস্পাতের চাদর ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই শোনা গেল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ।

কনকনে ঠাণ্ডা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়েও মাইকের সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সে দেখল রাশিয়ান হেলিকপ্টারটা থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাঁদিকে গোঁৎ খেয়ে সেটা বহু নীচে নদী-উপত্যকায় আছড়ে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর সে বুঝতে পারল যে দুই পাইলটেরই মৃত্যু হয়েছে। হেলিকপ্টারের

BanglaBook.org

ধ্বংসাবশেষ থেকে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছিল। এই ধোঁয়াটা বিপজ্জনক, জালালাবাদে রাশিয়ানদের নজরে পড়বে নিশ্চয়ই। তার মানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা সুখোই ফাইটার প্লেন উড়ে আসবে।

"চলো, এবার এগোনো যাক", সে তার কিশোর পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে আরবী ভাষায় কথা বলল। ছেলেটা ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মাইক এইবারে তার ডান উরুতে শালোয়ারের ওপর জমে থাকা রক্তের দাগ দেখতে পেল। কোনো কথা না বলে সে ক্ষেপণাস্ত্রের টিউবটা নামিয়ে রাখল, ওটা আবার ব্যবহার করা যাবে। রুকস্যাক খুলে তার থেকে বড় একটা ছুরি বার করে রক্তের দাগের উপর দিয়ে শালোয়ারটা কেটে দিল।

উরুর ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় নিখুঁত গোল গর্ত, তার চারপাশে শুকিয়ে আসা জমাট রক্ত। গর্তটা কতটা গভীর তা বোঝা গেল না। মাইকের মনে হ'ল ক্ষতটা বড় মেশিনগানের বুলেট থেকে হয়নি। ওই বুলেট লাগলে উরুর মাংস ছিঁড়ে ফেটে যেত। সম্ভবত একটা ছোট পাথরের টুকরো অথবা বুলেটের খোলের টুকরো বিঁধে গেছে। তার কাছে প্রাথমিক শুশ্রূষার সরঞ্জাম ছিল। ফার্স্ট এড দেওয়ার ব্যাপারে সে যথেষ্ট দক্ষও বটে। কিন্তু উরুর প্রধান ধমনীর কাছাকাছি যদি বুলেটের খণ্ডটা বিঁধে থাকে, তাহলে....

"আংলিজ, আমরা কি মরবো?" ছেলেটার গলা অল্প কাঁপলো।

"ইনশাল্লাহ্!" মাইক বলে উঠলো, "একদিন তো মরতে হবেই, কিন্তু সেইদিন আজ নয়, ইজমৎ খান, আজ নয়!" সে আশাভরা উৎফুল্ল কণ্ঠে কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু একটা সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। বড় রুকস্যাকটা সঙ্গে রাখা বিশেষ দরকার, ওর ভেতর অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে। কিন্তু আফগান ছেলেটার পক্ষে হাঁটা অসম্ভব, ওকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ছেলেটা আর রুকস্যাক দুটোই বওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি করা যেতে পারে?

"তুমি এদিকের পাহাড়ি অঞ্চলটা ভালভাবে চেনো?" সে জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই", ইজমৎ খান উত্তর দিল।

"তাহলে আমি আরেকজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবো। তুমি তাকে ঠিক করে বুঝিয়ে দেবে কি করে, কোথায় আসতে হবে। আমার বড় ব্যাগ আর রকেট আমি এখানে পাথরের নীচে পুঁতে রেখে যাচ্ছি," মাইক বলল।

একটা চ্যাপ্টা ইস্পাতের বাক্স খুলে সে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ বার করল। একটা ছোট অ্যামপিউলের মুখ ভেঙে তার ভেতরের তরল পদার্থটুকু সে সিরিঞ্জের মধ্যে এরপর টেনে নিল। ইজমৎ খান ফ্যাকাশে মুখে তার কার্যকলাপ দেখছিল। ইঞ্জেকশনকে তার ভীষণ ভয়! সে দাঁতে দাঁত টিপে ধরল—একজন কাফেরের সামনে সে কিছুতেই আর্তনাদ করবে না।

মরফিন ইঞ্জেকশনটা ইজমৎ-এর উরুতে দিতে মাইকের লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উরুর যন্ত্রণা কমতে শুরু করল। আংলিজের জাদু ওষুধ! উৎসাহিত হয়ে ইজমৎ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা শুরু করল। তার দিকে আর নজর

BanglaBook.org

না দিয়ে মাইক এবার রুকস্যাক থেকে একটা বড় খোন্তা বার করে তা দিয়ে কুচো পাথর সরিয়ে মাটির মধ্যে একটা অগভীর লম্বা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রুকস্যাক ও রকেট টিউব দুটো শুইয়ে দিল। ফের সেগুলোর ওপর মাটি চাপা দিয়ে সে পাথরের খণ্ডগুলো উপরে ছড়িয়ে দিল। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে সে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখল—না, কবর দেওয়া জিনিসগুলে নজরে পড়ছে না। তারপরে সে চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে পাথরের স্তূপটার পুরো চেহারাটা মাথার মধ্যে গেঁথে নিল। আবার যদি সে পাহাড়ের এই জায়গাটায় ফেরৎ আসতে পারে, তাহলে সমস্ত জিনিসগুলো উদ্ধার করে নেবে।

আফগান কিশোরের প্রতিবাদ কানে না তুলে সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে কাঁধের ওপর ফেলে সামনের দিকে রওনা দিল। ছেলেটার ওজন বেশি নয়, বড়জোর চল্লিশ কিলোগ্রাম। জিনিসে বোঝাই রুকস্যাকটার ওজন এর চেয়ে বেশি। তবুও আরো উঁচুতে উঠে পাহাড় টপকে ওপারে যেতে গেলে তার দম বেরিয়ে যাবে। সুতরাং মার্টিন ঢিবির ধার ঘেঁষে একটা রাস্তা ধরে ধীরগতিতে সামনের উপত্যকার দিকে নামতে লাগল। একটু পরেই বোঝা গেল তার সিদ্ধান্ত সঠিক।

কোনো সোভিয়েত বিমান ঘায়েল হয়ে ভূ-পাতিত হলেই আশপাশ থেকে পাশতুন উপজাতীয় লোকেরা ছুটে যায় ধ্বংস হওয়া বিমান থেকে যা কিছু পাবে হাতিয়ে নিতে। ধ্বংস হওয়া হাইগু থেকে পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুণ্ডলী তখনো পর্যন্ত রাশিয়ানদের নজরে আসেনি। সিমোনভের শেষ বেতার বার্তা ছিল একটা আর্ত চিৎকার—তা থেকে জালালাবাদের ঘাঁটির কেউই কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু আর একটা নিকটবর্তী উপত্যকার মুজাহিদদের নজরে এলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। উপত্যকার প্রায় এক হাজার ফিট ওপরে মাইক ও ইজমৎ-এর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে গেল মুজাহিদদের।

ইজমৎ খান সোৎসাহে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিল। পাহাড়ি মানুষগুলির কণ্ঠের মুখে উজ্জ্বল আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। জয়ধ্বনি করতে করতে তারা একের পর এক এগিয়ে এসে স্যাস-এর সদস্য ইংরেজের পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু তাদের সঙ্গে বসে চা পানের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে মাইক ইজমৎ-এর রক্তমাখা পায়ের দিকে আঙুল দেখাল। সে জোরের সঙ্গে বলল যে তার বালক বন্ধুর উরুতে শিগগিরই অপারেশন করা দরকার। সে রকম জায়গা কাছেপিঠে আছে কি? যদি থাকে, তাহলে তাদের সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে কোনো যানবাহন পাওয়া যাবে কি?

একজন মুজাহিদ জানাল যে দুটো উপত্যকার পরে তার এক আত্মীয় থাকে, তার একটা শক্তসমর্থ খচ্চর আছে। এক পাহাড়ি গুহার ভেতরে নামখানাতে মাইক ও ইজমৎকে বসিয়ে রেখে সে সেই আত্মীয়কে ডেকে নিয়ে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেল। খচ্চরসহ লোকটি এসে পৌঁছল রাত্রিবেলায়। মাইক ইজমৎ-এর উরুতে আরো একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিল।

ইজমৎ খানকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে রাতের অন্ধকারে মাইক রওনা হ'ল। পশুটির মালিক তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সবে যখন ভোরের আলো ফুটছে, সেই সময় তারা তিনজনে স্পিন ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে এসে পৌঁছল। তাদের গাইড থেমে গিয়ে সামনে আঙুল দেখাল।

BanglaBook.org

"জাজি", সে বলল। "ওখানে আরবরা আছে। আমি আর যাব না।"

শেষ দু' মাইল বন্ধুর রাস্তা মাইককে পাড়ি দিতে হ'ল ইজমৎকে কাঁধে নিয়ে। জাজি জায়গাটা পাঁচশোটা পাহাড়ি গুহার সমষ্টি। তিন বছর ধরে তথাকথিত আফগান-আরবরা এখানে গুহাগুলোকে খুঁড়ে, চওড়া করে একটা বিরাট গেরিলা যুদ্ধ-ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করে তুলছিল। বেশিরভাগ গুহাকে সেনা ব্যারাকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল একটা মসজিদ, ইসলামি ধর্মীয় পুস্তকের একটা মস্ত গ্রন্থাগার, বেশ কয়েকটা রান্নাঘর, দোকান, অস্ত্রভাণ্ডার এবং একটা পুরোদস্তুর আধুনিক হাসপাতাল। মাইকের অবশ্য তখনো পর্যন্ত এসব কিছুই জানা ছিল না।

মাইককে প্রথমে আটকালো সীমানার প্রহরীরা। কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না, কারণ পাশতুনবেশী মাইকের কাঁধে একটি আহত কিশোর—বোঝাই যাচ্ছিল যে সে হাসপাতালে যেতে চায়। তবুও প্রহরীরা জটলা করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, লোকটাকে নিয়ে কি করা যায়। মাইক বুঝতে পারল তারা আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে, অর্থাৎ আলজিরিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় কথা বলছে। একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকের আবির্ভাবে তাদের আলোচনায় ছেদ পড়ল। এই লোকটি সৌদি আরবের আরবী কথা বলছিল। মাইক প্রতিটি কথা বুঝতে পারছিল, কিন্তু সে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। পাশতুন উপজাতীয়দের আরবী ভাষার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাদের অধিকাংশ কথ্য আরবী কিছু বোঝেই না। সুতরাং সে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাল যে তার আহত সঙ্গীটির খুব তাড়াতাড়ি শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন। সৌদি আরবীয় লোকটি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে তাকে ইশারায় তার সঙ্গে আসতে বলল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ইজমৎ খানের উরুতে অস্ত্রোপচার করা হ'ল। একটা বড় মেশিনগানের গুলির টুকরো উরুর গভীরে বিঁধেছিল। অস্ত্রোপচারের পরে ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন ইজমৎ-এর ঘুম ভাঙার জন্য মাইক অপেক্ষা করতে লাগল। সে উবু হয়ে ওয়ার্ডের এককোণে ছায়ার মধ্যে বসে রইল, যে কোনো পার্বত্য পাশতুনের মতো। কেউ তার দিকে নজর দিল না।

এক ঘণ্টা পরে দুটি লোক ওয়ার্ডে ঢুকল। একজন খুব লম্বা, দাড়িওয়ালা, বয়স খুব বেশি মনে হয় না। তার পরণে ঢিলে আরবী পোশাক, তার ওপরে সামরিক জ্যাকেট, মাথায় সাদা আরবী পাগড়ি। তার সঙ্গের লোকটি বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট, ছোট নাকের ডগায় রূপোর গোল চশমা। বয়স ৩৫-৩৬ হবে। তার পরণে শল্যচিকিৎসকের জোব্বা। অন্য দু'জন রোগীকে পরীক্ষা করার পরে তারা এসে দাঁড়াল ইজমৎ খানের পাশে। দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি সৌদি আরবীতে কথা বলল—

"আমাদের তরুণ আফগান যোদ্ধা, এখন কেমন আছো?"

'ইনশাল্লাহ্, আমি খুব ভাল আছি, শেখ।' ইজমৎ আরবীতেই উত্তর দিল। সে সম্মানসূচক 'শেখ' উপাধিতে সম্বোধন করায় দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি খুশি হয়ে হাসল।

"বাঃ, তোমার বয়স এত কম, তুমি তো বেশ ভাল আরবী বলতে পারো!"

"সাত বছর ধরে আমি পেশোয়ারে মাদ্রাসায় পড়েছি, শেখ। গত বছরেই আমি

BanglaBook.org

ফিরে এসেছি—যুদ্ধ করার জন্যে।"

"তুমি কার হয়ে যুদ্ধ করছো?"

"আমি আফগানিস্তানের জন্যে যুদ্ধ করছি", ইজমৎ উত্তর দিল। দীর্ঘকায় লোকটির মুখের ওপর সামান্য অসন্তোষের একটা ছায়া ভেসে গেল। তার কুঞ্চিত ভুরু দেখে ইজমৎ বুঝতে পারল তার উত্তরটা ঠিকমতো হয়নি। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি আল্লার জন্যও লড়ছি, শেখ।"

ভ্রূর কুঞ্চন মিলিয়ে গিয়ে লোকটির মুখে ফের শান্ত হাসি ফিরে এলো। সে সামনে ঝুঁকে আফগান কিশোরটির পিঠ চাপড়ে দিল। তারপরে বলল, "একদিন আসবে যেদিন আফগানিস্তানের কাছে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার কাছে তোমার মতো যোদ্ধার প্রয়োজন কোনোদিন ফুরোবে না।"

বেঁটে মোটা ডাক্তারের দিকে ফিরে এইবার লম্বা লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আমাদের এই তরুণ বন্ধু এখন কেমন আছে?"

"দেখি একবার", বলে ডাক্তার ইজমৎ-এর উরুতে জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা খুলল। দেখা গেল ক্ষতস্থানটা একদম পরিষ্কার; পাঁচ-ছ'টা সেলাই পড়েছে, কোনরকম ছোঁয়াচ লাগার সম্ভাবনা আর নেই।

"আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি হাঁটতে পারবে", ডাঃ আয়মান আলজাওয়াহিরি বলল। তারপর সে আর তার দীর্ঘকায় সঙ্গী ওসামা বিন-লাদেন ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। ওয়ার্ডের এক কোণে দুই হাঁটু বুকের সামনে তুলে বসে থাকা ঘর্মাক্ত, আধঘুমন্ত মুজাহিদটিকে কেউই লক্ষ্য করল না।

একটু পরে উঠে মাইক মার্টিন ইজমৎ-এর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। "এবার আমাকে যেতে হবে। এই আরবরা তোমার বেশ ভালই দেখাশোনা করছে। আমি তোমার বাবাকে খুঁজে বার করে অন্য একজন গাইডের সঙ্গে আমার গন্তব্যস্থলে যাবো। ...আল্লা তোমার সঙ্গে থাকুন!"

"সাবধানে থেকো, মা-ই-ক," ইজমৎ বলল। "এই আরবগুলো আমাদের মতো নয়। তুমি কাফের, একথা যেন এরা কিছুতেই জানতে না পারে। পৃথিবীর সব বিধর্মীকেই এরা ঘৃণা করে।"

"তাহলে তুমিও যেন এদের বলে ফেলো না আমি কে, আমার পরিচয় কি," মাইক মৃদুস্বরে বলল।

কোনো উত্তর না দিয়ে ইজমৎ খান চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। তাকে যদি অত্যাচার করে মেরেও ফেলা হয়, তবুও সে তার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিছুতেই না। সে আফগান—বন্ধুর বিশ্বাসের চরম মর্যাদা দেওয়া তাদের ধর্ম। খানিকক্ষণ পরে চোখ খুলে সে দেখল তার প্রাণরক্ষাকারী আংলিজ সাথী চলে গেছে। সে পরে শুনেছিল যে আংলিজ পাঞ্জশিরে শাহ্ মাসুদের কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে আর কোনোদিন দেখা হয়নি।

সোভিয়েত সেনাদের চোখ এড়িয়ে ছ'মাস আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে কাটানোর

BanglaBook.org

পরে মাইক মার্টিন লুকিয়ে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ড ফিরে গেল। তখন থেকেই সে অনর্গল পুশতু বলতে পারে। কিছুদিন ছুটি উপভোগ করার পরে সে আবার স্যাসে ফিরে ক্যাপ্টেন পদে পুনর্বহাল হল। ১৯৮৮ সালে তাকে পাঠানো হ'ল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে। তার এইবারের কাজের ধরন ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

দুর্ধর্ষ আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি, অর্থাৎ আই. আর.এর সদস্যেরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে শুধুমাত্র স্যাসের লোকেদের ভয় পেত। একটা 'স্যাসম্যান'-কে পাকড়াও করে তার উপর অত্যাচার চালিয়ে কথা আদায় করা, অথবা তাকে খুন করা— এই ছিল যে কোনো আই.আর.এ. বিপ্লবীর সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন।

মাইককে পাঠানো হল ১৪নং গোয়েন্দা কোম্পানির সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার জন্য। সৈনিকমহলে চালু ভাষায় এদের নাম ছিল দ্য ডিট্যাচমেন্ট, সংক্ষেপে 'ডেট'— অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাহিনী, যারা মূল সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন। ডেটের সদস্যদের কাজ ছিল লক্ষ্য রাখা, আড়ি পাতা এবং আই.আর.এ. বিপ্লবীদের খুঁজে বার করা। বলা বাহুল্য, কাজটা অতীব বিপজ্জনক এবং গোপন। সংক্ষেপে ডেটের প্রধান কাজ আই.আর.এ. ভবিষ্যতে কোথায় আক্রমণ চালাবে ব'লে মনস্থ করেছে, সন্তর্পণে সেই তথ্য আবিষ্কার করে সেনা দপ্তরকে তা জানিয়ে দেওয়া। কাজটা সহজ তো ছিল না বটেই, উপরন্তু এই কাজ হাসিল করার জন্যে ডেটের সদস্যদের নানারকম বিচিত্র কাজকর্ম করতে হ'ত।

বেশিরভাগ সময়েই পাকা সিঁধেল চোরদের মতো আই.আর.এ. নেতাদের বাড়ির ছাদের টালি সরিয়ে নানা জায়গায় ছোট ছোট গুপ্ত বৈদ্যুতিন গ্রাহকযন্ত্র—চলতি কথায় 'বাগ' —লুকিয়ে রাখা হ'ত। মৃত আই.আর.এ. বিপ্লবীদের কফিনের মধ্যেও 'বাগ' লাগানো হ'ত, কারণ প্রায়শই গির্জায় মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ছল করে আই.আর.এ. নেতারা গুপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সভা করতো। লম্বা টেলিফটো লেন্স লাগানো ভিডিও ক্যামেরায় দূরে কথোপকথনরত বিপ্লবীদের মুখের ক্লোজ-আপ ছবি তোলা হ'ত। পরে ঠোঁট নড়া পরীক্ষা করে দক্ষ এজেন্টরা উচ্চারিত কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করতো। ডেট-এর হাতে যখন সত্যিকারের দামী তথ্য আসতো, তখন সেটা যথাযথ দপ্তরকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

মুখোমুখি লড়াই হলে কি করতে হবে, সে বিষয়ে ব্রিটিশ সৈনিকদের ওপর নানা কড়া নির্দেশ ছিল। আই.আর.এর লোকেরা যদি প্রথমে গুলি চালায়, তবেই সৈনিকদের তরফ থেকে গুলি চালানো যাবে। যদি প্রতিপক্ষ বন্দুক-পিস্তল ফেলে দেয়, তাহলে তাদের জীবন্ত বন্দী করতে হবে। সুতরাং গুলি চালানোর সময়ে স্যাস ও প্যারাবাহিনীর সৈনিকদের প্রচণ্ড সতর্ক থাকতে হতো। কারণ ব্রিটিশ আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশের শত্রুদেরও নাগরিক তথা মানবিক অধিকার আছে। কিন্তু সৈনিকদের? না, নেই।

দেড় বছর ধরে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ঘুরে ঘুরে, প্রধানত রাতের অন্ধকারে নানারকম গুপ্ত কাজকর্ম করে বেশ কিছু আই.আর.এ. বিপ্লবীকে নিকেশ করল ক্যাপ্টেন মাইক মার্টিন ও তার দলবল। প্রতিবারই বোকার মতো আইরিশরাই প্রথমে গুলি চালিয়েছিল।

BanglaBook.org

প্রতিবারই তাদের মৃতদেহগুলো খুঁজে পেত রয়্যাল আলস্টার কন্সট্যাবুলারি, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সরকারি পুলিশ।

এইরকম একটা গুলির লড়াইতে মাইক প্রথম আহত হ'ল। ভাগ্যক্রমে গুলিটা লাগল বাঁ হাতের বাইসেপ পেশীতে। তাকে আলস্টার থেকে তুলে নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। হাসপাতালে থাকার সময়ে তার সঙ্গে আলাপ হ'ল লুসিণ্ডা নামে এক নার্সের—কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। লণ্ডনের কাছে একটা সুদৃশ্য কুটির ভাড়া নিয়ে মাইক ও লুসিণ্ডা সংসার পাতলো। ১৯৯০ সালের বসন্তকালে মাইক বদলি হ'ল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে, তার অফিস হ'ল লণ্ডনে হোয়াইট হল। জীবনে এই প্রথম মাইক গাঢ় রঙের স্যুট পরে রোজ লোকাল ট্রেনে অফিস যাতায়াত শুরু করল। তার নতুন পদের নাম হ'ল সামরিক কাজকর্ম বিভাগের স্টাফ অফিসার। অন্যদিকে লুসিণ্ডারও পদোন্নতি হ'ল মেট্রন পদে। বেশ চমৎকার চলছিল তাদের বিবাহিত জীবন, কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না। তার কারণ একজন বিদেশী।

সেই বছরেই ২রা আগস্ট ইরাকের স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেন প্রতিবেশী দেশ কুয়েত আক্রমণ করল। মাইকের জীবনে আরো একবার মার্গারেট থ্যাচার ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (সিনিয়র) একত্রে এই অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। যৌথ সামরিক অভিযান চালিয়ে খনিজ তেলের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ছোট্ট দেশটাকে ইরাকি আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

এস.আই.এস.-এর দু'জন উচ্চপদস্থ অফিসার মাইককে খুঁজে বার করল। ফোন করে তাকে সেন্ট জেমস্ স্কোয়ারের একটা ক্লাবে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের আমন্ত্রণ জানানো হ'ল দু'দিনের মধ্যেই। মাইক পৌঁছে দেখল দুই অফিসার ছাড়াও লাঞ্চে হাজির শেলটেনহ্যামের এক আরবী বিশারদ। এই লোকটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাইকের সঙ্গে দ্রুত কথ্য আরবীতে কথাবার্তা চালালো। তারপরে বলল, "আমি জীবনে কখনো কোনো ইংরেজকে এত ভাল আরবী বলতে শুনিনি। তার ওপরে এইরকম গাঢ় তামাটে গায়ের রঙ আর রোদে পোড়া মুখ—যে কেউ ওকে দেখলে আরব বলেই মনে করবে। ভালোই চলবে।"

তার কাজ ছিল এইটুকুই। কাজ সারা হতে অল্প কিছু মুখে দিয়ে সে নিজের কাজে চলে গেল। এইবার সিনিয়ার অফিসারটি কথা বলা শুরু করল। "ফার্ম-এর তরফে তোমাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি। তুমি যদি ইরাকের ভেতরে ঢুকে ওদের কাজকর্ম সম্বধে একটু খোঁজখবর নিয়ে নিয়মিত আমাদের জানাও তো আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

"কিন্তু আমি তো মূলত প্যারাবাহিনীর সৈনিক," মাইক বলল।

"ওদের বুঝিয়ে রাজি করানোর দায়িত্ব আমাদের, সে ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এখন তোমার কি মত, তাই বলো।"

সামরিক বাহিনীর তরফে যথেষ্টই অসন্তোষ প্রকাশ করা হ'ল, কিন্তু শেষ অবধি তারা মাইককে ছাড়তে রাজি হ'ল। কয়েক সপ্তাহ পরে এক বেদুইন উট বিক্রেতার

BanglaBook.org

ছদ্মবেশে মার্টিন সৌদি আরবের মধ্যে দিয়ে ইরাক অধিকৃত কুয়েতে ঢুকে পড়ল। বেদুইনরা বরাবরই একান্তভাবেই নিরপেক্ষ, কোনোরকম রাজনীতির তারা ধার ধারে না। ফলে কুয়েত সিটিতে হেঁটে পৌঁছনোর পথে বেশ কয়েকটা ইরাকি সৈন্যদলের সঙ্গে তার দেখা হ'ল বটে, কিন্তু সঙ্গে বিক্রির জন্য দুটো উটসহ এই দাড়িওলা যাযাবর বেদুইনের দিকে কেউ নজরই দিল না।

এ যাত্রা কয়েক মাস কুয়েতে থেকে সেই দেশের প্রতিরোধ বাহিনীর তরুণ যোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের কিছু কৌশল শিখিয়ে মাইক বেরিয়ে এলো। বেরোবার আগে অবশ্য ইরাকি সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটিগুলোর অবস্থান, তাদের শক্তিসামর্থ্য ও দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু খুঁটিনাটি জেনে নিতে ভুলল না।

এর কিছুকাল পরেই ফের তার ডাক পড়ল। এবার সে ঢুকল খোদ ইরাকের রাজধানী বাগদাদে। তার বালক বয়সের চেনা প্রিয় শহর, ফলে এক ইরাকি ধনকুবেরের বাংলোয় মালির কাজ জোগাড় করতে তার অসুবিধে হ'ল না। বাগানেরই এক কোণে ছোট ঘরে হ'ল তার আস্তানা। সাদ্দামের এক উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ইরাকের নানা সামরিক গোপন তথ্য বাগদাদের বিভিন্ন জায়গায় লুকানো ড্রপ বক্সে ফেলে রেখে যেত। মাইকের কাজ ছিল সেগুলো সংগ্রহ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে মার্কিন দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া। এজন্য তার অস্ত্র ছিল একটা ছোট কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ডিশ অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনা থেকে নির্গত প্রচণ্ড দ্রুতগামী সাঙ্কেতিক সিগন্যাল ইরাকিদের রেডিওতে ধরা পড়তো না। মাইকের পরিচয় এত গোপন রাখা হয়েছিল যে রিয়াধের যৌথ সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরের আমেরিকান ও ব্রিটিশ কর্তারাও তা জানতো না। ১৯৯১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি সাদ্দাম পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার পর মাইক গোপনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে সৌদি আরবে ঢুকে পড়ল।

১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সকালে জেনারেল বোরিস গ্রোমোভ তাঁর অধীন সোভিয়েত চল্লিশ নম্বর আর্মিসহ আফগানিস্তান ছেড়ে আমুদরিয়া নদীর ওপর বিস্তৃত ফ্রেণ্ডশিপ ব্রিজ পার হয়ে সোভিয়েত উজবেকিস্তানে চলে গেলেন। রুশ-আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয় এতেই শেষ হ'ল না। তার মুখাপেক্ষী ইউরোপীয় দেশগুলিতে সাম্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হ'ল। সোভিয়েত অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হ'ল। নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতল বার্লিনবাসী জার্মান নাগরিকবৃন্দ। এক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে বার্লিনের কুখ্যাত প্রাচীর চূর্ণ হ'ল। কিছুদিনের মধ্যেই সোভিয়েত সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে গেল।

কাবুলে রুশ পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাহর সরকার কিন্তু টিকে রইল। তার প্রথম কারণ শক্তিশালী আফগান সেনাবাহিনী দেশের বেশিরভাগ অংশেই আধিপত্য বজায় রাখল। তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে লাগল গুপ্ত পুলিশবাহিনী 'খাদ'। সব ক'টি শহর ও জনসংখ্যার অধিকাংশের ওপর তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায়

BanglaBook.org

রইল।

দ্বিতীয়ত, সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করল উপজাতীয় সর্দাররা। তারা সবাই মিলে একত্র হয়ে একটা স্থায়ী সরকার গঠন করার বদলে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি-মারামারিতে লিপ্ত হ'ল। এই সর্দারেরা প্রায় প্রত্যেকেই লোভী এবং স্বার্থপর। শত্রু তাড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশ শাসনের ব্যবস্থা না করে তারা একটা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা করল।

ইজমৎ খান এই সব কিছুর থেকে দূরে ছিল। তার উরুর ক্ষত সেরে যাওয়ার পর সে গ্রামে ফিরে গিয়ে তার বাবার লশ্‌করের পরিচালন ভার নিজের কাঁধে নিয়েছিল। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তার শারীরিক শক্তি ও কঠিন ব্যক্তিত্ব দেখে গ্রামবাসীরা তাকে এককথায় তাদের ছোট সর্দার বলে মেনে নিল। যুদ্ধের ধকল নূরি খানের চেহারায় অকালে বার্ধক্যের ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু ভেঙে-পড়া শরীর নিয়েও সে তার ছোট ছেলে ও লশ্‌করের অন্য সদস্যদের সহায়তায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মালোকো-জাই গ্রামকে আবার গড়ে তুললো। এরই মধ্যে তার গেরিলাবাহিনী সাদা পর্বতের একটা কন্দরে এক বিশাল সোভিয়েত অস্ত্রভাণ্ডার আবিষ্কার করল। কিছু বন্দুক ও কার্তুজ নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রেখে বাকি সব অস্ত্র তারা স্পিন ঘর পেরিয়ে পাকিস্তান সীমান্তে পারাচিনার শহরের কালোবাজারে বিক্রি করে সেই টাকায় ছাগল ও ভেড়ার পাল কিনে নিল।

রাশিয়ান বিমানের বোমা বর্ষণে মালোকো-জাই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নূরি খানের তত্ত্বাবধানে আবার আগের মতো পাঁচিল ঘিরে কুটিরগুলো তৈরি হতে লাগল। শুরু হ'ল গাছ পোঁতা আর ছাগল, ভেড়া চরানোর কাজ। ইজমৎ খান উৎফুল্ল হৃদয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কেমন করে ধীরে ধীরে ফের গড়ে উঠছে তার জন্মস্থান। তার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারা, অদম্য সাহস ও অবিশ্রাম খাটবার ক্ষমতা দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল নূরি খান। গ্রামের সবচেয়ে সম্মানিত পদটি এবার সে ইজমৎকে ছেড়ে দিল। প্রতি সপ্তাহে জুম্মাবারের নমাজে পবিত্র কোরান পাঠ করার অধিকার পেল ইজমৎ।

যাযাবর কুচি সম্প্রদায়ের মানুষদের মুখে ইতিমধ্যে খবর আসতে লাগল যে সমভূমিতে অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। আফগানিস্তান জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী ও নাজিবুল্লাহের সরকার তখনও শহরগুলোর ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে বটে, কিন্তু উপজাতীয় সর্দারেরা দেশের বাকি অংশে সমানেই নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করার লড়াই চালাচ্ছে। লুঠতরাজ, খুন জখম চলছে অবাধে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই।

কুড়ি পূর্ণ হয়ে একুশে পা দেবার কিছুদিন পূর্বেই কাছাকাছি একটি গ্রাম থেকে একটি সুন্দরী তরুণীকে পছন্দ করে নূরি খান ইজমতের বিয়ে দিল। তিনদিন ধরে আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠল মালোকো-জাই। পেশোয়ারে ওয়াহাবি ইমামরা মাদ্রাসায় শিখিয়েছিল যে নাচ-গান-ফূর্তি করা ইসলামের নীতিবিরোধী। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ইজমৎ প্রথমে গ্রামবাসীদের ওপর ফতোয়া জারি করল যে বাজনা বাজিয়ে

BanglaBook.org

নাচগান করা চলবে না মোটেই। নূরি খান তার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। সে ঘোষণা করল যে কোরানে কোথাও এমন নির্দেশ নেই। শেষ পর্যন্ত ইজমৎ খান নতি স্বীকার করল তো বটেই, উপরন্তু দু'দিনের জন্য সে তার ওয়াহাবি শিক্ষা ভুলে নিজেও নাচে গানে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। সেই রাতেই অভ্যাগতরা বাড়ি চলে যাওয়ার পরে সে নববধূর সঙ্গে মিলিত হ'ল। তিন মাসের মধ্যেই জানা গেল তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, ফেব্রুয়ারি মাসে তুষারাবৃত শীতকালে জন্ম নিতে চলেছে তার প্রথম সন্তান।

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরে আরবরা দল বেঁধে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ইজমতের স্ত্রী মরিয়মের সন্তানের আবির্ভাব যখন আসন্ন, সেই সময়ে তারা পুনরায় ফিরে এলো। সেই গুহা-হাসপাতালে যে দীর্ঘকায় সৌদি আরবীয় লোকটি তার সঙ্গে কথা বলেছিল, ইজমৎ শুনল যে সে এখন এই সব আরবদের একচ্ছত্র নেতা। সে নাকি রয়েছে অনেক দূরে সুদান নামে একটা দেশে। সে নিজে না এলেও, তার সহকারীদের হাত দিয়ে সে প্রচুর টাকা পাঠাল। এই টাকার থেকে বেশ কিছু অংশ উপজাতীয় সর্দারদের নজরানা দিয়ে আরবরা বিভিন্ন জায়গায় জিহাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঘাঁটি তৈরি করতে লাগল। আরব দুনিয়া থেকে হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবী তরুণ এসে যোগ দিতে লাগল এই ট্রেনিং ক্যাম্পগুলিতে। তাদের লক্ষ্য নতুন এক জিহাদের জন্য তৈরি হওয়া।

আরবদের এই কাজকর্মের কথা শুনে ইজমৎ খান অবাক হয়ে গেল। জিহাদ? কার বিরুদ্ধে জিহাদ? রুশ শত্রুরা তো দেশ ছেড়ে চলে গেছে! সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল যে এই আরবরা উপজাতীয়দের গৃহযুদ্ধে কোনোরকম অংশ নিল না। তাহলে ওরা কাদের যুদ্ধের শিক্ষা দিচ্ছে? কেন? অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অবশেষে যাযাবার কুচিদের কাছ থেকে সঠিক খবর পেল ইজমৎ। সে জানতে পারল যে এই সমস্ত কিছুর পেছনে আছে সেই দীর্ঘদেহী ব্যক্তিটি। তার অনুগামীরা সকলেই তাকে 'শেখ' নামে সম্বোধন বা উল্লেখ করে। লোকটি আদতে সৌদি আরবের বাসিন্দা ও নাগরিক। কিন্তু সে নিজের দেশের সরকার ও পশ্চিমী দেশগুলির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। সৌদি আরব মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিধর্মী আংলিজ ও আমরিকিদের সাহায্য করছে, এ কাজ নাকি ইসলাম বিরোধী। সুতরাং শেখ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—সৌদি আরব ও সারা পশ্চিমী দুনিয়ার বিরুদ্ধে।

পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে ইজমৎ খানের কোনো ঝগড়া নেই। এই দেশগুলি টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল বলেই তো সোভিয়েত রাশিয়াকে যুদ্ধে হারানো গেল। তার নিজের জীবনে এখনও পর্যন্ত একজন কাফেরের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। সেই লোকটিই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। শেখের পবিত্র জিহাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ যুদ্ধ তার যুদ্ধ নয়। তার চিন্তা তার নিজের দেশকে নিয়ে— যে দেশ ক্রমশই এক উন্মত্ত, উন্মাদ অবস্থার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তারও আগে তার প্রথম কর্তব্য মালোকো-জাই গ্রামকে বাঁচিয়ে তোলা। এই গ্রামেই তার শিকড় প্রোথিত, আর কে না জানে যে পুরুষ মানুষকে সদা সর্বদাই তার শিকড়ের কাছে বাঁধা থাকতে হয়।

BanglaBook.org

প্যারাশুট রেজিমেন্ট কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে মাইক মার্টিনকে ফেরত নিল। কিন্তু এবার তার সম্বন্ধে রেজিমেন্টে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। চার বছরের মধ্যে দু'বার ছুটি—দু'বারই ছ'মাস করে—অথচ কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। কিন্তু মাইকের নৈপুণ্য অস্বীকার করা গেল না। ১৯৯২ সালে তাকে ক্যাম্বারলির স্টাফ কলেজে পাঠানো হ'ল। সেখান থেকে ফের ডাক এলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে। তাকে মেজর পদে উন্নীত করে ফের হোয়াইট হলে বদলি করা হ'ল। এখানে আবার তার পরিচয় হল স্টাফ অফিসার, বলকান পার্বত্য বিভাগ। সার্বিয়া ও বসনিয়ার মধ্যে তখন প্রচণ্ড লড়াই চলছে, জাতি বিশুদ্ধিকরণের নামে নির্মমভাবে খুন করা হচ্ছে মুসলমানদের। মাইকের কাজ অবশ্য অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। সরাসরি রণাঙ্গনে না যেতে পেরে মনের ভেতর বেশ তীব্র ক্ষোভ জন্মাল তার, কিন্তু কিছু করার ছিল না। একাদিক্রমে দু' বছর ফের গাঢ় রঙের স্যুট পরে, ব্যাগ হাতে, লোকাল ট্রেনে ডেইলি প্যাসেঞ্জারের জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু সরাসরি অ্যাকশনের মধ্যে থাকতে না পেরে সে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। অবশেষে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে তার কাছে বড়দিনের উপহার এসে পৌঁছল। লুসিণ্ডা কিন্তু এতে মোটেই খুশি হ'ল না।

যে সামরিক অফিসাররা একবার স্যাস-এর হয়ে কাজ করেছে, তারা আবার স্যাসে ফেরৎ যেতে পারে, কিন্তু আমন্ত্রণ পেলে তবেই তা সম্ভব। বড়দিনের ঠিক আগে হিয়ারফোর্ড থেকে সেই আমন্ত্রণ এলো। কিন্তু তার বিবাহিত জীবনে একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। কিন্তু তাদের দু'জনের পেশাগত জীবন দুই বিপরীতমুখী স্রোতে বইছিল। লুসিণ্ডা এর মধ্যে একটা খ্যাতনামা হাসপাতালে উচ্চপদে চাকরি পেল। নার্সের পেশায় এরকম সুযোগ বারবার আসে না। কিন্তু হাসপাতালটা লণ্ডন থেকে অনেকটা দূরে, মিডল্যাণ্ডসে। আর মাইককে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে তাকে স্যাসের বাইশ নম্বর ব্যাটালিয়নের 'বি' স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডিং অফিসার পদে যোগ দিতে হবে এবং গোপনে বসনিয়াতে অভিযান চালাতে হবে। খাতায় কলমে সে ও তার অধীন বাহিনী রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনীর অংশ। কিন্তু তাদের আসল কাজ যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বার করে বন্দী করা, প্রয়োজন হলে খতম করে দেওয়া। লুসিণ্ডাকে এত কথা বলা সম্ভব ছিল না। মাইক শুধু জানাল যে তাকে আবার কয়েক মাসের জন্য বাইরে যেতে হবে।

লুসিণ্ডার আর সহ্য হ'ল না। এমনিতেই তাদের দু'জনের মধ্যে কিছুদিন ধরেই খিটিমিটি চলছিল। ঝড়গার প্রধান বিষয় মাঝে মাঝেই মাইকের অন্তর্ধান, যদিও গত দু' বছরে ঝগড়াঝাটি খানিকটা কমেছিল। মাইককে ফের কয়েক মাসের জন্য যেতে হবে শুনে লুসিণ্ডা ধরে নিল যে সে ফের আরব দেশে যাচ্ছে। সে রাগে ফেটে পড়ে বলল,

BanglaBook.org

"হয় তুমি তোমার প্যারাট্রুপ, স্যাস আর তোমার হতচ্ছাড়া মরুভূমি নিয়ে থাক, নয়তো আমার সঙ্গে বার্মিংহ্যামে চলো। আর পাঁচটা লোকের মতো দায়িত্বশীল বিবাহিত জীবন কাটাও।"

কয়েকদিন চিন্তাভাবনা করে মাইক জানাল যে মরুভূমিই তার পছন্দ। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ডিভোর্সটা তাড়াতাড়িই হয়ে গেল।

পেশোয়ারে থাকার সময়েই ইজমৎ খান হিজব্-ই-ইসলামি পার্টির সদস্য হয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই পার্টির নেতা ইউনিস খালিস মারা যেতে পুরো দলটা হেকমতিয়ারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। হেকমতিয়ারের নৃশংসতা ইজমৎ খানের বরদাস্ত হতো না। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার একটি পুত্র সন্তান লাভ হ'ল। ইতিমধ্যে কাবুলে নাজিবুল্লাহ সরকারের পতন হ'ল। নাজিবুল্লাহ একটা রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত অতিথিশালায় আশ্রয় নিল। অধ্যাপক রব্বানির অধীনে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল বটে, কিন্তু রব্বানি জাতে তাজিক, তাকে পাশতুনরা মেনে নিল না। সুতরাং কাবুলের বাইরে সর্বত্র খুন জখম রাহাজানি চলতেই লাগল।

এর মধ্যে হাজারে হাজারে তরুণ আফগান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ফিরে গিয়েছিল পাকিস্তানি মাদ্রাসাগুলোতে, তাদের উদ্দেশ্য অসমাপ্ত শিক্ষা শেষ করা। মাদ্রাসা-গুলোতে অর্ধশিক্ষিত ইমামরা তাদের শুধুমাত্র কোরানের 'তরবারি স্তোত্র' পড়াতে লাগল। এই স্তোত্রগুলি আক্রমণাত্মক বিষয়বস্তুতে ভরা। ইমামরা সেগুলিরও অর্থের হেরফের ঘটিয়ে বিকৃত করে এমনভাবে এইসব আফগানদের মাথায় ঢুকিয়ে দিল যে তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। দেখা গেল এদের জীবন সম্পর্কে, বিপরীত লিঙ্গ অর্থাৎ নারী সম্পর্কে, আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এরা শুধু মানে না বুঝে কোরান মুখস্থ বলতে শিখল আর নিষ্ঠুর ও অমানবিক ওয়াহাবি মত অনুসরণ করে বিশ্বাস করতে শিখল যে মুসলমানদের পক্ষে নাচগান খেলাধুলো ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে অংশ নেওয়া গর্হিত অপরাধ, মহাপাপ!

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে ইজমৎ খান তার এক খুড়তুতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে একটা বিশেষ কাজে জালালাবাদ গেল। যাওয়ার পথে একটা গ্রাম পড়ল, যে গ্রামের লোকেরা হেকমতিয়ারকে তার অর্থের চাহিদা মেটাতে অস্বীকার করেছিল। ইজমৎ সেখানে পৌঁছে দেখল হেকমতিয়ার তার বাহিনী নিয়ে পুরো গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং নারী পুরুষ নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করেছে। এই বীভৎস হত্যালীলা দেখে ইজমৎ খানের মনে এক বিষম বিতৃষ্ণা তৈরি হ'ল। জালালাবাদ পৌঁছে সে জানতে পারল যে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এরা কেমন মুসলমান, যারা স্বজাতীয় নির্দোষ লোকেদের এভাবে খুন করে? ইজমতের মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করল।

এই সময়েই দক্ষিণ আফগানিস্তানে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার প্রভাবে গোটা দেশের চেহারা বদলে গেল। কেন্দ্রে কোনো সরকার না থাকায় সরকারি আফগান

BanglaBook.org

সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতীয় সর্দারদের অধীনে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কান্দাহারের কাছে এই রকম একটা ঘাঁটি থেকে কয়েকজন সৈনিক দুটি অল্প বয়সী মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে মেরে ফেলল।

মেয়ে দুটি যে গ্রামের বাসিন্দা ছিল, সেই গ্রামের প্রধান পুরোহিত সেখানে একটা ইসলামি মাদ্রাসা চালাতো। সে তার তিরিশ জন ছাত্রকে নিয়ে সেনাঘাঁটিটা আক্রমণ করল। তাদের অস্ত্র বলতে ছিল ষোলোটা রাইফেল। অসম সাহসের সঙ্গে লড়াই করে তারা প্রায় সব ক'জন সৈনিককে হত্যা করে ঘাঁটি দখল করল এবং ঘাঁটির প্রধান অফিসারকে একটা মিলিটারি ট্যাঙ্কের কামানের নলে বেঁধে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। এই পুরোহিতটির নাম মহম্মদ ওমর, অথবা মোল্লা ওমর। যুদ্ধে রাশিয়ান বন্দুকের গুলি লেগে তার একটা চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মোল্লা ওমরের এই দুঃসাহসিক অভিযান ও প্রতিশোধ নেওয়ার খবর দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। চতুর্দিক থেকে অসহায় লোকজন মোল্লার কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন করা শুরু করল। মোল্লা ওমর ও তার ছাত্রেরা সে সব আবেদনে সাড়া দেওয়া শুরু করল। তারা গিয়ে শুধু অত্যাচারী শত্রুর মোকাবিলা করতে লাগল—তারা কোনো লুটপাট করতো না; কোনো মেয়েকে ধর্ষণ করা দূরে থাক, তাদের দিকে তাকাতো না; তারা কোনোরকম পুরস্কার বা টাকাও চাইত না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা বীর হিসেবে পূজিত হতে লাগল। ১৯৯৪ সালের শেষে বারো হাজার আফগান তরুণ তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

এই তরুণরা নিজেদের বলতো 'তালিব'। পুশতু ভাষায় 'তালিব' শব্দের মানে ছাত্র—'তালিবান' মানে ছাত্রদল। শুরুতে তারা ছিল গ্রামরক্ষী। শীঘ্রই তাদের আন্দোলন সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারা মোল্লা ওমরের অনুকরণে কালো জোকা ও মাথায় কালো পাগড়ি পরা শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই তারা কান্দাহার দখল করে সেখানে এক স্বতন্ত্র তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা করল। পাকিস্তান তার গুপ্তচর সংস্থা আই.এস. আই.-এর মাধ্যমে যথারীতি এতদিন ধরে রব্বানি সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এবার সুযোগ বুঝে নতুন তালিবান সরকারকে ঝটিতি কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের যাবতীয় মদত দেওয়াও শুরু হয়ে গেল তাদের তরফে। কান্দাহার দখল করে তালিবানদের দখলে এসে গেল বিশাল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র—রাইফেল, পিস্তল থেকে শুরু করে সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক, ট্রাক এমনকি ছ'টা মিগ ফাইটার প্লেন এবং ছ'টা রাশিয়ান সামরিক হেলিকপ্টার। এইবার উত্তরের দিকে তালিবান বাহিনীর সামরিক অভিযান আরম্ভ হল।

১৯৯৫ সালে ইজমৎ খান তার বউ-বাচ্চা ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে তালিবানদের সঙ্গে যোগ দিল। তার বয়স তখন তেইশ। কিছুদিনের মধ্যেই সে টের পেল যে তালিবানের কাজকর্মের একটা সাঙ্ঘাতিক, অন্ধকার দিক আছে। সব পাশতুনদের মতোই ইজমৎ খানও ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিল। কিন্তু তালিবান বাহিনী তাদের দখল করা অঞ্চলগুলিতে যে কঠোর, মধ্যযুগীয় শাসন চালু করল, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে তা তুলনাবিহীন।

প্রথমেই মেয়েদের সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। সমস্ত বয়সের মেয়েদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল যে তারা কেউ কখনো যেন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোয়। সেই সঙ্গীটিও যদি স্বামী, অথবা রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় না হয়, তাহলে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে। এছাড়া সব সময় বোরখা পরা বাধ্যতামূলক করা হ'ল। এমনকি মেয়েদের পায়ে চটি বা অন্য ধরনের জুতো পরাও নিষিদ্ধ করা হ'ল; কারণ হিসেবে বলা হ'ল যে রাস্তা বা মেঝের ওপর মেয়েদের জুতোর ক্লিক-ক্ল্যাক আওয়াজ নাকি যৌনগন্ধী!

সমস্ত রকম নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র এবং যে কোনোরকম সঙ্গীত শোনাও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এককথায় যে কোনোরকম প্রমোদ, এমনকি ঘুড়ি ওড়ানো ও খেলাধুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়া বাধ্যতামূলক করা হ'ল। প্রতিটি পুরুষের দাড়ি রাখা আবশ্যিক বলে আইন জারি করা হ'ল। মাথায় কালো পাগড়ি ও কালো জোব্বা পরিহিত তরুণ তালিবদের দল দিনরাত মহল্লা থেকে মহল্লায়ে টহল দিতে লাগল। কাউকে কোনোরকম সন্দেহ হলেই সে বেচারার কপালে জুটতে লাগল নির্মম অত্যাচার নয়তো মৃত্যু। এই তরুণ অন্ধবিশ্বাসী জঙ্গিরা আবির্ভূত হয়েছিল সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার রক্ষকরূপে। কিন্তু ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমে হয়ে দাঁড়াল নিষ্ঠুর অত্যাচারী। কিন্তু তাদের অগ্রগতি কিছুতেই থামানো গেল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্বেচ্ছাচারী উপজাতীয় সর্দারদের খতম করে মধ্যযুগীয় ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তাদের এই নির্মম কঠোরতা সাধারণ মানুষ মেনে নিল। কারণ তারা কিছুটা নিরাপত্তা পেল—অন্তত আইন-শৃঙ্খলার একটা শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ ও দুর্নীতি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার বদলে এলো অন্ধ, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি।

যোদ্ধা পুরোহিত মোল্লা ওমর শাসনকার্যের কিছুই বুঝতো না। সুতরাং সে রয়ে গেল কান্দাহারে, কিন্তু তার তালিবদের সংখ্যা বাড়তেই লাগল। এই সব অন্ধ, মধ্যযুগীয় জঙ্গির দল একচোখ কানা মোল্লাকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করতো। দূরে আফ্রিকার সুদানে বসে দীর্ঘকায় সৌদি আরবীয় লোকটি নিঃশব্দে সব কিছুর ওপর লক্ষ্য রাখতে লাগল। আফগানিস্তানের মধ্যে তার নির্দেশাধীন বিশ হাজার আরব গুপ্ত সংস্থা 'আল কায়দা'র ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো বিভিন্ন জায়গায় চালু করা শুরু করে দিল।

তালিবান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মধ্যযুগীয় খলিফাদের সেনাবাহিনীর অনেক সাদৃশ্য ছিল। এদের কোনো জেনারেল, অফিসার ইত্যাদি পদাধিকারী কেউ ছিল না। পুরো বাহিনীটা আধুনিক আর্মির মতো ডিভিশন, ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানিতে বিভক্তও ছিল না। তার বদলে ছিল ছোট বড় নানা মাপের 'লশ্‌কর'—প্রতিটি লশ্‌কর একজন সর্দারের অধীন। অন্ধ বিশ্বাসী এই তালিবরা প্রাণের পরোয়া না করে লড়াই করতো—আল্লাহতালার যুদ্ধ, জিততেই হবে; কোনো ডাক্তার নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, আহতদের রাস্তায় ফেলে রেখেই বাকিরা প্রমত্ত, উন্মাদ, হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়তো শত্রুর ওপর। কিছুদিনের মধ্যেই রটে গেল যে তালিবান বাহিনী অপরাজেয়, এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব। অনেক জায়গায় বিরোধীপক্ষ ভয়ের চোটে কোনো লড়াই না

BanglaBook.org

করেই আত্মসমর্পণ করতে লাগল। কিন্তু শাহ্ মাসুদের সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পরে তালিবানরা এই প্রথম পিছু হটতে বাধ্য হ'ল। কয়েক হাজার তালিব এই যুদ্ধে নিহত হ'ল। পরাজিত তালিবদের কাবুল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল মাসুদের বাহিনী।

তালিবান সন্ধির যে শর্ত দিল, তা মনোমত না হওয়ায় মাসুদ তার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ফিরে গেল উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে। সেখানে সে অবিসংবাদী নেতা, বছরের পর বছর আক্রমণ চালিয়েও সোভিয়েত বাহিনী তাকে সেখান থেকে উৎখাত করতে পারেনি। তালিবানরা ছাড়ার পাত্র নয়। কিছুদিন অপেক্ষা করে তারা ফের পাঞ্জশিরে আক্রমণ চালালো। শুরু হ'ল আফগান গৃহযুদ্ধ—একদিকে তালিবান, অন্যদিকে তাজিক নেতা শাহ মাসুদ ও উজবেক নেতা দোস্তামের যৌথ সেনাবাহিনী। সাল ১৯৯৬। পৃথিবীতে কেবল দু'টি দেশ কাবুলের উদ্ভট তালিবান সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিল। একটি দেশ পাকিস্তান, কারণ পাকিস্তানি মৌলবাদী নেতৃবৃন্দ ও গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই-এর মদতেই তালিবানী সরকার আধুনিক যুদ্ধের কায়দা কানুন শিখে কিছুটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠলো। অন্য দেশটি সৌদি আরব, কারণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অর্থ সাহায্য তালিবানদের কাছে আসতে লাগল সৌদি আরব থেকে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলকে তালিবানী শাসনের আওতায় আনায় এই দুই দেশেরই প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল।

ইজমৎ খান ইতিপূর্বেই তার নিজস্ব লস্করের যোদ্ধাদের নিয়ে তালিবান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তার এক সময়ে মিত্র শাহ মাসুদ এখন তার শত্রু। কারণ সে মোল্লা ওমরের মতবাদে বিশ্বাসী। কিছুদিনের মধ্যেই অসম সাহসী রণকুশলী নেতা হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাহকে হত্যা করে তালিবরা তার মৃতদেহ টাঙিয়ে দিল কাবুলের বড় রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে। ইজমৎ-এর কোনদিনই অযথা নিষ্ঠুরতায় সায় ছিল না। তালিবান সেনাবাহিনীতে সে তখন অন্যতম প্রধান সেনাপতি। এইবার সে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তালিবান সরকার তাকে তার নিজের প্রদেশ নাঙ্গারহর-এর প্রধান শাসনকর্তা করে জালালাবাদ পাঠিয়ে দিল। তার গ্রাম মালোকো-জাই সেখান থেকে কাছেই; সে দরকার হলে তার বউ-বাচ্চা ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সহজেই দেখা করতে পারবে।

ইজমৎ খান কখনো নাইরোবি বা দার-এস-সালামের নাম শোনেনি। বিল ক্লিন্টন নামে এক রাজনীতিবিদের নামও ছিল তার অজানা। হ্যাঁ, আল-কায়দা নামে একটা সংস্থার কথা সে শুনেছিল বটে। আট বছর আগে জাজি'র হাসপাতালে যে মোটাসোটা ডাক্তার তার উরু থেকে একটা সোভিয়েত রাশিয়ান গোলার টুকরো কেটে বার করেছিল, আর যে দীর্ঘদেহী সৌদি আরবীয় লোকটি তার সঙ্গে কথা বলেছিল, তারা দু'জনই আল-কায়দার সর্বাধিনায়ক, এমন একটা কথাও তার কানে এসেছিল। ওই দু'জন এখন আফগানিস্তানে। মোল্লা ওমর ও তালিবান বাহিনীকে তারা প্রচুর অর্থ আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, ফলে মোল্লা ওমর এখন তাদের বিশ্বস্ত সমর্থক। ইজমৎ জানতো যে

BanglaBook.org

আল-কায়দা ও তার সদস্যরা সমস্ত বিধর্মী পশ্চিমী দেশ, বিশেষ করে 'আমেরিকা' নামে একটা দেশের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া জিহাদ ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইজমৎ কোনোদিন এই জিহাদে অংশ নেওয়ার কথা চিন্তাও করেনি। এই জিহাদ তার জিহাদ নয়। সে যোদ্ধা, তার যুদ্ধ উত্তরের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, কারণ সে চায় তার দেশ আফগানিস্তান সব বিভেদ মুছে দিয়ে এক হোক। প্রধানত তার নিপুণ সেনা-পরিচালনার ফলেই শাহ মাসুদ পিছিয়ে গিয়ে পাঞ্জশির উপত্যকা ও বাদকশানের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এখন কিছুদিনের জন্য সে রণাঙ্গনের রক্তক্ষয়ী হানাহানি থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছিল। তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

কিন্তু ১৯৯৮ সালের ৭ই আগস্ট নাইরোবি ও দার-এস-সালামের আমেরিকান দূতাবাস দু'টি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল, হতাহত হ'ল বহু নির্দোষ, নিরীহ মানুষ। আল-কায়দা এই জোড়া বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে তাদের পৃথিবীব্যাপী জিহাদের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করল। ইজমৎ খান এই সাংঘাতিক খবরটাও জানতে পারল না। তালিবান সরকারের কড়া নির্দেশ ছিল—রেডিও শোনা বা টেলিভিশন দেখা নিষিদ্ধ। সে এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। ২০শে আগস্ট আমেরিকার তরফ থেকে আল-কায়দার সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রত্যুত্তর এলো। লোহিত সাগরে এবং পাকিস্তানের দক্ষিণে আরব উপসাগরে ভাসমান ছ'টি রণতরী ও একটি ডুবোজাহাজ থেকে আফগানিস্তানে অবস্থিত আল-কায়দার জঙ্গি ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো লক্ষ্য করে পর পর সত্তরটা টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র শূন্যপথে ছুটে গেল। বেশ কয়েকটা ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্য ছিল তোরাবোরা পর্বতশ্রেণীর অনেকগুলো গুহা ও গিরিকন্দর, যেগুলোতে আল-কায়দার আরববাহিনী ঘাঁটি গেড়েছিল।

বলা বাহুল্য, অন্ততঃ দশটা ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। এগুলোর মধ্যে একটা মালোকো-জাই গ্রামের পাশের পাহাড়ে অনেক উঁচুতে একটা খালি, প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়ে ফাটলো। গুহার গভীরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পর্বতশিরার একটা বিস্তৃত অংশ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। মালোকো-জাইয়ের ঠিক ওপরের পর্বত প্রাচীর টুকরো টুকরো হয়ে কয়েক লক্ষ টন পাথরের চাঁই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আছড়ে পড়ল নীচের উপত্যকায়।

ইজমৎ খান পৌঁছে দেখল পুরো উপত্যকাটার কবর হয়ে গেছে। চতুর্দিকে শুধু অজস্র পাথরের চাঁই। সম্পূর্ণ মালোকো-জাই, তার কৃষি জমি, পশু খামার, আখরোট বাগান, মসজিদ, আস্তাবল, এমনকি ছোট নদীটা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার বাবা-মা-বউ-বাচ্চা-কাকা-পিসি-বোন-প্রতিবেশী—সকলেই চাপা পড়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টন পাথরের নীচে। পুরো উপত্যকাটা একটা পাথুরে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। একমাত্র সে জীবিত—তার কোনো পরিবার নেই, আত্মীয় নেই, সংসার নেই—একজন নিঃসঙ্গ, শিকড়হীন মানুষ।

পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া সূর্যের দিকে মুখ করে সে পাথরের স্তূপের ওপর বসে প্রার্থনা করলো। এক স্বতন্ত্র প্রার্থনা—প্রতিহিংসার শপথ—যারা এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধের শপথ করল ইজমৎ খান। ....এর এক

BanglaBook.org

সপ্তাহ পরে সে নাঙ্গরহরের শাসকের পদে ইস্তফা দিয়ে রণাঙ্গনে ফিরে গেল। তার অনুপস্থিতিতে অনভিজ্ঞ তালিবান বাহিনীর ওপর প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে শাহ মাসুদ তার হারানো জায়গা ইতিমধ্যে পুনর্দখল করে নিয়েছিল। ইজমৎ খান এরপরে তিন বছর ধরে তার অধীন বাহিনীসহ এক হিংস্র যুদ্ধ চালিয়ে গেল উত্তরের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে। আমেরিকা এবং আমেরিকার বন্ধুরা সবাই তার শত্রু।

১৯৯৮ সালে মাইক মার্টিন বসনিয়া থেকে ফিরে এলো ইংল্যাণ্ডে। ভূতপূর্ব যুগোস্লাভিয়া এর কিছুদিন আগেই তিন টুকরো হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল তিনটি আলাদা রাষ্ট্র—বসনিয়া, সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া। মুসলিম অধ্যুষিত বসনিয়াতে এরপর থেকেই শুরু হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এত সাংঘাতিক রক্তাক্ত যুদ্ধ ইউরোপে আর হয়নি। ১৯৯৭ সালে এস.এ.এস-এর সঙ্গে মাইক গুপ্ত অভিযান চালিয়ে লুকিয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বার করেছিল।

১৯৯৮ সালে সে উন্নীত হ'ল লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে, দায়িত্ব হ'ল কম্যাণ্ডিং অফিসার অফ ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন ঃ প্যারাট্রুপারস রেজিমেন্ট—চলতি ভাষায় ওয়ান প্যারা। এই সময়েই জাতি বিশুদ্ধিকরণের নামে বসনিয়ার অন্তর্গত কসোভো প্রদেশের মুসলিমদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া শুরু করল রাষ্ট্রপতি ইভান মিলোসেভিচ। 'ন্যাটো'-র তরফ থেকে বহুবার নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন মিলোসেভিচ এই বহিষ্কার এবং গণহত্যা বন্ধ করতে অস্বীকার করল, তখন ন্যাটো শুরু করল বিমান থেকে বোমা বর্ষণ। টানা আটাত্তর দিন ধরে এই বিমান হানায় কসোভো প্রদেশ এবং সার্বিয়ার বিরাট অংশ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। অবশেষে মিলোসেভিচ একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পরে ন্যাটো কসোভোতে তার বাহিনী পাঠাল—উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ধ্বংস স্তূপ থেকে নতুন কসোভো গড়ে তোলা। পুরো কাজের সর্বাধিনায়ক হলেন প্যারা রেজিমেন্টের ভূতপূর্ব সর্বাধিনায়ক জেনারেল মাইকেল জ্যাকসন। তাঁর সঙ্গে গেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইক মার্টিন ও তার অধীন ওয়ান প্যারা।

কসোভোতে শান্তি ফিরল বটে, কিন্তু ২০০০ সালে আফ্রিকার এক ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওনে ফের জ্বলে উঠল হিংসার আগুন। এর কিছুকাল আগে থেকেই উপজাতীয় গৃহযুদ্ধে পুরো দেশটা জুড়ে চরম অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত, চারপাশে শুধু পোড়া ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, নোংরা, মড়ক আর রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা মৃতদেহ।

রাষ্ট্রসংঘের তরফে একটি পনেরো হাজার সৈন্যের শান্তিস্থাপক বাহিনী অনেকদিন ধরেই হাজির ছিল। কিন্তু তারা রাজধানী ফ্রিটাউনের চৌহদ্দির বাইরে বিশেষ পা বাড়ানো না। শহরের চারপাশের ঘন জঙ্গল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। হিংস্র জন্তু তো ছিলই, তার চাইতেও বিপজ্জনক ছিল শৃঙ্খলাহীন, উন্মত্ত উপজাতীয় গেরিলারা। বিশেষ করে 'পশ্চিমা তরুণ গোষ্ঠী' নামে একটা বিদ্রোহী দল সিয়েরা লিওন সরকারের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এরা সমানেই আশপাশের গ্রামে হামলা চালাতো এবং নিরীহ চাষীদের

BanglaBook.org

ওপর নির্মম শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে তাদের পরিবারের থেকে টাকা আদায় করতো। চারশো জনের এই দলটার হাতে প্রচুর আধুনিক অস্ত্র ছিল।

কসোভো থেকে মাইক মার্টিনকে পাঠানো হয়েছিল তার ওয়ান প্যারাবাহিনী সহ কিছুকাল ফ্রিটাউনে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ করার জন্য। এই বাহিনীর পনেরো জন সৈন্যকে অপহরণ করল 'পশ্চিমা তরুণ গোষ্ঠী'। ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাদের ঘাঁটি ছিল গবেরিবানা ও মাগবেনি নামে দুটো গ্রামে। সেখান থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা মোটা মুক্তিপণ দাবি করল। বিস্তর দর কষাকষির পরে ন'জন সৈনিককে মাইক তাদের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারল, কিন্তু বাকি ছ'জনকে তথাকথিত এই বিদ্রোহী বাহিনী ছাড়তে অস্বীকার করল। শুধু তাই নয়, গুপ্তচরের মাধ্যমে মাইক খবর পেল যে তাদের ওপর প্রচণ্ড শারীরিক অত্যাচার চলছে। অবশেষে লণ্ডন থেকে নির্দেশ এলো ঃ জঙ্গলে অভিযান চালাও, মুক্ত করে আনো ওই ছ'জন ইংরেজ সৈন্যকে।

বাছা একশো জন সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মাইক মার্টিন নিজেই আক্রমণ চালালো। প্রচণ্ড হাতাহাতি সংঘর্ষের পরে ছ'জন সৈনিককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গেল। ফিরে আসবার সময় 'পশ্চিমা তরুণ গোষ্ঠী' পেছন থেকে ফের আক্রমণ করল রাইফেল ও গ্রেনেডসহ। এইবার প্যারাবাহিনী আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে সরাসরি প্রতি-আক্রমণ চালালো। তুমুল সংঘর্ষের পরে তারা অত্যাচারী, মাতাল, মাদক সেবনকারী উচ্ছৃঙ্খল দলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল কয়েক মাইল। তিনদিনব্যাপী যুদ্ধের শেষে দেখা গেল তথাকথিত বিদ্রোহী বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর কিছুদিন পর থেকেই ফ্রিটাউনে সত্যিকারের শান্তি ফিরে আসতে শুরু করল।

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তালিবান সৈন্যদের মুহুর্মুহু আল্লাহো আকবর চিৎকার শুনে বামিয়ানের ক্যাম্পে ইজমৎ খানের ঘুম ভাঙল। সে বাইরে এসে দেখল চতুর্দিকে তালিব সৈনিকরা আনন্দে চেঁচাচ্ছে আর শূন্যে গুলি ছুঁড়ছে। আগের রাতে শাহ মাসুদ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছে! সেই সুদক্ষ গেরিলা কম্যাণ্ডার, যাকে সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তিশালী বাহিনীও হারাতে পারেনি, দু'জন আত্মঘাতী মূর জঙ্গি টিভি সাংবাদিকের পরিচয়ে পঞ্জশিরের ঘাঁটিতে ঢুকে নিজেদের শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে নিজেদের সঙ্গে তাকে হত্যা করেছে। বলা বাহুল্য, এই দুই জঙ্গিকে পাঠিয়েছিল স্বয়ং ওসামা-বিন-লাদেন। পরিকল্পনাটা ছিল তার চতুর মিশরীয় সহযোগী আয়মান আল-জাওয়াহিরির। আসলে মোল্লা ওমরকে তুষ্ট করার জন্যেই মাসুদকে এভাবে সরানো হ'ল। ওসামা ও আল-জাওয়াহিরি ছক কষে কাজটা করেছিল—এত বড় উপকারটা পাওয়ার পরে একচোখো মোল্লা আর কিছুতেই আল-কায়দাকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কৃত করবে না, একথা তারা জানতো। লুকিয়ে সন্ত্রাসবাদী কাজ চালানোর পক্ষে মধ্যযুগীয় আফগানিস্তান তাদের পক্ষে নিরাপদ।

এর ঠিক দু'দিন পরে, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১, আমেরিকায় একসঙ্গে চারটে যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই হয়ে গেল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে দুটো বিমান পর পর নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি সুউচ্চ বাড়িতে সোজা ধাক্কা মেরে দুটি

BanglaBook.org

অট্টালিকাকেই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ভূমিসাৎ করে দিল। তৃতীয় বিমানটা আছড়ে পড়ে ধ্বংস করলো পেন্টাগনের একাংশ। চতুর্থটা একটা মাঠে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল, কারণ তার কিছু নির্ভীক যাত্রী ছিনতাইকারীদের মেরে বিমানের ককপিট থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই উনিশ জন আত্মঘাতী ছিনতাইকারী জঙ্গির নাম ধাম সব খুঁজে বার করল মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর। রাষ্ট্রপতির তরফে মোল্লা ওমরকে চরমপত্র পাঠানো হ'ল ঃ আল-কায়দার দুই অধিনাককে আমাদের হাতে তুলে দাও, না হলে আমরা অন্য ব্যবস্থা নেবো। কিন্তু মাসুদকে সরিয়ে দিয়ে আল-কায়দা তালিবানের রাস্তা নিষ্কন্টক করে দিয়েছে। সারা আফগানিস্তান এখন তালিবান সরকারের আয়ত্তে। এত বড় উপকারের পর মোল্লা ওমরের পক্ষে অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। উপকারী বন্ধুকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, তা-ই মুসলমানের ধর্ম!

মাইক মার্টিন সিয়েরা লিওন থেকে ছুটি পাওয়ার পর অলডারশটে প্যারা রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে একটি সুসজ্জিত কেবিন তার জন্য নির্দিষ্ট হ'ল, স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করার জন্য। ধরেই নেওয়া হ'ল যে তাকে আর প্রত্যক্ষ অ্যাকশনে যেতে হবে না। ঠিক এক বছর সাদামাটা ফাইল নাড়াচাড়ার কাজ করার পরে বাড়িতে বসে প্রাতঃরাশ করার সময়ে সে স্তম্ভিত হয়ে টেলিভিশনে নিউইয়র্কের জোড়া মিনার ধ্বংস হতে দেখল। এক সপ্তাহ বাদেই সারা দুনিয়ার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে কাবুল সরকার অনুমতি দিক বা না দিক, এই সাংঘাতিক ধ্বংসকাণ্ডের জন্যে যারা দায়ী, তাদের ধরার জন্যে মার্কিন সামরিকবাহিনী অতি অবশ্যই কিছুদিনের মধ্যে আফগানিস্তানে আক্রমণাত্মক অভিযান করতে চলেছে।

ইসলামাবাদের ব্রিটিশ দূতাবাস ও এস.আই.এস. প্রধানের কাছ থেকে এর পরেই আফগানিস্তান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কাউকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ এলো। তাদের প্রথম পছন্দ মাইক মার্টিনকে স্পেশাল ফোর্সের সংযোগরক্ষাকারী অফিসার হিসেবে পাঠানো হ'ল ১১ই অক্টোবর, যেদিন ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রথমেই শুরু হ'ল বিমান থেকে কাবুলের ওপর বোমাবর্ষণ। ইজমৎ খান তখনো উত্তরে বাদকশানে তার তালিবান সৈন্যবাহিনী নিয়ে জোটবাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। মাসুদ খুন হওয়ার পর তার জায়গা নিয়েছিল জেনারেল ফাহিম। আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স ফাহিমের হাত শক্ত করার জন্য দু'তিন দিনের মধ্যেই বাদকশান পৌঁছে গেল। আসল লড়াইটা ছিল এখানেই। উত্তর পাহাড় ও তার গুহা- কন্দরগুলির মধ্যেই ঘাঁটি গেড়েছিল আল-কায়দার আরব জঙ্গির দল। এবং তাদের মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল স্বয়ং ওসামা-বিন-লাদেন এবং আয়মান আল-জাওয়াহিরি। এদের এবং মধ্যযুগীয় হিংস্র তালিবান বাহিনীকে নির্মূল করে ফেলার উপায় উত্তরের জোট শক্তির পদাতিক বাহিনী ও আমেরিকান বিমান বাহিনীর যৌথ আক্রমণ।

জেনারেল ফাহিমের তাজিক সেনাবাহিনী লড়াই চালাচ্ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। এবার মাসুদের সহযোগী উজবেক নেতা রশিদ দোস্তাম মার্কিন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ শুরু করল। নভেম্বর মাসের গোড়া থেকে আরম্ভ হ'ল মার্কিন বিমান হানা। রাতের অন্ধকারেও ইনফ্রা-রেড বা অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে আমেরিকান বোমারু বিমান খুঁজে খুঁজে তালিবান বাহিনীর কামান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদের ডিপো, শস্য ও খাবার-দাবারের গুদাম, বাঙ্কার, ট্রাকের কনভয় সব কিছু বার করে বিধ্বংসী বোমা বৃষ্টি করে একের পর এক উড়িয়ে দিতে লাগল। আফগানিস্তানের ক্ষুদ্র বিমানবহরের প্লেনগুলো জমি ছেড়ে ওড়ারও সুযোগ পেল না, তার আগেই মার্কিন বোমার ঘায়ে সেগুলো সব গুঁড়িয়ে গেল। মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণ ও উড়ন্ত রকেটের নির্ভুল নিশানার মুখে তালিবান সেনাবাহিনী উড়ে গেল। ফাহিম ও দোস্তামের তাজিক-উজবেক বাহিনীর জয়যাত্রা চলতেই লাগল। উত্তরের যুদ্ধ শুরুর সময় তালিবান বাহিনীতে তিরিশ হাজার সৈনিক ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল গড়ে প্রতিদিন এক হাজার তালিবান নিহত হচ্ছে। তাদের কোনো ডাক্তার, ওষুধ, এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল না। মূর্খ, অজ্ঞ এইসব তরুণ যোদ্ধার দল শুধু 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি তুলে রাইফেল ও মেশিনগানের বুলেটের দেওয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আর মরছিল।

ইজমৎ খান তার বাহিনী নিয়ে ক্রমাগত পিছু হটছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল তালিবান আন্দোলনের শুরুতে যে রণোন্মাদ জঙ্গিরা ছিল, তারা প্রায় সকলেই খতম হয়ে গেছে। ওয়াহাবি মৌলানারা ঘুরে ঘুরে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে হাজার হাজার নতুন ছেলেদের তালিবান গোষ্ঠীতে সামিল করছিল বটে, কিন্তু এই শিক্ষানবিশ রঙরুটদের অধিকাংশই যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিকে যে ধরনের তালিবরা

BanglaBook.org

মেশিনগান চালিয়ে ধ্বংস করেছিল, সেই রকম উন্মত্ত জঙ্গি তরুণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছিল।

পশ্চাদপসরণ করতে করতে ১৮ই নভেম্বর ইজমৎ তার বাহিনী নিয়ে কুন্দুজ শহরে এসে পৌঁছল। ভাগ্যক্রমে তাজিক ও হাজারা উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে একমাত্র কুন্দুজেই পাশতুনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইজমৎ এই ছোট্ট শহরেই তার বাহিনীসহ আত্মসমর্পণ করা মনস্থ করলো। সেই দিনই উত্তরের পুরো তালিবান সৈন্যবাহিনী ফাহিমের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। মার্কিন উপদেষ্টাদের কথা না শুনে ফাহিম তাদের আত্মসমর্পণ মঞ্জুর করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী করলো।

তালিবান সৈনিকরা সকলেই কিন্তু পাশতুন ছিল না। ওসামা-বিন-লাদেন আড়াই হাজার আরব জঙ্গিকে ঢুকিয়েছিল এই সেনাদলে। আত্মসমর্পণের সময় তাদের মধ্যে ছ'শো জন তখনো জীবিত। আমেরিকান সৈন্যাধ্যক্ষের ইচ্ছে ছিল এগুলোকেও আল্লার দরবারে পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু ফাহিমের জন্য তা সম্ভব হ'ল না। ফাহিমের এই তথাকথিত মহানুভবতা আমেরিকানদের মোটেই পছন্দ হ'ল না।

আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের গুনতি করার সময় দেখা গেল তাদের মধ্যে হাজার দুয়েক পাকিস্তানি রয়েছে। একথা জানতে পেরে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল মুশারফ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে এর আগেই মৌলবাদী অধ্যুষিত পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই-এর মাধ্যমে তালিবদের সাহায্য করে আমেরিকার রোষের সম্মুখীন হওয়ার চাইতে আমেরিকাকে পুরোদস্তুর সমর্থন করাই শ্রেয় বলে ঠিক করে নিয়েছিল। এখন যদি দেখা যায় যে তার দেশের এতগুলো নাগরিক স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা হিসেবে তালিবানের হয়ে লড়ছিল, তাহলে সে চরম অসুবিধায় পড়ে যাবে। সুতরাং গোপনে মার্কিন হেলিকপ্টারে করে এই পাকিস্তানিদের সীমান্ত পার করে তাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। খবরটা আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর কাছে সযত্নে গোপন রাখা হ'ল।

ফাহিম এরপরে আরো চার হাজার সৈনিককে গোপনে আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে নগদ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। রাশিয়ানরা কিনলো মূলত চেচেন ও উজবেক সৈনিকদের, কারণ এদের মধ্যে অনেকেই মস্কোকে নানা সময়ে নানা অসুবিধায় ফেলেছিল। বাকিরা গেল আমেরিকানদের খপ্পরে। কিছুদিন পরে ফাহিম ঘোষণা করল যে মোট আট হাজার তালিবান সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই আসল যুদ্ধের খবর ও ছবি সংগ্রহের জন্য দলে দলে কুন্দুজে আসতে শুরু করে দিয়েছিল।

এই সময়ে উজবেক সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রশিদ দোস্তামের দাবি মেটাতে ফাহিম আরো পাঁচ হাজার সৈন্যকে উজবেক বাহিনীর হাতে সমর্পণ করল। দোস্তাম তাদের নিয়ে গেল পশ্চিমে শেবেরখানে, তার নিজের এলাকায়। প্রথমে দু' হাজার জনকে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল বড় বড় ট্রাকের ওপর লাগানো ইস্পাতের তৈরি আধারের মধ্যে। সাধারণত এই আধারগুলোতে যন্ত্রপাতি ভরে পাঠানো হয়। লোকগুলিকে এমন গাদাগাদি করে ঢোকানো হ'ল যে তাদের কারুর বসার জায়গাটুকু পর্যন্ত রইল না।

BanglaBook.org

কিছুদূর যাওয়ার পরেই অক্সিজেনের অভাবে দম আটকে একে একে সংজ্ঞা হারাতে লাগল বন্দীরা। ট্রাকগুলো থামিয়ে দোস্তামের অফিসাররা তাদের অধস্তন সৈনিকদের হুকুম করল আধারগুলোর গায়ে হাওয়া চলাচলের জন্য কিছু ছেঁদা করে দিতে। হাতুড়ি বাটালি দিয়ে পুরু ইস্পাতের চাদরে গর্ত করার মতো ধৈর্য উজবেক সৈনিকদের ছিল না। তারা মেশিনগান উঁচিয়ে গুলি চালাতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিটি আধারের গায়ে অজস্র ছিদ্র হয়ে গেল। ভেতরে ঠাসা লোকগুলোর আর্তনাদও অবশ্য ততক্ষণে থেমে গিয়েছে।

বাকি তিন হাজার জনের মধ্যে থেকে আরবদের বেছে আলাদা করে নেওয়া হ'ল। মুসলিম দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকেই এই আরবরা এসেছিল—সৌদি আরব, জর্ডন, ইয়েমেন, মরক্কো, আলজিরিয়া, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া....এই ছ'শো জন আরবকে বাদ দিয়ে যে দু' হাজার চারশো তালিবান বন্দী বাকি রইল, তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, এমনকি কবর পর্যন্ত নয়। ট্রাকের ইস্পাত আধারের মধ্যে যারা মরেছিল, তাদের ট্রাকশুদ্ধ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জনশ্রুতি শোনা যায়।

ইজমৎ খানকে যখন দোস্তামের সৈনিকরা পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, তখন সে আরবীতে উত্তর দিয়েছিল। ফলে তাকেও আরবদের দলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে টিভি ক্যামেরা সহ সংবাদ সংস্থার রিপোর্টাররা হাজির হয়ে গেছে, রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিরাও শীঘ্র পৌঁছে গেল। ফলে দোস্তামকে কথা দিতেই হ'ল যে এই আরব বন্দীদের মাজার-ই-শরিফ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হবে। খুঁজে পেতে ট্রাক সংগ্রহ করে এই বন্দীদের রওনা করে দেওয়া হ'ল, কিন্তু মাজার-ই-শরিফ ছাড়িয়ে আরো দশ মাইল দূরে 'কালা-ই-জঙ্গি' নামে একটা বিশাল দুর্গের কারাগারে তাদের বন্দী করে রাখা হ'ল। আফগানরা এই দুর্গটাকে নরকের দ্বার বলে অভিহিত করে।

এই বন্দীরা সবাই জাতে আরব ছিল না। কিছু চেচেন গেরিলা এবং বিদ্রোহী উজবেক নজর এড়িয়ে আরবদের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। এছাড়া ছিল কিছু পাকিস্তানি যারা বোকার মতো পাকিস্তানে ফেরত যায়নি। অথচ পাকিস্তানে গেলে তাদের মুক্তি দেওয়া হ'ত। আফগান ছিল মাত্র ছ'জন—তাদের একজন ইজমৎ খান।

মাইক মার্টিনের কাজ ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং লক্ষ্য রাখা যেন সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে তালিবানদের হাতে কোনরকম সাহায্য না যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অ্যাকশনের মধ্যে ঢুকতে না পেরে সে ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। শেষে অনেক চেষ্টা করে সে আমেরিকান সামরিক অফিসারের সঙ্গে জীপে চড়ে ভূতপূর্ব সোভিয়েত বিমানঘাঁটি বাগরামে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে তখন স্পেশাল স্কোয়াড্রনের ব্রিটিশ সৈন্যরাও উপস্থিত। মাইক তাদের সঙ্গেই থাকতে লাগল।

২৬শে নভেম্বর সকালে খবর এলো যে কলা-ই-জঙ্গিতে নাকি বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে, রক্ষীদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে এবং সেখানে ঘোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। স্পেশাল স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডিং অফিসার ছ'জন সৈন্যকে বেছে নিয়ে তাদের নির্দেশ দিলেন ব্যাপারটা কি হচ্ছে একটু দেখে আসতে। তারা রওনা হবার সময়ে মাইক তাদের

BanglaBook.org

সঙ্গে গেল। সৈনিকেরা খুশি মনেই তাকে সঙ্গে নিল, কারণ তাদের আরবী জানা দোভাষী দরকার। মেশিনগান লাগানো সাঁজোয়া গাড়িতে ছ' ঘণ্টা এবড়ো খেবড়ো পথ অতিক্রম করে সালাং গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে প্রথমে মাজার-ই-শরিফ ও তারপরে কালা-ই-জঙ্গি পৌঁছানো গেল।

কালা-ই-জঙ্গির আরব বন্দীরা আসলে ছিল আল-কায়দার পরাজিত সৈন্যদল। সেই সময়ে এদের এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক বললে এতটুকুও অত্যুক্তি হয় না। উজবেক সৈন্যরা এদের কাছ থেকে বন্দুক পিস্তলগুলো কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের সারা শরীর সার্চ করা হয়নি। করলে দেখা যেত প্রত্যেকটি আরব তার ঢিলে পোশাকের মধ্যে দু' তিনটে করে গ্রেনেড লুকিয়ে রেখেছে। এরা প্রত্যেকেই অন্ধবিশ্বাসী আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি, যুদ্ধক্ষেত্রে রণনিপুণ ও নৃশংস।

কালা-ই-জঙ্গি কেল্লাটা উত্তর ভারতীয় বা ইউরোপীয় দুর্গের ছাঁচে তৈরি হয়নি। পঞ্চাশ ফুট উঁচু পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় ফাঁকা মাঠ, যথেষ্ট গাছপালা আর অনেকগুলো একতলা বাড়ি। পাঁচিলের দু'পাশে অল্প ঢালু—খাড়া র‍্যামপার্ট। এই খাড়াই বেয়ে পাঁচিলের মাথাতেও উঠে পড়া যায়। কিন্তু এই বিশাল মোটা দেওয়ালের নীচে ছিল গোলকধাঁধার মতো ছড়ানো ব্যারাক, গুপ্ত ভাণ্ডার আর অনেকগুলি সুড়ঙ্গ। দোস্তামের উজবেক বাহিনী মাত্র দশ দিন আগে কেল্লাটা দখল করেছিল। তারা ভাল করে খুঁজেও দেখেনি যে পাঁচিলের নীচে এক জায়গায় তালিবান বাহিনীর একটা অস্ত্র ও বোমাগুলির ভাণ্ডার আছে। কেল্লার দক্ষিণ প্রান্তে এই জায়গাটাতেই তারা আরব বন্দীদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এই অস্ত্র ভাণ্ডারের কথা জানতো একটি মাত্র লোক—তালিবান বাহিনীর অন্যতম কম্যাণ্ডার—ইজমৎ খান।

আল-কায়দার এই আরব জঙ্গিদের জীবনে একটাই ইচ্ছে ছিল—আল্লাহতালা যেন তাদের তুলে নেন, কিন্তু মরার সময়ে প্রত্যেকে যেন যতগুলো সম্ভব আমেরিকান বা আমেরিকানদের বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শহীদ হতে পারে। সেদিনই সন্ধের অন্ধকারে পাঁচজন উজবেক সৈন্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন আরব তার শরীরে লুকানো দুটো গ্রেনেডের পিন একসঙ্গে খুলে নিল। অন্ধকার ফাটিয়ে চমকে উঠল একটা চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক, পরমুহূর্তেই তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ—ছ'টা ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত শরীর ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। বাকি উজবেক সৈন্যরা রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে দূরে সরে গেল, বাকিরা রইল পাঁচিলের ওপর প্রহরী হিসেবে।

পরদিন সকালে উজবেকেরা বন্দী আরবদের 'বডি সার্চ' শুরু করল। সমস্ত বন্দীদের মাঠের মধ্যে জড়ো করে তাদের দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হ'ল। কিন্তু উজবেকদের কাছে মোটা দড়ি ছিল না। সুতরাং প্রতিটা লোকের মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে তাই দিয়েই হাত বাঁধা হ'ল। কিন্তু, পাগড়ি তো আর দড়ি নয়! ফলে প্রথম বন্দীটির দেহে অনুসন্ধান চালিয়ে দুটো পিস্তল ও চার-পাঁচটা গ্রেনেড খুঁজে বার করার সময়টুকুর মধ্যেই দু' তিনজন বন্দী তাদের হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। প্রথম বন্দীর কাছে অস্ত্র ছাড়া পাওয়া গেল বেশ ভাল পরিমাণ সৌদি আরবী অর্থ 'রিয়াল'। দোস্তামের সহকারী সইদ কামাল ছিল কেল্লার ভারপ্রাপ্ত কম্যাণ্ডার। সে এবং আর এক অফিসার অর্থসহ

BanglaBook.org

আরবটিকে টেনে নিয়ে গেল পাশেই একটা ঘরে। উদ্দেশ্য তার কাছ থেকে রিয়ালগুলো কেড়ে নিয়ে নিজেদের পকেটস্থ করা।

ঘরের দরজায় একটি সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। সে তার দুই অফিসারকে এক গাদা বিয়াল পকেটে পুরতে দেখে ঢুকে গিয়ে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো শুরু করল। অন্য অফিসারটি তেড়ে উঠে তাকে তক্ষুনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হুকুম করল। কিন্তু প্রহরীটি ছাড়বার পাত্র নয়। শুরু হ'ল তিনজনের মধ্যে ঝগড়া। আর চোখের পলক পড়ার আগেই আরব জঙ্গিটি হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে তার কুঁদোর ঘা মেরে তিনজন উজবেকেরই মাথা চৌচির করে দিল। তিনজনেরই মরতে দু'তিন সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না। পুরো ব্যাপারটার বিন্দু বিসর্গও ঘরের বাইরে কেউ টের পেল না।

সি.আই.এর সদস্য দু'জন আরবী জানা আমেরিকান ইতিমধ্যে খোলা মাঠে উবু হয়ে বসা বন্দীদের প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছিল। আল-কায়দার আরব জঙ্গিদের জীবনের প্রধান কামনা সম্পর্কে বোধহয় তারা খুব ওয়াকিবহাল ছিল না। হাতের কাছেই দুটো আমেরিকান—যথার্থ শহীদ হওয়ার এত বড় সুযোগ—কয়েকশো জোড়া ক্ষুধার্ত চোখ দুই মার্কিনীকে জরিপ করছিল। এরই মধ্যে রাইফেল হাতে বন্দীটি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। একজন উজবেক সৈন্য তার হাতে রাইফেল দেখে চেঁচিয়ে উঠতেই আরব জঙ্গি রাইফেল উঠিয়ে এক গুলিতে তাকে পরলোকে পাঠিয়ে দিল।

পর মুহূর্তেই সামনের সারি থেকে অন্তত কুড়ি জন আরব ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই মার্কিনীর ওপর। ঘুষি লাথি মেরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একজনকে তারা মেরে ফেলল। অন্যজন রিভলভার বার করে গুলি চালাতে শুরু করল। তিনজন আরব মারা পড়ল, দু'জন আহত। সৌভাগ্যক্রমে কেল্লার প্রধান ফটক ছিল কাছেই। রিভলভারের গুলি ফুরিয়ে যেতে সে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলো। তার সঙ্গে পালিয়ে বাঁচল কিছু উজবেক সৈন্য।

এরপরেই পাঁচিলের ওপরে থাকা উজবেক সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করল। মেশিনগান ও রাইফেল থেকে ছুটে আসা গুলি বৃষ্টিকে মিনিট খানেকের মধ্যে সামনের দিকে বসা একশো আরব মারা গেল। ইজমৎ খান ছিল অনেকটা পিছনে, হাতের বাঁধন অনেকের মতো সেও অনেক আগেই খুলে ফেলেছিল। এইবার সে এঁকে বেঁকে দৌড় লাগালো গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে দক্ষিণ দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ'খানেক বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে সে পৌঁছে গেল তালিবান অস্ত্রাগারে।

দশ মিনিট পরে গুলিবৃষ্টি থামল। উজবেক সেনারা তখন সকলেই কেল্লার বাইরে। মাঠে শুধু ছড়িয়ে পড়ে আছে একশো মৃতদেহ আর বেশ কিছু আহত বন্দী আরব। সদর ফটক এর আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকরা পাঁচিলের ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখল নিহত ও আহতদের অনেকেরই হাত তখনো পিছমোড়া করে বাঁধা। উজবেকদের তরফ থেকে সরব প্রতিবাদ জানানো হ'ল যে বন্দীরা আত্মসমর্পণের নিয়ম লঙ্ঘন করে লুকোনো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। সুতরাং গুলি চালানোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না। অবশ্য ততক্ষণে অবস্থা যা

BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছে, তাতে এসব বাক্‌বিতণ্ডা অর্থহীন। কারণ কেল্লা তখন বন্দীদের দখলে। শুরু হ'ল অবরোধ।

ইতিমধ্যে অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙে ইজমৎ খান পাঁচশো বন্দীর মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে রাইফেল, গ্রেনেড, মর্টার ও কয়েকশো রাউণ্ড কার্তুজ। সশস্ত্র আরব বাহিনী সুড়ঙ্গগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। পাঁচিলের ওপর কারো মাথা উঁকি মারছে চোখে পড়লেই যে কোন আরবের রাইফেল থেকে গুলি ছুটে যেতে লাগল সেই শত্রুকে লক্ষ্য করে। কিছু গুলি অভ্রান্ত নিশানায় আঘাতও হানলো। খবর পেয়ে জেনারেল দোস্তাম সাত-আটশো সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেল কালা-ই-জঙ্গিতে। এর কিছু পরে এসে পৌঁছল আমেরিকান বিমানবাহিনী ও বিভিন্ন পদাতিক বাহিনীর বারোজন সৈনিক। তাদের সঙ্গে এলো ব্রিটিশ স্পেশাল স্কোয়াড্রনের ছ'জন সৈন্য এবং তাদের দোভাষী লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইক মার্টিন।

পরের দিন, মঙ্গলবার শুরু হ'ল প্রতি-আক্রমণ। কয়েকজন উজবেক সেনা একটা ট্যাঙ্ক নিয়ে কেল্লা প্রাঙ্গণে ঢুকে বিদ্রোহীদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করল। ইজমৎ খান তার লোকেদের নিয়ে মাটির নীচে গুপ্ত কক্ষগুলিতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। গোলা ছোঁড়া থেমে যেতেই তারা আবার ফিরে এলো ওপরে। ইজমৎ বুঝে গিয়েছিল যে মৃত্যু তার নিশ্চিত। তার এই উনত্রিশ বছর বয়সে সে মরতে যাচ্ছে বটে, কিন্তু জিহাদি শহীদরূপে। তার কোনো ক্ষোভ ছিল না।

একটু পরেই আমেরিকান বোমারু বিমানের দেখা মিলল। মোট তিরিশটা বোমার মধ্যে আঠাশটা প্রাচীরের দক্ষিণ অংশে, যেখানে বিদ্রোহীরা লুকিয়ে ছিল, সেখানে আঘাত করে প্রাচীরের এক-তৃতীয়াংশ ধসিয়ে দিল। একশো জন বিদ্রোহী মারাও গেল।

বুধবার বিকেলে ইজমৎ বুঝে গেল যে জমির ওপরে তাদের আর থাকা সম্ভব নয়। উজবেকরা আরো ট্যাঙ্ক ও কামান থেকে সমানে গোলা ছুঁড়ছিল। মাটির নীচে গুপ্তকক্ষ-গুলোতে গিয়ে লুকানো ছাড়া উপায় নেই। একদল চেচেন আরব ঘোষণা করল তারা খোলা আকাশের নীচেই আত্মদান করবে। অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি তুলে তারা ধেয়ে গেল। অপ্রস্তুত কিছু উজবেক সেনা এই অতর্কিত আক্রমণে নিহত হলো। কিন্তু তারপরেই দুটো মেশিনগানের র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট শুরু হলো। ষাটজন উন্মাদ জঙ্গি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বৃহস্পতিবার আমেরিকানদের পরামর্শ মেনে উজবেকরা তাদের ট্যাঙ্কের দশ-বারো পিপে ডিজেল নিয়ে ওপরের নালা দিয়ে নীচের গুপ্তকক্ষগুলোতে ঢেলে দিল। তারপরে নালার বিভিন্ন মুখে ছুঁড়ে দিল জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি। ইজমৎ খান শেষ প্রান্তের একটা গুপ্তকক্ষে ছিল, তার সঙ্গে প্রায় দেড়শো বিদ্রোহী। সে অতখানি ডিজেল একসঙ্গে জ্বলে ওঠার ফলে "হুউমফ্" করে বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল। তারপরেই একটা উত্তাপের ঢেউ ধেয়ে এলো তাদের দিকে। ডিজেলের গন্ধ ছাপিয়ে সে টের পেল পোড়া মাংসের তীব্র পূতিগন্ধ। কিছু বিদ্রোহী জ্বলন্ত কাপড় জামা সহ কালো ধোঁয়ার মধ্যে কাশতে কাশতে ছুটে এলো তাদের কক্ষটার দিকে। মনঃস্থির করতে কয়েক

BanglaBook.org

সেকেণ্ড সময় নিল ইজমৎ খান। তারপরেই ছুটে গিয়ে কক্ষের দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিল। ওপাশ থেকে দরজায় বারবার ঘা পড়লো, শোনা গেল মৃত্যুমুখী লোকদের আর্তনাদ। কিছুক্ষণ পরে সব থেমে গেল। তাদের মাথার ওপরে শোনা যেতে লাগল কামানের গোলা বিস্ফোরণের শব্দ।

শেষ কক্ষটার মধ্যে দিয়ে এবার বাঁয়ে সরে গেল ইজমৎ ও তার সঙ্গের বিদ্রোহীরা। একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছে তারা তাজা বাতাসের গন্ধ পেল। এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল কোনো বেরোবার পথ নেই, ওপরে লোহার গরাদ দেওয়া একটা নালার মুখ। সেই রাতে উজবেকদের নতুন সেনাপতি দীন মহম্মদ কাছের একটা জলসেচের নালা থেকে পাইপ টেনে গরাদগুলোর ওপর আটকে দিল। এরপরে পাম্প চালিয়ে সেই কনকনে ঠাণ্ডা জলটা সে নীচে ফেলা আরম্ভ করল। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে নীচের ঘরগুলোতে কোমর সমান জল দাঁড়িয়ে গেল। নিদ্রাহীন, ক্লান্ত লোকগুলো একে একে ডুবে মরতে লাগল।

কেল্লা প্রাঙ্গণে তখন রাষ্ট্রসংঘের লোকজন পৌঁছে গেছে। চারপাশে উজবেক সৈন্যদের ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছু টিভি ক্যামেরা কাঁধে সংবাদ সংস্থার লোকজন। রাষ্ট্রসংঘের তরফে দোস্তামকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে জীবিতদের বন্দী করতে হবে, হত্যা মোটেই নয়। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বারবার আরবী ও পাশতুন ভাষায় ঘোষণা করা হতে লাগল ঃ যারা বেঁচে আছো, মাথার ওপর দু'হাত তুলে বেরিয়ে এসো। তোমাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না।"

প্রায় দশ-বারো ঘণ্টা পরে জীবিত বিদ্রোহীরা একে একে টলতে টলতে ওপরে উঠে আসতে লাগল। ইজমৎ সহ ছ'জন আফগানই বেঁচে ছিল। তারা একসঙ্গে আসার সময় হঠাৎ প্রাচীরের ভাঙাচোরা রাবিশের মধ্যে ইজমৎ খানের পা পিছলে গেল। সে পড়তে পড়তে সামলাবার জন্যে একটা পাথরের চাঁই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। চাঁই থেকে একটা ঢেলা তার মুঠোর মধ্যে খুলে এলো। কাছেই দাঁড়িয়েছিল একটি তরুণ উজবেক সৈন্য। সে ভয় পেয়ে গেল—ভাবল তাকে লক্ষ্য করে ইজমৎ পাথরটা ছুঁড়ে মারবে। নার্ভাস হয়ে সে হাতে ধরা গ্রেনেডটা ছুঁড়ে মারল। সৌভাগ্যক্রমে গ্রেনেডটা ফাটল ইজমতের মাথার বেশ খানিকটা ওপরে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় একটা ধারালো পাথরের টুকরো সজোরে ছিটকে এসে লাগল তার মাথার পিছনে। গভীর ক্ষত থেকে গল গল করে রক্ত বের হতে শুরু হ'ল। ইজমৎ সংজ্ঞা হারিয়ে পাথরের স্তূপে আছড়ে পড়ল। বাকি বন্দীদের ট্রাকে তুলে রওনা করে দেওয়া হ'ল।

এর ঘণ্টাখানেক পরে স্পেশাল ফোর্সের ছ'জন সৈনিকের সঙ্গে এসে পৌঁছল মাইক মার্টিন। চারপাশে ভাঙাচোরা পাথরের স্তূপ, তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল দু'শোর ওপর মৃতদেহ। হঠাৎ একটা নিঃসাড় দেহের ওপর তার চোখ আটকে গেল। লোকটির মাথা থেকে তখনো রক্ত বেরোচ্ছিল। মৃতদেহ থেকে রক্ত পড়ে না। সে নীচু হয়ে মুখটা দেখেই চিনতে পারলো। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডান উরুর ওপর শালোয়ারটা ছিঁড়ে ফেলতেই দেখা গেল ক্ষত চিহ্নটা। সেই তেরো বছর আগের মতো সে দেহটা তুলে কাঁধে ফেলে প্রধান ফটকের পাশে দাঁড়ানো একটা রাষ্ট্রসংঘের ল্যাণ্ড

BanglaBook.org

রোভারে তুলে দিল। "এই লোকটা এখনো বেঁচে আছে", সে বলল, "মাথায় জোর চোট লেগেছে।" কর্তব্য সমাধা করে সে বাগরামে ফিরে গেল।

চারদিন পরে মাজার-ই-শরিফের হাসপাতাল থেকে আমেরিকানরা আহত ইজমৎ খানকে নিয়ে গেল বাগরামে। সেখানে একটা ছোট্ট ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয় ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরল। ২০০২ সালের ১৪ই জানুয়ারি প্রথম বন্দীর দলটা পৌঁছল কান্দাহার থেকে কিউবার গুয়ানতানামো কারাগারে। তাদের হাতে হাতকড়া, পায়ে শেকল, পরণের পোশাক বিশ্রী রকম নোংরা ও রক্তাক্ত, চোখ বাঁধা। তিনদিন কারো খাবার জোটেনি। ইজমৎ খান এই দলটিতেই ছিল। রাষ্ট্রসংঘের হিসেবে দেখা গেল কালা-ই-জঙ্গিতে ৫১৪ জন আল-কায়দা জঙ্গি নিহত হয়েছে; যে ৮৬ জন বেঁচে গিয়েছিল, তাদের সকলেরই ঠাঁই হয়েছিল গুয়ানতানামোতে। উজবেক সৈন্য মারা গিয়েছিল ৬০ জন। রশিদ দোস্তাম নতুন আফগান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'ল।

কর্নেল মাইক মার্টিন তিন বছর স্পেশাল ফোর্স-এর সহকারী সর্বাধিনায়ক হিসেবে কাজ করার পর ২০০৫ সালে অবসর নিল। ২০০৬-এর জানুয়ারি মাসে সে হ্যাম্পশায়ারের মীওন উপত্যকায় একটা পুরোনো গোলাবাড়ি কিনে সেটাকে বসবাসযোগ্য করার জন্য নিজেই সারাইয়ের কাজ শুরু করে দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'অপারেশন ক্রোবার'-এর আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা আবশ্যিক ছিল। মাইক মার্টিন কি করতে কোথায় যাচ্ছে, কেনই বা যাচ্ছে এবং তার জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থারা কিভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবস্থা নিচ্ছে, এসব তথ্য অতি অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল। সরকারিভাবে গল্পটা হ'ল এইরকম—ক্রোবার একটা ইঙ্গ-মার্কিন যুগ্ম প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে আফগানিস্তানের আফিম ক্ষেত থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে যে ক্রমবর্ধমান ড্রাগের চালান চলছে, তার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ খবরাখবর সংগ্রহ করে ড্রাগের এই গুপ্ত কারবার রোখার চেষ্টা হবে; কারণ এই ড্রাগ বেচাকেনার পয়সা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের তহবিলে।

ক্রোবার-এর কাজ করার জন্য দুই দেশের গোয়েন্দা দপ্তরে যাদের নতুন করে নিয়োগ করা হ'ল, তাদেরও এই গল্পটাই বলা হ'ল। তাদের কেউই অবিশ্বাস করল না, কারণ তাদের কাজ বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সারা পৃথিবীর ওপর নজরদারি করা। এককথায়, স্থলে জলে আকাশে সব রকম যানবাহন, ছোট বড় ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা, বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধীদের দল—এই সব কিছুর ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাদের কথাবার্তা ই-মেল চিঠি ইত্যাদি যাবতীয় যোগাযোগের রেকর্ড রেখে সে সব কিছুর বিশ্লেষণ করে দরকারি তথ্য বার করতে হবে। একটা কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, 'ক্রোবার' একটা ওয়ান টার্গেট অপারেশন, অর্থাৎ এর লক্ষ্যবস্তু একটাই।

ইতিমধ্যে 'আল-ইসরা' যে আসলে কি, তা কিছুতেই জানা গেল না। নিঃসন্দেহে এটা একটা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার সাঙ্কেতিক নাম। কিন্তু আল-কায়দার মধ্যেও অত্যন্ত অল্প কিছু লোকই আসল ব্যাপারটা জানে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না। সুতরাং পশ্চিমী গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও চরম গোপনীয়তার উত্তরে নিজেরাও চরম গোপনীয়তা অবলম্বন করল। ঠিক করা হ'ল যে ক্রোবার-এর পাশাপাশি আর কোনো সমান্তরাল অপারেশন চালানো হবে না, কোনমতেই না। পেশোয়ারে মৃত তৌফিক আল-কুরের ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে ইঙ্গ-মার্কিন গুপ্তচরেরা দরকারি গুপ্ত তথ্য কিছুই পায়নি—আল-কায়দা ও তার সহযোগীদের কাছেও এই খবরই নানা গুপ্তপথে পৌঁছে দেওয়া হ'ল।

ক্রোবার-এর সদর দপ্তর হিসেবে বেছে নেওয়া হ'ল স্কটল্যাণ্ডের 'হাইল্যাণ্ডস' অঞ্চলের এডজেল সামরিক বিমানঘাঁটি। বহুকাল ধরে এই বিমান ঘাঁটিটা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু লম্বা রানওয়ে, অনেক হ্যাঙ্গার, কর্মীদের থাকার কোয়ার্টার, ক্যান্টিন ইত্যাদি সবই অক্ষত ছিল। জরুরি ভিত্তিতে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের তরফে দক্ষ মিস্ত্রির দল কিছুদিনের মধ্যেই বিমান ঘাঁটিটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সারিয়ে ফেলল। এডজেল দুর্গম না হলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত। কয়েক মাইল দূরে একটা মাত্র ছোট গ্রাম, তার বাসিন্দারা কৃষিজীবী। সামরিক বিমানঘাঁটিতে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে

BanglaBook.org

নাক গলানো তাদের ধাতে নেই। বরং গ্রামের একটি মাত্র পাবের মালিক এই ভেবে খুশি হ'ল যে এইবার তার হুইস্কি রাম বিয়ারের বিক্রি বাড়বে।

কিছুদিনের মধ্যেই এডজেল বিমান ঘাঁটি তার পুরোনো চকচকে চেহারা ফিরে পেল। নতুন নির্মাণ হ'ল মাত্র একটাই—প্রধান বাড়ির মাথায় গল্‌ফ বলের মতো দেখতে একটা গম্বুজ তৈরি করা হ'ল। এই গম্বুজের নীচে লুকানো অ্যান্টেনা সরাসরি কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে একটা পোকার নড়াচড়ার শব্দও এর মাধ্যমে শোনা যায়।

মিস্ত্রিরা যখন এডজেল বিমানঘাঁটির বাড়িঘরদোর রঙ করতে ব্যস্ত, সেই সময়ে লণ্ডনের জাহাজি দালাল সাইবার্ট অ্যান্ড অ্যাবারক্রম্বির অফিসে মিঃ আহ্‌মেদ লামপং নামে নিখুঁত স্যুটটাই পরিহিত এবং চোস্ত ইংরেজি বলিয়ে এক ইন্দোনেশিয় ব্যক্তি হাজির হলেন। তাঁর উৎকৃষ্ট বি.বি.সি. উচ্চারণের ইংরেজি শুনে চমৎকৃত মিঃ অ্যালেক্স সাইবার্টকে সে জানাল যে সে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের প্রাক্তন ছাত্র। তার মার্জিত ব্যবহার ও নিখুঁত ইংরেজিয়ানা মিঃ সাইবার্টকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মুগ্ধ করে ফেলল। অবশ্য অ্যালেক্স সাইবার্ট যে কথাটা জানতো না তা হল 'লামপং' ইন্দোনেশিয়ার অসংখ্য উপভাষার মধ্যে একটির নাম এবং আহমেদ লামপং নামটা ছদ্মনাম, যদিও তার পাসপোর্টে এই নামটাই আছে। পাসপোর্টটাও জাল, যদিও সেই জালিয়াতি ধরা প্রায় অসম্ভব।

ভিজিটিং কার্ড থেকে জানা গেল যে ব্যক্তিটি 'সুমাত্রা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি আমদানি রপ্তানি সংস্থার সিনিয়ার পার্টনার। তার অন্যান্য পরিচয়পত্র ব্যাঙ্কের দলিল-দস্তাবেজ সবই সুশৃঙ্খল ও নিখুঁত। এর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবসার সম্ভাবনা আছে ভেবে সাইবার্ট মনে মনে খুব উল্লসিত বোধ করল। লোকটির পরিশীলিত ব্যবহার ও চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ও বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটকদের প্রাণহানি ঘটানোর পেছনে প্রধান ভূমিকা ছিল এই লোকটির।

কাজের কথা শুরু করার আগে লামপং সাইবার্টের সামনে দুটো টাইপ করা কাগজ রাখল। প্রথমটায় তেতাল্লিশটা দেশের নাম, দ্বিতীয়টায় সাতাশটা। সে বলল, "প্রথম তালিকার দেশগুলোতে সারা দুনিয়ার ধনকুবেররা হিসেব বহির্ভূত রোজগারের টাকা রাখে, কারণ এই সব দেশের ব্যাঙ্কগুলো আমানতকারীর নাম গোপন রাখে। দ্বিতীয় তালিকার দেশগুলোর পতাকা যে কোনো দেশের বাণিজ্য জাহাজ ব্যবহার করতে পারে, অবশ্য তার জন্যে কিঞ্চিৎ অর্থমূল্য দিতে হয়। এই দুটো তালিকা একসঙ্গে মেলালে বোঝা যায় সারা পৃথিবী জুড়ে বাণিজ্য জগতে কি বিশাল জাল-জুয়াচুরির কারবার চলছে।"

অ্যালেক্স সাইবার্ট কিছুটা বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল, কারণ এসব ব্যাপার তার বেশ ভালমতোই জানা।

লামপং হেসে বলল, "পৃথিবীর যে অঞ্চলগুলোতে আমরা ব্যবসা করি, সেখানে দিনের পর দিন মূল্যবান বাণিজ্য সামগ্রীসহ জাহাজের পর জাহাজ স্রেফ উবে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

মাঝ-সমুদ্রে তারা নাম পালটে, পতাকা বদলে, এই সব জাল ব্যাঙ্কের কাগজপত্র দেখিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। এর সঙ্গে নিষিদ্ধ জিনিসের চোরা কারবার তো আছেই।"

"জানি", সাইবার্ট বলল। "সাংঘাতিক ব্যাপার। তা আমি কি করতে পারি?"

"আমরা সব অংশীদাররা মিলে ঠিক করেছি যে এখন থেকে আমাদের সংস্থা শুধুমাত্র ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ, যে গুলোতে আইনসম্মত ব্রিটিশ পতাকা "রেড এনসাইন" ওড়ে, আমদানি রপ্তানিতে শুধু সেই জাহাজের সঙ্গেই চুক্তি করব।"

"চমৎকার!" সাইবার্টের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "শুধু জাহাজের সঙ্গে চুক্তি নয়, এর সঙ্গে আমরা পুরো বাণিজ্য সম্ভার লণ্ডনের লয়েডস্ ইন্সসিওরেন্সে বীমা করিয়ে দেবো। তা আপনারা কি ধরনের জিনিস রপ্তানি বা আমদানি করতে চাইছেন?"

উত্তরে কয়েকটা বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার দেওয়া অর্ডারের চিঠি টেবিলে রাখল লামপং। "সিঙ্গাপুরের এই কোম্পানিটি উচ্চমূল্যের ব্রিটিশ মোটরগাড়ি আমদানি করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে। আমরা ওদের হয়ে গাড়িগুলো কিনে নিয়ে যাব। ফেরার পথে আমরা বোর্নিও এবং সুরাবায়া থেকে দামী কাঠ এবং রেশম নিয়ে যাব আমেরিকার বিভিন্ন বন্দরে। আপনি ইন্দোনেশিয়ান রপ্তানি সংস্থাগুলোর চিঠিও দেখতে পারেন—আমরা সকলেই ব্রিটিশ জাহাজ নিয়ে বাণিজ্য করার ব্যাপারে একমত। আপনি আমাদের জন্যে একটা বিশ্বস্ত ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ খুঁজে দিন। ব্রিটেন থেকে ইন্দোনেশিয়া—সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে আমেরিকা হয়ে ফের ব্রিটেন—এই ত্রিমুখী সমুদ্র যাত্রার জন্য আমরা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করে নিতে রাজি আছি।"

অ্যালেক্স সাইবার্ট রাজি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল, যে বন্দরগুলিতে জাহাজ ভিড়বে, লামপং সেগুলোর নাম, অনুমতিপত্র ইত্যাদি দরকারি দলিল দিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে সাইবার্ট লামপং-এর চাহিদামতো একটা মালবাহী জাহাজ জোগাড় করে নেবে।

মাইক মার্টিনের এডজেল বিমান ঘাঁটিতে মুখ দেখানোর জো ছিল না। পরের ছ'মাস ধরে এডজেল হবে অপারেশন ক্রোবার-এর চোখ এবং কান। কিন্তু সেখানকার কর্মীরা কেউই মাইকের অস্তিত্বের কথাও জানতো না।

মাইক কিছুদিন বাদেই উড়ে গেল স্কটল্যাণ্ডের অ্যাবারডীন শহরে। সেখান থেকে তার চেনা এক এস.এ.এস. সার্জেন্ট অ্যাঙ্গাস রিচার্ডস তাকে একটা সাদামাটা গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেল স্কটিশ হাইল্যাণ্ডসের এক নির্জন অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ ফোর্বস ক্যাসলে। সেখানে তার আলাপ হ'ল গর্ডন ফিলিপস ও মাইকেল ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে। মাইককে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে তারা জানাল যে আগামী আঠারো সপ্তাহ ধরে কয়েকজন দক্ষ শিক্ষকের অধীনে তার একটা তীব্র, প্রগাঢ় ট্রেনিং চলবে—উদ্দেশ্য মাইককে আফগান ইজমৎ খান-এ রূপান্তরিত করা।

পরদিন থেকেই মাইকের শিক্ষা শুরু হ'ল। তার ওপর প্রথম নির্দেশ এলো যে এখন থেকে পশ্চিম দুনিয়ার পোশাক, শার্ট-ট্রাউজারস-কোট-টাই ভুলে যেতে হবে। তার পরিধেয় বস্ত্র হবে ঢিলে শালোয়ার-কুর্তা, মাথায় পাগড়ি। দাড়ি গোঁফ কামানো বন্ধ। তাকে দেখে যেন এক পাশতুন উপজাতীয় লোক ছাড়া অন্য কিছু মনে না হয়।

মাইকের প্রধান দুই শিক্ষক যথাক্রমে নাজিব কুরেশি ও ড. ট্যামিয়ান গডফ্রে। প্রথম

BanglaBook.org

জন জাতে আফগান, একসময় কান্দাহারে শিক্ষকতা করতেন, বর্তমানে ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁর কাজ ছিল শেলটেনহ্যামের দপ্তরে আরবী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা। সেখানে থেকে ছুটি দিয়ে তাঁকে বর্তমান পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর কাজ মাইককে কথ্য আরবী ও পুশতু ভাষার নানা বৈচিত্র্য শেখানো এবং সেই সঙ্গে সবরকম আদর্শ পাশতুন আচার-আচরণ ও আদব কায়দা শেখানো। তার চলাফেরা, হাত-পা নাড়া, মুখভঙ্গী, এমনকি শোয়া বসাও যাতে পুরোপুরি পাশতুন ঢঙের হয়, সেজন্য নাজিব কুরেশি প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা তাকে পাখিপড়া করে শেখাতে লাগলেন।

অন্যজন ড. ট্যামিয়ান গডফ্রে ৬৫-৬৬ বছর বয়স্ক মহিলা। তিনি কোরান বিশারদ। শুধু বিশারদ বললে কম বলা হয়। কোরানের বিশ্বকোষ আখ্যা দিলেও ভুল হয় না। অনর্গল আরবীতে কথা বলতে তাঁর কখনো আটকায় না। দুই শিক্ষকই মাইকের সঙ্গে ফোর্বস দুর্গেই থাকতে লাগলেন। দু'জনকেই ভাল করে বলে দেওয়া হয়েছিল যে মাইক একজন পাশতুনের পরিচয়ে মুসলিম সেজে মুসলিম দুনিয়ায় একটা চরম বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছে। ফলে দুই শিক্ষকই নিজেরা যা কিছু জানেন সবটুকুই মাইকের মাথা তথা মনের মধ্যে পুরোপুরি প্রোথিত করে দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। দু'জনেরই লক্ষ্য একটাই—তাঁরা কিছু একটা শেখাতে ভুলে গেছেন বলে মাইক যেন বিপদে না পড়ে। 'আল-ইসরা' ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি, ওয়াহাবি মতে তার বিশ্লেষণ এবং দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করার যাবতীয় মর্মার্থ ড. গডফ্রে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মাইককে শেখাতে লাগলেন যে নাজিব কুরেশি পর্যন্ত চমৎকৃত হয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে কোরানের বহু অংশের ব্যাখ্যা জানেন না, অথচ এই খ্রিস্টান মহিলার সে সব নখদর্পণে।

ইজমৎ খানের কিছু কথাবার্তা, পুশতু ও আরবী উভয় ভাষাতেই, গুয়ানতানামোতে গোপনে রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই রেকর্ডিং বারবার শুনিয়ে কুরেশি মাইককে তালিম দিতে লাগলেন, যাতে ইজমৎ খানের বিশেষ বাচনভঙ্গী মাইক পুরোপুরি রপ্ত করতে পারে। ইতিমধ্যে ম্যাকডোনাল্ড গুয়ানতানামো থেকে ইজমৎ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ফোর্বস দুর্গে এসে মাইককে সে সব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করল। শক্তিশালী সেল ফোন ক্যামেরায় লুকিয়ে তোলা ইজমৎ খানের কিছু সাম্প্রতিক ফটোগ্রাফও মাইককে দেওয়া হ'ল, যাতে সে ইজমৎ খানের মুখের ভাব ও অভিব্যক্তি যতটা সম্ভব নিজের মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মাইককে সবচেয়ে বেশি অভ্যেস করানো হতে লাগল নমাজ পাঠ। এই প্রার্থনার সময় অন্য লোকজন তার চারপাশে থাকবে। সুতরাং একটাও শব্দের উচ্চারণ, বা একটাও শারীরিভঙ্গিমায় যেন বিন্দুমাত্র ভুল না হয়—এদিকে দুই শিক্ষকেরই কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। সুতরাং প্রতিদিন পাঁচবার পুবে মক্কার দিকে মুখ করে শুদ্ধ আরবী ভাষায় লেখা কোরানের স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে হাঁটু মুড়ে বসে নত হওয়া ও সোজা হওয়া—এককথায় নমাজ পাঠ চলতেই থাকল।

ইতিমধ্যে এডজেল বিমান ঘাঁটিতে বারোটা কম্পিউটার ওয়ার্ক স্টেশন পুরো

BanglaBook.org

শক্তিতে কাজ করা শুরু করে দিল। আরব দুনিয়ার ওপর ভূসমলয় কক্ষে স্থাপিত মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশের প্রতিটি শহরে গ্রামে যে যেখানে যা কিছু কথাবার্তা বলছিল। সব কিছুই 'স্টেশন ক্রোবার' (এডজেলের সাঙ্কেতিক নাম) স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুনে রেকর্ড করে ফেলতে লাগল। সমস্ত কর্মীদের তখনো বিশ্বাস যে আফিম এবং হেরোইন চোরাকারবারীদের ধরার জন্যই এত কিছু করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে কুড়ি হাজার ফুট ওপরে শূন্যে ভেসে বেড়ানো 'প্রিডেটর' রিমোট কন্ট্রোল উড্ডুক্কু যানের অতীব শক্তিশালী ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে নিখুঁত ছবি শ'য়ে শ'য়ে পৌঁছে যেতে লাগল ফ্লোরিডার ট্যাম্পায় অবস্থিত মার্কিন সামরিক কম্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় দপ্তরে। এইসব 'ডিজিট্যাল ইমেজ' এতই নিখুঁত যে ৩৫ মি.মি. পর্দায় প্রোজেক্ট করলেও সেগুলো এতটুকু ঝাপসা হ'ত না।

বড়দিনের কিছু আগে অ্যালেক্স সাইবার্ট মিঃ লামপংকে জানালেন যে তার পছন্দমতো মালবাহী জাহাজ পাওয়া গেছে। জাহাজের নাম 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'— মালিক লিয়াম ম্যাকেনড্রিক নিজেই জাহাজের ক্যাপ্টেন। পয়লা মার্চের মধ্যে কোনো ব্রিটিশ বন্দর থেকে মাল বোঝাই করে দূরপ্রাচ্যে রওনা হওয়ার জন্য জাহাজ তৈরি হয়ে যাবে। বর্তমানে জাহাজটা লিভারপুল বন্দরে আছে কিছু দরকারি সারাই কাজের জন্য।

সাইবার্টের কাছ থেকে এই খবর পাওয়ার পরেই লামপং-এর কাছ থেকে একটা ফোন কল গেল ব্রিটেনের বার্মিংহাম শহরে, অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত একজন মুসলিম অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপকটি পরদিনই গাড়ি চালিয়ে লিভারপুল বন্দরে পৌঁছে প্রথমে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-কে তন্নতন্ন করে নিরীক্ষণ করে দেখল। তারপর দূরপাল্লার টেলিফটো লেন্স লাগানো ক্যামেরায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জাহাজটার প্রায় একশো ছবি তুলে লামপং-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। এর কয়েকদিন পরে লামপং ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যালেক্স সাইবার্টকে একটা বার্তা পাঠাল এবং জানাল যে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' তাদের পছন্দ হয়েছে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে সি.আই.এ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু 'নিরাপদ বাড়ি' কিনেছিল। এগুলো প্রধানত সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে যে সব গুপ্তচর বা সরকারি কর্মচারীরা আমেরিকার কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করতো, তাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো। এগুলো অধিকাংশই ছিল দুর্গম অঞ্চলে, যাতে সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থা কে.জি.বি. তাদের খোঁজ পেয়ে খতম না করতে পারে। এই রকমই একটা নিরাপদ বাড়ি মারেক গুমিনি খুঁজে বার করল। বাড়িটা আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে ওয়াশিংটন রাজ্যে ঘন অরণ্যে ছাওয়া ক্যাসকেড্স পর্বতশ্রেণীর মধ্যে। কানাডার সীমান্ত ঘেঁষা এই জায়গাটাকে সবাই 'প্যাসেটেন অরণ্যাঞ্চল' নামে অভিহিত করতো। গহন জঙ্গলে ঢাকা এই পাহাড়ি অঞ্চলে যাওয়ার রাস্তা বলতে শুধু কিছু পায়ে চলা পথ। শীতকালে পুরো অঞ্চলটা বরফে ঢেকে যায়। অন্য সময়ে প্রচুর বন্য প্রাণীর দেখা মেলে। কিছু সখের শিকারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা লগ ক্যাবিন বা গাছের গুঁড়ির তৈরি কুটির বানিয়ে

BanglaBook.org

রেখেছিল। শীত পড়ার আগেই তারা ক্যাবিনগুলো বন্ধ করে নীচে নেমে আসতো।

সি.আই.এ'র ক্যাবিনটা ছিল দুর্গমতম অংশে। চারপাশে কোনো মানব বসতি নেই। প্রায় পনেরো মাইল দূরে মাজামা নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। ক্যাবিনে পৌঁছতে গেলে পর্বতারোহীদের মতো লম্বা দড়িতে বাঁধা হুক ছুঁড়ে দিয়ে কোনো গাছের ডালে আটকে নিজেকে টেনে তোলা ছাড়া গতি নেই। গুমিনির নির্দেশে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ ক্যাবিনটাকে সারিয়ে, বৈদ্যুতিক জেনারেটর, স্যাটেলাইট ফোন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বসবাসযোগ্য করে তুলল। ক্যাবিনটাকে এত খরচা করে সারানোর যুক্তি হিসেবে বলা হ'ল যে ওখানে একটা অত্যন্ত গোপন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আসলে ক্যাবিনটাকে একটি মাত্র লোকের জন্য একটা উচ্চ-নিরাপত্তা সম্পন্ন জেলখানা হিসেবে তৈরি করা হ'ল।

একই সঙ্গে মারেক গুমিনি ইজমৎ খানের বিচারের একটা ব্যবস্থা করল। মার্কিন সরকার পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছিল যে আল-কায়দার যে সব সদস্যকে তারা ধরেছে, তাদের কোনো বিচার হবে না। কিন্তু ইজমৎ খানের সঙ্গে আল-কায়দার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনদিন ছিলও না। সে সৈনিক, রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছে। এ কথা ঠিক যে সে তালিবান বাহিনীর অন্যতম কম্যাণ্ডার ছিল। তার জন্য তাকে উগ্রপন্থী, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসী আখ্যা দেওয়া চলে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বা আতঙ্কবাদী কিছুতেই বলা চলে না। জাতীয় নিরাপত্তার ডাইরেক্টর জন নিগ্রোপন্টে তাঁর সহকর্মী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে সামরিক আদালতের বিচারপতিদের সঙ্গে একটু 'কথা' বলে নিতে।

ম্যাকডোনাল্ড গুয়ানতানামো থেকে যত কাগজপত্র, টেপ রেকর্ডিং ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল, সেগুলোর থেকে জানা গেল যে ইজমৎ খানকে জেরা করার সময় বারবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার ডান উরুতে শুকিয়ে যাওয়া গোল ক্ষতটা কি করে বা কিভাবে হয়েছিল। ইজমৎ খান একবারও এই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। কিন্তু তার ডান উরুতে যে এইরকম একটা ক্ষতচিহ্ন আছে, সে তথ্য অনেকেরই জানা। আল-কায়দার কিছু লোকও হয়তো এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সেক্ষেত্রে মাইক মার্টিনের ডান উরুতে যদি ওই ক্ষতচিহ্নটা না থাকে, তাহলে তার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার ষোলো আনা সম্ভাবনা রয়েছে।

লণ্ডনের হারলি স্ট্রিটের এক খ্যাতনামা 'বন্ধু' শল্য চিকিৎসককে হেলিকপ্টারে করে ফোর্বস দুর্গে উড়িয়ে আনা হ'ল। তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। মাইকের ডান উরুটা অসাড় করে দিয়ে তিনি বুলেট ঢোকার মতো একটা গর্ত করে ওটাকে চারপাশ থেকে মোটাসোটা ছ'টা কাঁচা সেলাই দিয়ে দিলেন, যেমনটা আফগানিস্তানের এক দুর্গম অঞ্চলের হাসপাতালে দেওয়া স্বাভাবিক। তিনি এমনভাবে সেলাইগুলো দিলেন যাতে শুকিয়ে যাওয়ার পরে ক্ষতর চারপাশে কুঁচকে যায়। তাহলে ডাক্তারি না জানা কোনো লোকের চোখে ক্ষতটা পনেরো বছরের পুরোনো বলেই মনে হবে।

এই অপারেশনটা করা হয়েছিল নভেম্বরের গোড়ায়। বড়দিনের সময় দেখা গেল ক্ষতটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। এবং শল্য চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী ক্ষতচিহ্নের চারপাশ কুঁচকে গিয়ে ওটাকে পুরোনো ক্ষত বলেই মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

মাইক মার্টিন ও তার দুই শিক্ষকের প্রতিদিন ভোরের রুটিন ছিল ফোর্বস দুর্গ থেকে বেরিয়ে উঁচু নীচু পাহাড়ি পথ ধরে দু'তিন মাইল হাঁটা। শিক্ষাদান পর্ব কিন্তু এই সময়েও থেমে থাকতো না। একদিন ট্যামিয়ান গডফ্রে মাইককে জিজ্ঞেস করলেন, "ওয়াহাবি মতের উৎপত্তি কি করে হ'ল, তা কি জানো?"

মাইক মাথা নাড়তে তিনি বলে চললেন, "সৈয়দ ওয়াহারের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে সৌদি আরবের সবচেয়ে রুক্ষ ও বর্ণহীন নেজ্‌দ অঞ্চলে। ধর্মপ্রচারক হিসেবে কোরানের অগুন্তি ব্যাখ্যার মধ্যে ওয়াহাবি মতটিই সবচেয়ে ক্রুর এবং পরমত-অসহিষ্ণু। সৌদি আরবের সরকারি ধর্ম এই ওয়াহাবি ইসলাম, যদিও সৌদিরা খ্রিস্টান বা ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াহাবি মতের মধ্যে অন্য ধর্মের প্রতি যে চরম অসহিষ্ণুতা ছেয়ে আছে, সেটাকেই কাজে লাগিয়ে হাজারে হাজারে তরুণ মুসলিমকে আজকের সন্ত্রাসবাদী নেতারা মানুষ হিসেবে নষ্ট করে দিচ্ছে।"

নাজিব কুরেশি এইবার বলতে শুরু করলেন : "এই কারণেই সৌদি আরব সরকার আজ ভীত ও ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বহু বছর ধরে ওয়াহাবি ইসলামিক মতকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সৌদি আরব তার কোটি কোটি পেট্রোডলার খরচা করেছে। পৃথিবীর হেন মুসলিম দেশ নেই যেখানে সৌদি আরব ওয়াহাবি আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে টাকা না বিলিয়েছে। কিন্তু এর ফলে উঠে এসেছে আরো অনেক প্রচারক—তারা শুধু অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ আর অসহিষ্ণুতাই প্রচার করছে না, তারা বলছে অন্য ধর্মগুলোকে ধ্বংস করো, গণহত্যা চালিয়ে সেই সব ধর্মাবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দাও। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নামে এই যে দানব সৌদি আরবের দেওয়া টাকাতেই পুষ্ট হয়ে উঠেছে, সে আজ সৌদি আরবের ওপরেই চড়াও হতে চলেছে। সৌদি সরকারকে এই শক্তি অ-ইসলামিক বলে হেয় প্রতিপন্ন করছে, কারণ সৌদি আরব আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করছে, তার পবিত্র ভূমিতে কাফের সেনাদের থাকতে ও যুদ্ধ চালাতে অনুমোদন দিচ্ছে।"

"ওসামা-বিন লাদেন!" মাইক মন্তব্য করল।

"ওয়াহাবি মুসলমানদের মধ্যে একটা "শিকড়ে ফিরে চলো" আন্দোলন অনেকদিন ধরেই চলছে। এই আন্দোলনকারীদের বলা হয় 'সালাফি'। এরা চায় হাজার বছর আগের খলিফা শাসনের পুনর্জন্ম—লম্বা দাড়ি, পায়ে চটি, ঢিলে প্রাচীন স্টাইলের পোশাক, শরিয়তি আইন, সব রকম আধুনিকতাকে বর্জন করা—সোজা কথায়, বর্বর মধ্যযুগের প্রত্যাবর্তন।"

BanglaBook.org

"তার মানে তালিবান?" মাইক প্রশ্ন করল।

"তালিবান তো বটেই, তা ছাড়াও আরো অনেকে—আত্মঘাতী বোমারু জঙ্গিরা, যারা অল্প শিক্ষিত এবং সেই কারণে তাদের তথাকথিত ধর্মগুরুদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত। এরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে এদের উন্মত্ত, উন্মাদ, ঘৃণা ও ধ্বংসলীলা আল্লাহ্‌তালাকে সন্তুষ্ট করবে, হিংস্র মরণের পরে ফরিশতারা তাদের সাদরে বরণ করে বেহেশতে নিয়ে যাবেন!"

"এদের চেয়েও খারাপ", ট্যামিয়ান গডফ্রে বললেন, "এদের চেয়েও বিপজ্জনক যারা, তাদের বলা হয় 'তকফির'। সত্যিকারের সালাফি ধূমপান বা মদ্যপান করে না, তাস বা জুয়া খেলে না, নাচ-গান তাদের চোখে গর্হিত কর্ম, বিধর্মী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কোনোরকম সম্পর্ক রাখে না। এদের চেহারা, প্রাচীন পোশাক, কঠোর ধর্মীয় আচার-আচরণ ইত্যাদি থেকে এদের সহজেই চেনা যায়।

"কিন্তু তকফিররা পশ্চিমী সমাজের মধ্যে পুরোপুরি মিশে থাকে। এরা পশ্চিমী পোশাক পরে, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় এরা পুরো দস্তুর পশ্চিমী। ১১ই সেপ্টেম্বর জোড়া মিনার ধ্বংসকারী জঙ্গিদের নিরাপত্তা কর্মীরা ধরতে পারেনি, কারণ তারা চেহারায় পোশাকে কথায় সম্পূর্ণই পরিশীলিত পশ্চিমী ছিল। লণ্ডনের চার আত্মঘাতী জঙ্গিও তাই—ইংরেজ সমাজে এদের জন্ম এবং বৃদ্ধি, এরা জিমে যেত, ক্রিকেট খেলতো, ভদ্র, নম্র ব্যবহার করতো, মুখে সদা সর্বদা হাসি লেগে থাকতো—অথচ এই স্বাভাবিকতার আড়ালে তারা গণহত্যার ফন্দি আঁটতো। এদের তুমি ধরবে কি করে? সুন্দর করে দাড়ি গোঁফ কামানো, নিখুঁত স্যুট বুট পরিহিত, উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত একটা তকফিরকে দেখে তুমি কি করে বুঝবে যে সে আসলে একটা বহুরূপী গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায় এবং তার নিজস্ব ধর্মের খাতিরে স্বচ্ছন্দে গণহত্যা করে?"

দুর্গের প্রবেশপথ এসে গিয়েছিল। ঢোকার আগে নাজিব কুরেশি বললেন, "মাইক, তোমাকে এত কথা বলার কারণ আমরা দু'জনেই চাই যে সমগ্র ছবিটা তোমার চোখের সামনে পরিষ্কার থাকুক। তুমি কোথায় যাচ্ছ তা আমরা জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু কিছুটা আন্দাজ অবশ্যই করতে পারছি। আমরা চাই তোমার কাজ ঠিকঠাক হোক এবং তুমি সুস্থ থাকো। ....চলো, সকালের নমাজের সময় হয়ে গেছে।"

২রা জানুয়ারি সাইবার্ট অ্যাণ্ড অ্যাবারক্রম্বির অফিস থেকে জাকার্তায় একটা ই-মেলের মাধ্যমে জানানো হল যে জাগুয়ার সেলুন কার বোঝাই করে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' ১লা মার্চ লিভারপুল থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। সিঙ্গাপুরে গাড়ি নামানো হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজ উত্তর রোমিওতে গিয়ে কাঠ বোঝাই করে চলে যাবে সুরাবায়া, সেখান থেকে প্যাকিং বাক্স বোঝাই রেশম বস্ত্র জাহাজের ডেকে সাজিয়ে নিয়ে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে।

জানুয়ারি মাসের শেষে প্যাসেটেন অরণ্যাঞ্চলে অবস্থিত ক্যাবিনটির যাবতীয়

BanglaBook.org

সারাই ও ফিটিংস-এর কাজ শেষ হয়ে গেল। এই নির্জন নির্বান্ধব জায়গায় কাজ করতে সামরিক ইঞ্জিনিয়ারদের যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কাজ শেষ করার পরে উচ্চ বোনাসের লোভে তারা সময়ের মধ্যেই কাজটা শেষ করে ফেলল।

ক্যাবিনটা বাইরে থেকে দেখতে আগের মতোই লাগছিল। কিন্তু ভেতরে বড় বসার ঘর, শোবার ঘর, সোফা সেট, টিভি, স্যাটেলাইট ফোন, ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার ইত্যাদি আধুনিক জীবনের সব রকম সুযোগ সুবিধেই ছিল। শুধু শেষের একটা ঘর ছিল একেবারে বদ্ধ, উঁচুতে মাথার ওপরে একটা মোটা গরাদ দেওয়া স্কাইলাইট। ঘরের একদিক দিয়ে বেরিয়ে শাওয়ার ও শৌচাগার এবং বারো ফুট উঁচু চকচকে পালিশ করা মসৃণ গ্রানাইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট উঠোন। কারাকক্ষের বাসিন্দাটি এই একটা মাত্র জায়গা থেকেই খানিকটা খোলা আকাশ দেখতে পাবে।

ক্যাবিনের পাশেই একটা হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল, কারণ ক্যাবিনের বাসিন্দাদের খাবার দাবার ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস সবই আসবে হেলিকপ্টারে। এচাড়া চারপাশে দুর্ভেদ্য স্পাইন, লার্চ ও স্প্রুস গাছের জঙ্গল। অবশ্য ক্যাবিনের চারপাশে প্রায় একশো গজ পর্যন্ত জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে হেলিকপ্টারের নামাওঠা করতে যেমন সুবিধে হবে, তেমনি আকাশ থেকে ক্যাবিনের ওপর সহজে নজরদারি করা যাবে।

গুয়ানতানামোর সামরিক আদালতে জানুয়ারি মাসের একেবারে শেষে বিচার শুরু হ'ল। মোট আটজন বন্দীর মধ্যে সাতজনই সজোরে বারবার নিজেদের নিরপরাধ বলে ঘোষণা করল, শুধু একজন তাচ্ছিল্য-ভরা দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সারাক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। তার বিচার হ'ল সব শেষে। বলা বাহুল্য, এই বন্দীই ইজমৎ খান।

বিচারের রায় কি হবে, সে সম্বন্ধে কারোরই কোনো সংশয় ছিল না। যে লোকটা পাঁচ বছর ধরে একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি, কোনো সহযোগিতা করেনি, একটাও গুপ্ত তথ্য ফাঁস করেনি, তাকে যে বাকি জীবনকালের জন্য গুয়ানতানামো জেলেই ফেরত পাঠানো হবে, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিল। তবুও বিচার যখন হচ্ছে, তখন ইজমৎ খানের পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন উকিল দেওয়া হ'ল। ইজমৎ ইংরেজি বোঝে না, সুতরাং একজন আরবী দোভাষী সব কথা অনুবাদ করে তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

সরকারি পক্ষের উকিল তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলল যে বন্দী একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী। সে তার সন্ত্রাসবাদী সহযোগীদের নাম কিছুতেই জানায়নি এবং অন্য কোনোভাবেও মার্কিন সরকারের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করেনি। তাছাড়া সে এবং তার সাথীরা কালা-ই-জঙ্গি কেল্লায় শুধু হাতে একজন আমেরিকান নাগরিককে হত্যা করেছিল। এমন একজন অপরাধীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না।

ইজমৎ খানের পক্ষের উকিল আরো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখল। সে জানতো যে যাই বলুন, কোনো কাজ হবে না। সে একটাই ব্যাপারে জোর দিল যে, জোড়া মিনার ধ্বংস বা অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে বন্দীর কোনো যোগ ছিল এমন কোনোরকম

BanglaBook.org

প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে শুধুমাত্র একজন সৈনিক, আফগান গৃহযুদ্ধের একজন কম্যাণ্ডার মাত্র। মোল্লা ওমর ও তার তালিবান সরকার ওসামা-বিন-লাদেন ও তার আল-কায়দার সদস্যদের আশ্রয় দিয়েছিল বটে, কিন্তু রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ইজমৎ খানের সঙ্গে এই ঘটনার বিন্দুমাত্র যোগ ছিল না।

প্রধান সামরিক বিচারকের সঙ্গে এর আগের দিনই আমেরিকান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটা বৈঠক হয়েছিল। জেনারেল তাঁকে এই বন্দীর বিষয়ে সুস্পষ্ট একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মানতে তিনি বাধ্য। সুতরাং তিনি দুই উকিল ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "আদালত বন্দী ইজমৎ খান সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এই বন্দী যদি কোনোরকম সমস্যার উদ্রেক করে থাকে, তা আফগান সরকারের সমস্যা। আমেরিকান জনগণের অর্থে তাকে পোষার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই আদালত আদেশ জারি করছে যে একে আফগানিস্তানে সশস্ত্র প্রহরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই ফেরত পাঠানো হোক। সে দেশের রাষ্ট্রপতি হামিদ করজাই-এর নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার এর বিচার করবে ও যথোচিত ব্যবস্থা নেবে। রায়দান শেষ; আদালত আপাতত মুলতুবি রইল।"

ইজমৎ খানকে রায়ের আরবী অনুবাদ শোনানোর পরে তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে জানতো স্বদেশে তার জন্য অপেক্ষা করছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। একটাই সান্ত্বনা—সে স্বদেশের মাটিতে মরতে পারবে। ...যদি সে আসল ব্যাপারটা জানতো!

মাইকের সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকটা সেরে নেওয়ার জন্য মারেক গুমিনি স্বয়ং বিশেষ গ্রুম্‌মান-৫ বিমানে এডজেল উড়ে এলো। সেখান থেকে আধঘণ্টার মধ্যেই সে ফোর্বস দুর্গে পৌঁছে গেল। তার আগেই লণ্ডন থেকে পৌঁছে গেছে স্টিভ হিল। দুই বিশেষ সহকারী ম্যাকডোনাল্ড এবং ফিলিপসও উপস্থিত। পাঁচজনে মিলে যে বৈঠক শুরু হ'ল, তা চলল তিনদিন। এই তিনদিন শুধু খাওয়া, ঘুমোনো ও বাথরুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে অবিরাম একটা বিশাল প্লাজমা টিভিতে একের পর এক ছবি দেখিয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ড। ছবিগুলো বিভিন্ন দেশের আল-কায়দা ও তার সহযোগী বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নানা সদস্যের—কোনটা বড় ক্লোজ-আপ, কোনটা পুরো শরীর। কোনটা আবার লুকিয়ে তোলা। প্রত্যেকটা ছবি পর্দায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ্‌স সেই লোকটির সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাত তথ্য পড়ে যেতে লাগল।

এই সব ছবি মাইককে দেখানোর উদ্দেশ্য একটাই। লোকগুলো প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং নেতৃস্থানীয়। 'আল-ইসরা'র সঙ্গে এদের যে কেউই, বা একাধিক জন, সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। মাইক যদি তাদের সংস্পর্শে আসতে পারে, তাহলে তার অন্তত এইটুকু সুবিধে থাকবে যে, লোকটার চরিত্র, কাজকর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তার একটা প্রাথমিক জ্ঞান তথা ধারণা থাকবে। শত্রু সম্পর্কে যতটুকু আগে থাকতে জেনে রাখা যায়, ততটাই সুবিধে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

বৈঠকের শেষে নাজিব কুরেশি ও ট্যামিয়ান গডফ্রের কাছে বিদায় নিয়ে মারেক গুমিনি ও স্টিভ হিলের সঙ্গে গ্রুম্‌ম্যান-৫ বিমানে চড়ে মাইক সোজা পৌঁছে গেল গুয়ানতানামো বিমানবন্দরে। তারিখটা ১৪ই ফেব্রুয়ারি, সবে সূর্য উঠছে।

"মাইক", মারেক গুমিনি বলল, "তোমাকে প্লেনের মধ্যেই থাকতে হবে সারাদিন। রাত্তির হলে তোমাকে বার করে নেব।"

সন্ধে সাতটার সময়, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে সি.আই.এর স্পেশাল টাস্ক' টিমের চারজন এজেন্ট ইজমৎ খানের সেলে ঢুকল। নিয়মিত প্রহরীরা তার আধঘণ্টা আগেই চলে গেছে। বদলি প্রহরী কেউ আসেনি। চার এজেন্ট ইজমৎ খানকে কোনো সুযোগ দিল না। দু'জন তাকে জাপটে ধরল, তৃতীয় জন ক্লোরোফর্ম ভেজানো একটা কাপড় তার নাক মুখের ওপর চেপে ধরল। বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ইজমৎ খান নেতিয়ে পড়ল। তার সংজ্ঞাহীন দেহটা একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে চাকাওলা ট্রলিতে করে ঠেলে বাইয়ে নিয়ে গেল চারজনে। বেরোনোর আগে নিস্পন্দ দেহটা একটা সাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে দেওয়া হ'ল। পুরো ব্লকে একজনও প্রহরী ছিল না। কেউ কিছুই দেখতে পেল না।

ইজমৎ খানকে একটা কফিনের মতো কাঠের বাক্সে শুইয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। বাক্সটা সাধারণ মালবহনের ক্রেটের মতো দেখতে, গায়ে মার্কার ইঙ্ক দিয়ে নম্বর ইত্যাদিও ঠিকঠাক লেখা। জেলখানার বাইরে একটা কপিকল লাগানো ট্রাক অপেক্ষা করছিল। ক্রেটটা কপিকল দিয়ে তুলে নিয়ে ট্রাকটা মসৃণ গতিতে বিমান বন্দরের দিকে ছুটে গেল। তার পেছনে গেল চারজন এজেন্ট, একটা কালো গাড়িতে। একটা সামরিক মালবাহী হারকিউলিস বিমান অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। নিঃশব্দে ক্রেটটা ঢুকে গেল তার মধ্যে, বিমানের লেজের দিকের মস্ত দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এজেন্ট চারজন সামনের দরজা দিয়ে বিমানে উঠে বসার একটু পরে বিমানটা রওনা হয়ে গেল—গন্তব্য ওয়াশিংটন রাজ্যের ম্যাক্‌কর্ড বিমানঘাঁটি।

জেলখানার কম্যাণ্ডারের কোয়ার্টারে মারেক গুমিনি ও স্টিভ হিল বসে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ গুমিনির মোবাইল ফোন বিপ্‌বিপ্‌ করে উঠল। একটা ছোট্ট এস.এম.এস.—"ভাইকে স্কুলে নিয়ে যাছি।" গুমিনি হৃষ্ট চিত্তে মাথা নেড়ে হিলের দিকে তাকিয়ে হাসল। "চলো, কাজ আছে", সে হিলকে বলল।

ঘন্টাখানেক পরে একটা কালো গাড়ি গুয়ানতানামো জেলের ক্যাম্প ইকো সেল ব্লকের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজন লোক নেমে নিঃশব্দে দোতলার একটা কারাকক্ষে ঢুকে গেল। পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা সংজ্ঞাহীন ইজমৎ খানের একটা ছবি বার করে একজন কাঁচি দিয়ে আফগানের বদলি মানুষটির চুল ও দাড়ি কিছুটা করে ছেঁটে দিল। তারপর চুল দাড়ির গুচ্ছগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিদায় জানিয়ে সেলের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দু'জন চলে গেল।

ম্যাককর্ড ঘাঁটিতে পৌঁছনোর পর বাক্সটা হারকিউলিস থেকে একটি অপেক্ষমান চিনুক সামরিক হেলিকপ্টারে তোলা হ'ল। সঙ্গে উঠল দু'জন এজেন্ট। একটু পরেই ইজমৎ খানের জ্ঞান ফিরে এলো। বাক্সের ডালার উপরে খানিকটা অংশ ঠেলে সরিয়ে

BanglaBook.org

শুধু তার মুখটুকু উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল ইতিপূর্বেই। বন্দীর হাত পা সবই শক্ত কড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে আটকানো ছিল, যাতে সে উঠতে না পারে। অরণ্যাঞ্চলে হেলিপ্যাডে নামার পর প্রথমে তার দু'হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দশজন সশস্ত্র সৈন্য তাকে ঘিরে নামিয়ে নিয়ে গেল ক্যাবিনের ভেতর। লোহার একপাল্লা দরজাটা খুলে তার কারাকক্ষে তাকে ঢুকিয়ে হাতকড়া খুলে নেওয়া হ'ল। সৈন্যরা এরপরে পিছু হেঁটে বেরিয়ে যাবার পরে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। দরজার একটা ছোট প্যানেল সরিয়ে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ তার ওপর নজর রাখছে দেখে ইজমৎ খান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট ঘরটার মধ্যে খাট বিছানা সবই আছে, কিন্তু ঘরটা একটা জেলখানা। তার মানে তাকে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হ'ল না, বন্দী করে আমেরিকাতেই কোথাও রেখে দেওয়া হ'ল। 'আমরিকি' বিচারক মিথ্যে বলেছে। কিন্তু কেন?

পরদিন সকাল ন'টায় আর একটা হারকিউলিস বিমান গুয়ানতানামোর বিমানবন্দরে নামলো। চারজন প্রহরী দোতলার সেলটাতে গিয়ে দরজা খুলে বন্দীকে ডাকল; "খান, স্ট্যাণ্ড আপ!" বন্দী দাঁড়ানোর পরে তার কোমরে একটা চওড়া বেল্ট বাঁধা হ'ল প্রথমে। তারপরে বেল্টের সঙ্গে লাগানো শেকল দিয়ে দু'হাতে ও দু' পায়ের গোছে মোট চারটে কড়া লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। চারদিক ঘেরা জেল ভ্যানে করে বিমানবন্দরে পৌঁছে সামরিক বিমানের কাছে নামিয়ে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল বিমান পর্যন্ত। তীব্র রোদের মধ্যে চোখ কুঁচকে বন্দী একবার তার চতুর্দিকে চেয়ে দেখল, তারপরেই সশস্ত্র প্রহরীরা তাকে নিয়ে ঢুকে গেল বিমানের ভেতরে। পাঁচ মিনিট পরেই বিমান রানওয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করল। "ওই চলল তোমার লোক," কন্ট্রোল টাওয়ারের ভেতর গুমিনি বলল স্টিভ হিলকে। "যদি ওর আসল পরিচয় কেউ জানতে পারে....."

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দীর্ঘ বিমানযাত্রার শেষে আফগানিস্তানের মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করল সামরিক হারকিউলিস। চটপট কাগজপত্র সইসাবুদ সেরে বন্দীকে আফগান সৈন্যবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ইউসুফের হাতে সঁপে দেওয়া হ'ল। কুড়ি জন আফগান সৈন্য তাকে ঘিরে নিয়ে গেল অপেক্ষমান বন্দী ভ্যানে; সজোরে ঠেলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ভ্যানের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। সামনে ড্রাইভারের পাশে ইউসুফ উঠে বসার পরে ভ্যান রওনা হয়ে গেল কাবুলের পথে। পেছনে চলল সেনা বোঝাই ট্রাক।

ঘন্টা দুয়েক চলার পরে অন্ধকার নেমে এলো। সেনা ট্রাকটি হঠাৎ বাঁদিকের একটা রাস্তা দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। এ ব্যাপারটাকে পরে একটা 'দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা' বলে সরকারি সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল। আরো দশ মাইল যাওয়ার পরে পাশের একটা গলি থেকে বেরিয়ে এলো একটা লরি। লরির ড্রাইভার পর পর তিনবার হেডলাইট জ্বালালো–নেভানো করতেই বন্দী ভ্যান একটু এগিয়ে থেমে গেল। জায়গাটা শুনশান ফাঁকা, বন্দীর 'পলায়ন' ব্যাপারটা এইখানেই ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভ্যানের মধ্যে বন্দীর সঙ্গে ছিল দু'জন আমেরিকান সেনা অফিসার। বন্দী ভ্যানে ওঠার কিছু পরেই তারা বন্দীর হাতকড়া ও শেকল খুলে নিয়ে তাকে উলের গরম শালোয়ার কামিজ ও বুট পরিয়ে দিয়েছিল। মাথায় বাঁধার জন্য দিয়েছিল কালো কাপড়ের তালিবান পাগড়ির কাপড়। ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ ভ্যান থেকে নেমে ইশারায় বন্দীকে কাছে ডেকে নিলেন। তাঁর নির্দেশ মতো লরি থেকে চারটে মৃতদেহ নামানো হ'ল। লাশগুলো সেদিনই কাবুলের মর্গ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। চারটিই আফগান পুরুষদের। দু'জন আগের দিন দুর্ঘটনায় নিহত। অন্য দু'জন রাজমিস্ত্রি, মাচা থেকে পিছলে পড়ে মারা গিয়েছিল। এই দুটি লাশের পরণে তালিবান পোশাক। অন্য দু'টির দাড়ি গোঁফ কামানো, পরণে বন্দীশালার প্রহরীর ইউনিফর্ম।

পরিকল্পনাটা নিখুঁত ছিল। দুই প্রহরীর মৃতদেহ পড়ে থাকবে রাস্তায়, তাদের হাতে পিস্তল। বাকি দুই 'তালিবান' রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে, তদের শরীরে প্রহরীদেরে হাতের পিস্তলের পাঁচ-ছ'টা গুলি বিঁধে রয়েছে। মৃত প্রহরী দু'জনের শরীরে আঘাতের চিহ্ন, মাথা ফেটে গেছে। ভ্যানের দরজাটা একটা কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে ভেঙেচুরে দেওয়া হ'ল। একটা কবজা ভেঙে সেটা খোলা অবস্থায় ঝুলতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তালিবান জঙ্গিরা অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল, প্রহরীদের গুলিতে তাদের দু'জন মারা গেছে। বন্দী অথবা অন্য কোনো তালিব কুড়ুলের ঘায়ে প্রহরীদের হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছে।

নাটকের পুরো দৃশ্যটা ভাল করে সাজিয়ে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ লরিতে

BanglaBook.org

ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলেন। পেছনে বন্দীর সঙ্গে উঠল ভ্যানের ড্রাইভার ও দুই আমেরিকান। তখন মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের আফগানিস্তান, কনকনে শীত। কাবুল শহরের পাশ কাটিয়ে গজনী-কান্দাহার রোডে বন্দীকে নামিয়ে দিয়ে লরি চলে গেল। লরির ড্রাইভার চলে যাওয়ার আগে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "গুড লাক, বস!" মাইক মার্টিন চমকে মুখ তুলে তাকাল। ড্রাইভারটি 'স্যাস'-এর সৈনিক। 'স্যাস'-এর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সে উর্ধ্বতন অফিসারকে 'বস' সম্বোধন করেছে!

লরির ভেতরে স্যাস-এর আর্জেন্টটি গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইল ফোনে কাবুলের একটা নম্বর ডায়াল করল। মাত্র দুটি শব্দ উচ্চারণ করেই সে যোগাযোগ ছিন্ন করে দিল। কাবুলে তখন বাজে রাত তিনটে, স্কটল্যাণ্ডে রাত প্রায় এগারোটা। ফিলিপ্‌স-এর সামনের কম্পিউটারে এক লাইনের একটা মেসেজ ভেসে উঠল— "ক্রোবার ইজ রানিং।"

হাইওয়েতে সার দিয়ে পরপর কয়েকশো মালবাহী ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। ভোর হলে গন্তব্যের দিকে রওনা হবে। রাতে কেউ ট্রাক চালায় না, তালিবান গেরিলারা এখনো সক্রিয়। বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পর মাইক একটা পাকিস্তানের লাইসেন্স প্লেট লাগানো লরি দেখতে পেল। ড্রাইভার নিঃসন্দেহে পাশতুন নয়, তার কথ্য পুশতু ভাষার ভুল লক্ষ্য করবে না। ভোর হতে মাইক দেখল তার অনুমান নির্ভুল। লরিটার ড্রাইভার বালুচ উপজাতীয়। তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়ে মাইক তাকে রাজি করিয়ে ফেলল কান্দাহার পর্যন্ত সঙ্গে নিতে। মাইক ট্রাক-লরি চালাতে পারে শুনে সে খুশি হ'ল, কারণ তাহলে একঘেয়ে ড্রাইভিং থেকে তার মাঝে মাঝে বিশ্রাম মিলবে।

ড্রাইভারটি ভাঙা ভাঙা পুশতু বলতে পারে। দু'জনে অল্পস্বল্প কথা বলতে বলতে দুপুরের মধ্যে কান্দাহার পৌঁছে গেল। মাইক ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছিল যে তার বাড়ি কান্দাহারের উত্তরে 'স্পিন বোলডাক' শহরে পাহাড়ের নীচে। বালুচ ড্রাইভারের রাস্তাও সেটাই, ফলে সে দুপুর আড়াইটের সময় মাইককে তার কথামতো জায়গায় নামিয়ে দিল। বালুচ ড্রাইভার তার লরির রেডিওতে 'রেডিও কাবুল' না শুনে অন্য একটা এফ.এম. স্টেশনে গান শুনছিল। ফলে সে খবরটা শোনেনি। মাইককে নামিয়ে দিয়ে মাইল দুয়েক যাওয়ার পরে সে দেখল আফগান পুলিশ রাস্তার মাঝখানে বেড়া লাগিয়ে গাড়ি আটকাচ্ছে। তার পালা এলে পুলিশ সার্জেন্ট তার চোখের সামনে একটা ছবি বাড়িয়ে ধরলো। সে দেখা মাত্রই কালো পাগড়ি মাথায় দাড়ি গোঁফওয়ালা তালিব মুখটা চিনতে পারলো।

"আল্লার দোহাই দিয়ে বলছি," সে তার হৃদপিণ্ডের উচ্চকিত ধুপধাপ শুনতে শুনতে বলল, "লোকটাকে আমি কখনো দেখিনি।"

দক্ষিণে কোয়েটা রোডে লরি ঘুরিয়ে যেতে যেতে সে ঠিক করলো যে আর কোনোদিন অচেনা কাউকে সে লরিতে তুলবে না। মিথ্যে বলেছে সে বাধ্য হয়েই, না হলে তার ঝামেলার অন্ত থাকতো না! কিন্তু তালিবটা কি করেছে যে পুলিশ তাকে এইভাবে খুঁজছে? যাকগে, আফগানদের ঝামেলায় না জড়ানোই ভাল। সে সামনের দুটো ট্রাককে পরপর ওভারটেক করলো।

মাইককে আগে থাকতেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল যে দুটো জেল প্রহরীকে

BanglaBook.org

মেরে গুয়ানতানামো থেকে আসা অপরাধী পালিয়ে গেছে, এই ব্যাপারটাকে চেপে যাওয়া সম্ভব হবে না। প্রথমত আমেরিকান দূতাবাস আফগানদের অপটুত্ব নিয়ে একটা হইচই বাধাবে অবশ্যই। দ্বিতীয়ত, পুলিশ ধরেই নিয়েছে যে কয়েকজন তালিবান গেরিলা অতর্কিতে আক্রমণ করে বিপজ্জনক বন্দীটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং এই তালিবানের দলকে ধরার জন্য তারা প্রচণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠবে।

আফগান পুলিশের দাবি এড়াতে না পেরে কাবুলের মার্কিন দূতাবাস বাধ্য হয়েই ইজমৎ খানের একটা ছবি তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে ছবিটার ফ্যাক্স করা কপি আফগানিস্তানের প্রতিটি পুলিশ চৌকিতে পৌঁছে গিয়েছিল। রেডিও এবং টিভিতে সেই থেকে অনবরত প্রচার হচ্ছে ইজমৎ খানের নাম। শুধু তাই নয়, তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ আফগানি টাকায় পুরস্কার ধার্য হয়েছে।

মাইক এসব কিছুই জানতো না। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢোকার বিষয়ে সে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না। পাহাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে দেখল নীচে উপত্যকায় স্পিন বোলডাক-এর প্রাচীন দুর্গ দেখা যাচ্ছে। দুর্গটা পরিত্যক্ত, চারপাশে ঘন জঙ্গলে ঘেরা। মাঝরাতের অন্ধকারে গা ঢেকে সে দুর্গের দেওয়াল ঘেঁষে এগোলো পাকিস্তানের দিকে। ভোরবেলায় দেখা গেল সে কোয়েটা রোড ধরে দশ মাইল হেঁটে চলে এসেছে। এখানে একটা চায়ের দোকানে গরম কড়া চা আর মিষ্টি কেক খাওয়ার পরে সে একজন ট্রাক ড্রাইভারকে একটা পাঁচ ডলারের নোট দেখিয়ে চড়ে বসল তার ট্রাকে। দুপুরের মধ্যে সে কোয়েটা পৌঁছে গেল।

এতক্ষণে তার ঘন দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ আর কালো তালিবান পাগড়ি দামী সম্পদে পরিণত হ'ল। কারণ পেশোয়ারের পরে কোয়েটা হ'ল পাকিস্তানের সবচেয়ে উগ্রপন্থী, মৌলবাদী শহর—তালিবান পাগড়ি পরা লোক এখানে সম্ভ্রম আদায় করে সহজেই। তবুও কোয়েটায় বেশি সময় না কাটানোর জন্য মাইককে আগে থেকেই বলে রেখেছিল স্টিভ হিল। এর কারণ কোয়েটার জনসংখ্যার অধিকাংশই পাশতুন। এরা সব প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মুসলমান। মাইকের সঙ্গে পুশতুতে কথা বলার সময় এরা যদি বুঝতে পরে যে তার মাতৃভাষা পুশতু নয়, তাহলে মুশকিল হবে। সুতরাং হিলের পরামর্শমতো মার্টিন আর একজন বালুচ ড্রাইভারের ট্রাকে চড়ে কোয়েটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোট্ট বন্দর গোয়াদরের দিকে রওনা হ'ল। এভাবেই তার তথাকথিত পলায়নের তৃতীয় দিন সকালে সে গোয়াদর পৌঁছল।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ওমানের থুমরাইটে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের নজরদারি ইউনিটটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এখানে ছিল শুধু দুটো 'প্রিডেটর', রিমোট কন্ট্রোলড হালকা আকাশযান। শূন্যে কুড়ি হাজার ফিট ওপর থেকে একটা বিশাল বৃত্তের মধ্যে চক্কর কাটতে কাটতে প্রিডেটরের শক্তিশালী ক্যামেরা নীচের প্রতিটি জিনিস—জাহাজ, নৌকো, বাড়ি, রাস্তা, গাড়ি ও মানুষজন—ফটোগ্রাফ করে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় ফ্লোরিডার ট্যাম্পা শহরের প্রধান নজরদারি দপ্তরে। সেখানে একটা বিশাল পর্দায় বড় করে প্রতিটি ছবি প্রতিফলিত হতে থাকে অবিরাম। প্রিডেটরের উপস্থিতি র‍্যাডারে ধরে পড়ে না, তার ওড়ার কোনো শব্দও নেই। এককথায়, উড়ন্ত প্রিডেটর হ'ল মার্কিন নজরদারি দপ্তরের অদৃশ্য চোখ। ওমানের জোড়া প্রিডেটরের কাজ ছিল

BanglaBook.org

মাইকের গতিবিধি লক্ষ্য করা। আল-কায়দার ভেতরে ঢুকতে হলে তাকে জলপথে মধ্যপ্রাচ্যে আসতে হবেই। গোয়াদর থেকে যে কোনোরকম জলযানেই সে চড়ুক না কেন, সে সব সময় প্রিডেটরের নজরে থাকবে।

গোয়াদরে মোট চারটি মসজিদ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট মসজিদটা মৌলবাদীদের আখড়া। ইমাম আবদুল্লা হালাবি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই মসজিদে মাইক পৌঁছল দিনের দ্বিতীয় প্রার্থনার সময়। প্রার্থনা পরিচালনা করার সময়ে নমাজীদের ভিড়ের পেছন দিকে কালো তালিবান পাগড়ি পরিহিত আগন্তুক ইমামের নজরে পড়ল।

মসজিদের পেছনদিকে একটা ছোট ঘরে আগন্তুককে ইমাম ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালো। "পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার আশীর্বাদ আপনার ওপরে বর্ষিত হোক," ইমাম আরবীতে কথা বলল, উর্দু নয়।

"আপনার ওপরেও সে আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক, ইমাম," আগন্তুক উত্তর দিল। ইমাম লক্ষ্য করল আগন্তুকের আরবীতে পুশতু টান আছে। সে নিশ্চিত হ'ল যে লোকটি পার্বত্য উপজাতীয় পাশতুন।

"আমি ইমাম আবদুল্লাহ হালাবি। আমাদের নতুন বন্ধুর কোনো নাম আছে?"

একটুও ইতস্তত না করে মাইক বলল, "আমি হামিদ ইউসুফ।" সে আফগান রাষ্ট্রপতির নাম এবং স্পেশাল ফোর্সের ব্রিগেডিয়ারের পদবী মিলিয়ে নামটা বলল।

"স্বাগতম ইউসুফ ভাই। দেখছি আপনি প্রকাশ্যেই তালিবানি পাগড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনি কি তালিবানের সদস্য?"

"১৯৯৫ সালে কান্দাহারে আমি মোল্লা ওমরের কাছে শপথ নিয়েছিলাম।"

ছোট ঘরটাতে তারা দু'জন ছাড়া আরো দশ-বারোজন লোক ছিল। মাইক দেখল তাদের মধ্যে একজন স্থির দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছে। এইবার সে ইমামের কাছে সরে এসে উত্তেজিতভাবে ফিস ফিস করে ইমামের কানে কথা বলতে লাগল।

"ইমাম, এখানে আসার আগে একটু দূরে টিভির দোকানটার সামনের দিকে যে টিভি সেটটা রাখা আছে, তাতে খবর দেখাচ্ছিল, "সে উর্দুতে বলল।" আমি নিশ্চিত এই সেই লোক, এরই ছবি বারবার দেখাচ্ছিল। তিনদিন আগে কাবুল থেকে পালিয়ে এসেছে। সারা আফগানিস্তান-পাকিস্তানে একে নিয়ে হইচই পড়ে গেছে।"

মাইক উর্দু জানতো না, কিন্তু সে বুঝতে পারল যে তার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। ইমাম ঘরে উপস্থিত দু'জনকে উর্দুতেই বলল লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে আটকে রাখতে। সে যেন কোনোমতেই চলে না যায়। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মোবাইল ফোনে পরপর তিনটি কল করল। শেষ কলটায় প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কথাবার্তা হ'ল। ফিরে এসে মাইকের দিকে যখন তাকাল, তার মুখে চোখে শ্রদ্ধা স্পষ্ট।

একেবারে গোড়া থেকেই তালিবানের সদস্য, পুরো পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই মার্কিন আক্রমণে নিহত; উত্তরের পার্বত্য প্রদেশে মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে; তালিবান সেনাবাহিনীর একটা গোটা ডিভিশনের কম্যাণ্ডার ছিল; কালা-ই-জঙ্গির অস্ত্রাগার ভেঙে উজবেক-মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গেও লড়াই করেছে; পাঁচ বছর নরকতুল্য মার্কিন জেলে বন্দী ছিল; তারও পরে মার্কিনদের পা-চাটা কাবুল

BanglaBook.org

সরকারের কুত্তাদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছে—এ লোকটি সাধারণ উদ্বাস্তু নয়, নমস্য বীরপুরুষ!

ইমাম হালাবি পাকিস্তানি নাগরিক বটে, কিন্তু মার্কিন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে বলে ইসলামাবাদের সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। সে পুরোমাত্রায় আল-কায়দার সমর্থক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে সম্পূর্ণ নির্লোভ। পঞ্চাশ লক্ষ আফগানি অর্থ পুরস্কারটা পেলে বাকি জীবনটা সে আরামে আয়েসে কাটাতে পারবে জেনেও তার মনে কিন্তু এতটুকুও লালসা জন্মাল না।

ইমাম আগন্তুককে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তুমি আসলে কে, তোমার সত্যিকারের পরিচয় আমরা জানি। তোমাকে আমরিকিরা 'আফগান' বলে ডাকে। আমার সঙ্গে যতক্ষণ আছো, তুমি নিরাপদ। কিন্তু গোয়াদরে পাকিস্তানি আই.এস.আই.-এর চর ভর্তি। তার ওপর তোমার মাথার ওপর মোটা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তুমি এখানে কোথায় থাকো?"

"আমার কোনো থাকার জায়গা নেই। আমি সবেমাত্র এসেছি এখানে।"

"তুমি কোথা থেকে আসছো তাও আমি জানি। টিভির নিউজ চ্যানেলে তোমার ছবি দেখাচ্ছে, আর সমস্ত তথ্য বারবার বলছে। যে করে হোক, তোমাকে গোয়াদর ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু তোমার তো পরিচয়পত্র লাগবে। একটা ছদ্মনামে সে সব তৈরি করতে হবে। এখান থেকে তোমার নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা....আমি একজনকে জানি। দেখছি কি করা যায়।"

ইমামের এই বিশেষ লোকটির নাম ফয়সল বিন-সেলিম, জন্মসূত্রে কাতারি নাগরিক, পেশায় চোরাকারবারি, ধর্মে কট্টর ওয়াহাবি। সৌদি আরবের নতুন নবী যখন সাদা চামড়া আমরিকি ও আংলিজদের নোঙরামি, অশ্লীলতা ও ইসলাম বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে দুনিয়া জোড়া জিহাদ ঘোষণা করলেন, তখন থেকেই সে আল-কায়দার অভিযানে সামিল। চোরাকারবার থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করার পরে সে ওমানের কারিগরদের দিয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য একটা সমুদ্রগামী বিশাল 'ঢাউ' তৈরি করিয়েছিল। ঢাউয়ের নাম 'রাশা', অর্থাৎ মুক্তো। প্রধানত পারস্যের কার্পেট পাকিস্তানে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাইচালান করার জন্যই 'রাশা' ব্যবহৃত হতো। এছাড়া টিভি, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদিরও কারবার ছিল তার। কিন্তু ফয়সল 'রাশা'র মাধ্যমে আরও একটা কাজ নিয়মিত করতো। যদি কোনো 'বিশুদ্ধ মুসলমান', যে আল্লার জন্য বলিপ্রদত্ত, তার সাহায্য চাইতো, তাহলে সে নির্দ্বিধায় তাকে সাহায্য করতো। মাঝে মাঝেই আল-কায়দার 'সর্বোচ্চ গোপন' বার্তাবাহক লোকদেরও আরব সাগর পার করে দিত। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে এই খবরটা আগে থাকতেই ছিল। ফলে 'রাশা'র ওপর তাদের গুপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরা সর্বদা নজর রাখতো।

'রাশা' গোয়াদরে ভিড়ল পরদিন ভোরবেলা। ইমাম হালাবির বার্তা পেয়ে সে কিছুক্ষণ বসে চিন্তা করল। তারপর চোরাই মাল গোয়াদরের গুপ্ত গুদামে পাঠিয়ে দিয়ে সে মসজিদে এসে পৌঁছল বেলা দশটার সময়। ইমামের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলার পরে সে মাইকের মুখোমুখি হ'ল।

আলাপচারিতা শেষ হওয়ার পরে সে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে ইজমৎ ভাই, আপনি পাকিস্তানে থাকতে চান না?

BanglaBook.org

"কিছুতেই না," মাইক জবাব দিল। "পাকিস্তানি আই.এস.আই. আমাকে ধরে কাবুলের কুত্তাদের হাতে সঁপে দেবে। ওদের টাকার লোভ বড় বেশি।"

"আপনাকে আমি পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী কোনো একটা দেশে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে গিয়ে আপনি কি করবেন?"

"আমি অন্য 'বিশুদ্ধ বিশ্বাসী'-দের খুঁজে বার করব। আমি যোদ্ধা। পরম করুণাময় আল্লাহতালার পবিত্র যুদ্ধে আমি অংশ নিতে চাই। সেই যুদ্ধে আমার প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।"

চুপ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বিন-সেলিম বলল, "আমি এবার মশলা, তামাক, সিল্ক এবং উল নিয়ে যাবো। আমার ঢাউতে এসব মাল বোঝাই হবে কাল শেষ রাত থেকে, সময় লাগবে তিন-চার ঘন্টা। তারপরেই আমি রওনা হবো। ঢাউয়ের পাল নামানো থাকবে, ফলে গতি হবে ধীর। আমি বন্দরের শেষ প্রান্তের জেটির পাশ দিয়ে ঢাউ নিয়ে যাবো। ওই জেটিটা ব্যবহার করা হয় না। যদি কেউ জেটি থেকে লাফ দিয়ে ঢাউয়ের মধ্যে চড়ে যায় তো কারো নজর পড়বে না।"

রাতের অন্ধকারে ইমামের বিশ্বস্ত একটা ছেলের সঙ্গে গিয়ে মাইক জেটিটা চিনে এলো। বিন-সেলিমের ঢাউ 'রাশা'-কেও চিনিয়ে দিল ছেলেটা, যাতে তার ভুল না হয়। পরদিন সকালে সেই ছেলেটাই এসে মাইককে ডেকে নিয়ে গেল। 'রাশা' ধীরগতিতে ভেসে এলো ঠিক বেলা এগারোটায়। মাইক হিসেব করে দেখল, জেটি থেকে প্রায় আট ফুট দূর দিয়ে যাচ্ছে ঢাউটা। তার মনে পড়ল স্কুলে কলেজে পড়ার সময় স্পোর্টসে লং-জাম্প দেওয়ার কথা। সে জেটির ওপর সবেগে দশ পা দৌড়ে গিয়ে শূন্যে লাফ দিল—ঢাউয়ের নীচু রেলিং পেরিয়ে প্রায় এক ফুট ভেতরে গিয়ে পড়ল ।

বিন-সেলিম তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত ধোয়ার ও খাবারের জন্য জল দিল, একটা রূপোর পাত্রে বাড়িয়ে ধরল সুস্বাদু খেজুর। ঠিক বেলা বারোটায় খোলা ডেকে দুটো ছোট মাদুর বিছিয়ে প্রার্থনায় বসলো দু'জনে। নমাজের একটি শব্দও মাইক ভুল করল না।

ব্রিটেনে তখন প্রাতঃরাশের সময়, আমেরিকায় রাতের আঁধার। আরব সাগরের বিশ হাজার ফুট ওপরে উড্ডীয়মান, অতন্দ্র 'প্রিডেটর'-এর মাধ্যমে থুমরাইট থেকে ছবি পৌঁছে যাচ্ছিল এডজেল ঘাঁটিতে, অবিরাম, অশ্রান্ত। বড় পর্দায় কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিষ্কার দেখা গেল ফয়সল বিন-সেলিম ও আফগান রাশা'র ডেকে পা মুড়ে বসে নমাজ পড়ছে। ম্যাকডোনাল্ড ও ফিলিপসের মুখ দিয়ে আপনা হতেই উচ্চৈস্বরে জয়ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

সেলফোনে খবরটা পাওয়া মাত্রই প্রাতঃরাশের টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল স্টিভ হিল। অবাক স্ত্রীকে হাসিমুখে একটা সশব্দ চুমু খেয়ে সে ডায়াল করল একটা নম্বর। পুরোনো আলেকজান্দ্রিয়ার বাড়িতে তীক্ষ্ণস্বরে বেজে ওঠা ফোনটা ঘুম ভাঙিয়ে দিল মারেক গুমিনির। হিলের উৎফুল্ল বার্তা শুনে সে মন্তব্য করল, "এই তো চাই।" তারপর অন্যদিকে পাশ ফিরে নিশ্চিন্ত মনে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

'ক্রোবার' ঠিক পথেই চলছে।

BanglaBook.org

গোয়াদর থেকে কিছুটা দূর যাওয়ার পরেই বিন-সেলিমের ওমানি সহকারী রানার ইঞ্জিন বন্ধ করে পাল তুলে দিল। শক্তিশালী দক্ষিণা বাতাস বইছিল। শান্ত সমুদ্রের জল কেটে তরতর করে আরবের দিকে এগিয়ে চলল ঢাউ। সারাক্ষণ ধরে প্রিডেটরের ক্যামেরা জুম-ইন করে তাকে ফোকাসে ধরে রাখল।

ওমান উপসাগর দিয়ে ইরান ও আরবের মধ্যবর্তী হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশ করার খানিক পরে সন্ধ্যা নেমে এলো। কুমজারে ওমানি সেই ঘাঁটির কাছে একটা ছোট দ্বীপে পৌঁছে নোঙর ফেলল বিন-সেলিম। অন্ধকারের মধ্যেও অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে নৌকা ও তার ডেকে বসা মানুষগুলির ছায়াচিত্র থুমরাইট, এডজেল ও ট্যাম্পা—এই তিন জায়গারই কম্পিউটারে স্পষ্ট ফুটে রইল।

সন্ধের নমাজ সেরে বিন-সেলিম ফের মাইককে জিজ্ঞেস করল, "কালকেই তো তুমি আরবে পৌঁছে যাচ্ছো। এবার কি করবে?"

"জানি না," মাইক উত্তর দিল। "আমি শুধু এইটুকু জানি যে আফগানিস্তান বা পাকিস্তান দুই দেশেই আমার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু। কিন্তু ওরকম অর্থহীন মৃত্যু আমি চাই না। আমি জিহাদে অংশ নিয়ে শহীদের মৃত্যু চাই।"

"কিন্তু সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে তো কোনো যুদ্ধ নেই। সেখানে বা সৌদি আরবে যেখানেই যাও, পুলিশ তোমাকে কয়েক দিনের মধ্যেই ধরে ইয়াংকিদের হাতে তুলে দেবে।"

মাইক কাঁধ ঝাঁকাল। তারপরে বলল, "আমি শুধু আল্লাহর সেবা করতে চাই। আমার ব্যক্তিগত জীবন বলে আর কিছু নেই। আমার ভাগ্য আল্লাহর হাতে।"

"এবং তাঁর জন্য তুমি প্রাণ দিতে রাজি আছো?"

"অবশ্যই। কিন্তু আমি চাই শহীদের মৃত্যু, আল্লাহর পবিত্র জিহাদে যোদ্ধার মৃত্যু!"

বিন-সেলিম কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ঢাউয়ের নীচের খোল থেকে সদ্য কাচা ও ইস্তিরি করা আরবী সাদা আলখাল্লা 'ডিশডাশ' এবং মাথা ঢাকার জন্য কালো দড়ি বাঁধা 'কেফিয়ে' এনে বলল, "এগুলো পরে নাও। তোমার তালিব পোশাকগুলো জলে ফেলে দাও। জেড্ডাতে একটা আফগানদের কলোনি আছে। ডাঙায় নামার পরে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তো বলবে তুমি ওই কলোনির বাসিন্দা।

সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর সাতটা শাহীর মধ্যে দুবাই, আবুধাবি ও শারজা বাদে বাকি চারটেই দরিদ্র এবং আয়তনেও ছোট। এদের মধ্যে দরিদ্রতম রাসাল খাইমা প্রাচীন ওয়াহাবিপন্থী এবং মৌলবাদীদের ঘাঁটি। আল-কায়দা এখানে খুবই সক্রিয়। এই রাসাল খাইমাতেই সূর্যাস্তের সময় 'রাশা' গিয়ে ভিড়ল। বন্দর থেকে অনেকটা এগিয়ে একটা নির্জন জায়গায় পরিত্যক্ত একটা কেন্নার জেটিতে মাইককে নামিয়ে দিয়ে বিন-সেলিম বলল, "সামনেই উপকূলের হাইওয়ে ধরে পেছন দিকে হেঁটে যাও। পুরোনো শহরে ঢুকে প্রথম যে গেস্ট হাউসটা পাবে, তার মালিক আমার চেনা লোক। জায়গাটা সস্তা, কিন্তু পরিষ্কার। তুমি ওখান থেকে বাইরে বেরোবে না। ইতিমধ্যে আমি বন্ধুদের সঙ্গে

BanglaBook.org

যোগাযোগ করছি। তোমাকে তারা সাহায্য করবে। আই এই নাও, কিছু টাকা সঙ্গে রাখো। "অপেক্ষা করবে, একা কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবে না। তোমার কোনো পরিচয়পত্র নেই, খেয়াল রেখো।"

কথা শেষ করে ঢাউয়ের ইঞ্জিন চালু করে ঘুরে বন্দরের দিকে ফিরে গেল ফয়সল। এডজেল থেকে গর্ডন ফিলিপ্‌সের নির্দেশমতো থুমরাইটের অপারেটররা রিমোট কন্ট্রোল প্রিডেটরের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল নির্জন হাইওয়ে ধরে হেঁটে যাওয়া একাকী মানুষটির দেহ থেকে বেরিয়ে আসা উত্তাপে সৃষ্ট ছায়াচিত্রের দিকে।

প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটে গিয়ে গেস্ট হাউসটা পেল মাইক। ফয়সল বিন-সেলিমের নাম শুনে, আর তার দেওয়া ডিরহামের নোটের তাড়া দেখে মালিক কোনো আপত্তি না করে মাইককে একটা ঘর দিয়ে দিল। মাইক তাকে জানাল যে সে জেড্ডা থেকে আসছে। তার তামাটে গায়ের রঙ, চাপদাড়ি গোঁফ আর পুশতু উচ্চারণের আরবী শুনে গেস্ট হাউসের মালিক নিশ্চিত হয়ে গেল যে এই লোক ওয়াহাবি আফগান বটে।

ফয়সল বিন-সেলিম তার ঢাউ নিয়ে চলে গেল দুবাই। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সে গেল দ্বিতীয় দরিদ্রতম আমীরশাহী আজমানে। সেখানে সঙ্কীর্ণ অনেকগুলো গলি দিয়ে একটা মসজিদে পৌঁছে সে ইমামের সঙ্গে দেখা করে তার বক্তব্য জানিয়ে দিল। ইমামটি বয়সে যুবক, ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের জালালাবাদের কাছে দারুস্তায় আল-কায়দার সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং ক্যাম্পটা সে-ই চালাতো। ফয়সলের সব কথা শুনে সে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল। সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে সে ফয়সলকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানাল। ফয়সল ফের একটা ট্যাক্সি ধরে ফিরে চলল দুবাইয়ে রাখা তার ঢাউতে। তার যতটা করার কথা, তা সে করেছে। এবারে বাকি কাজ এই যুবা ইমামের। আল্লা আফগানের সহায় হোন।

সেই একই সকালে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' লিভারপুল বন্দর ছেড়ে দক্ষিণমুখো রওনা হ'ল তার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায়। ওয়েলসকে বাঁয়ে রেখে লিজার্ড পয়েন্ট ঘুরে পড়বে ইংলিশ চ্যানেলে। সেখান থেকে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে ভূমধ্যসাগর। তারপরে সুয়েজ খাল দিয়ে লোহিত সাগর, আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে সিঙ্গাপুর। জাহাজের ডেকের নীচে সুরক্ষিত খোলের মধ্যে বিশাল, জলনিরোধক প্যাকিং বাক্সে ভরা পঞ্চাশটা জাগুয়ার গাড়ি।

চারদিন ধরে গেস্ট হাউসের মধ্যে চুপচাপ থাকার পরে 'আফগান'-এর কাছে তার কাঙ্খিত অতিথিরা এলো। এই চারদিন সে ঘর থেকে রোজ সকালে বেরিয়ে কিছু সময় ধরে বাড়িটার পেছনদিকের উঠোনে পায়চারি করতো। উঠোনটা পাঁচিল ঘেরা, ঠিক মাঝখানে একটা আট ফুট উঁচু লোহার গেট। এই গেট দিয়ে নানা ডেলিভারি ভ্যান ঢুকতো বেরোতো। মাইক এই উঠোনে থাকার সময় প্রিডেটরের নজরে আসতো।

তার অতিথিরা একটা ডেলিভারি ভ্যানে করেই এলো। ভ্যানটাকে ব্যাক করে বাড়ির পেছনের দরজা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে থামিয়ে তার থেকে তিনজন লোক নেমে ভেতরে ঢুকে গেল। গেস্ট হাউসের অন্য অতিথিরা তার আগেই কাজে বেরিয়ে গেছে। মালিকের সঙ্গে তাদের আগের রাতেই কথা হয়ে গিয়েছিল, সে বাড়ি ছেড়ে

BanglaBook.org

বাজারে চলে গিয়েছিল। তিনজন নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় গিয়ে কোনোরকম জানান না দিয়ে সোজা ঢুকে গেল। তিনজনেরই মাথা মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, একজনের হাতে উদ্যত অটোম্যাটিক পিস্তল।

ক্ষিপ্রগতিতে মাইকের মাথার ওপর দিয়ে কালো কাপড়ের একটা ছোট থলের মতো ঢাকা দিয়ে গলার ওপর ফাঁস দিয়ে আটকে দিল। হাত দুটো পিছমোড়া করে প্লাস্টিকের হাতকড়া লাগিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তুলে দিল ডেলিভারি ভ্যানের পেছনে। ভ্যানের মেঝেতে পাতা একটা মাদুরের ওপর তাকে কাত করে শুইয়ে দিয়ে দু'জন বসল দু'পাশে। ভ্যানের পেছনের দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে আটকে দিয়ে তৃতীয় জন সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো। পর মুহূর্তেই ভ্যান বেরিয়ে গেল লোহার গেট দিয়ে রাস্তায়।

প্রিডেটরের ক্যামেরায় ভ্যানটার ঢোকা বেরোনো দুই-ই ধরা পড়ল, কিন্তু থুমরাইটের অপারেটররা কোনো গুরুত্ব দিল না। তারা ধরেই নিল যে ওটা একটা সাধারণ ডেলিভারি ভ্যান, রোজকার মতো গেস্ট হাউসে কিছু জিনিস পৌঁছে দিয়ে গেল। মাইককে যে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারটা তাদের খেয়াল হ'ল, যখন পর পর তিনদিন ধরে তাদের লোকটিকে উঠোনে দেখা গেল না। সহজেই বোঝা গেল যে কোনো একটা ভ্যানে করেই তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু গেস্ট হাউসে রোজ পাঁচ-ছ'টা ভ্যান আসে যায়। পুরোনো রেকর্ডিং বারবার দেখেও বোঝা গেল না কোন্ ভ্যানটায় করে কখন আফগানকে অপহরণ করা হয়েছে। প্রিডেটরের ক্যামেরা গেস্ট হাউসের ওপরেই মাত্র স্থির নিবদ্ধ করা ছিল, কোনো ভ্যানকে অনুসরণ করার নির্দেশও তাকে দেওয়া হয়নি। আফগান/ক্রোবার কোথায় আছে, কি করছে জানার কোনোই উপায় নেই।

ভ্যানটা খুব বেশি দূরে যায়নি। কিন্তু অপহরণকারীরা চরম সাবধানতা অবলম্বন করতেও পিছপা হয়নি। মাইককে নিয়ে এপাশে ওপাশে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে তবেই তারা তাদের আসল গন্তব্য একটা বড় বাগানবাড়িতে পৌঁছল। এই সাবধানতার কারণ একটাই—যদি এই লোকটা গুপ্তচর হয়, আর তার ওপর নজর রাখার জন্যে যদি অন্য কোনো গাড়ি করে কেউ অনুসরণ করে, তবে তাকে ধরে ফেলা বা ফাঁকি দেওয়া দরকার।

বাগানবাড়িতে একটা জানালাবিহীন ঘরে মাইককে আটকে রাখা হ'ল। তার বাঁ হাতে একটা কড়া, তার থেকে লম্বা শেকল বেরিয়ে গিয়ে দেওয়ালের মধ্যে পোতা। এক কোণে একটা সিঙ্গল খাট, আর এক কোণে কেমিক্যাল টয়লেট। মাইকের মাথা মুখ খুলে দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু অন্য যারাই তার এই সেলে আসতে লাগল, তাদের প্রত্যেকেরই মুখ ঢাকা। তারা মাইককে সম্পূর্ণ নগ্ন করে পোর্টেবল স্ক্যানার দিয়ে সারা শরীর সার্চ করল। এমনি কি মুখ হাঁ করিয়ে দাঁতগুলোও স্ক্যান করল। যদি তার শরীরে কোথাও একটা ক্ষুদ্রতম সিলিকন চিপও লাগানো থাকে বাইরে সঙ্কেত পাঠানোর জন্য, তবে স্ক্যানারের নজরে তা ধরা পড়বেই। কিছুই না পেয়ে শেষে তারা পোশাক ফেরত দিল। তার কোরান এবং নমাজের সময় বসার জন্য ছোট মাদুরটাও ফেরত দিয়ে দিল।

মাইক মনে মনে তার প্যারা রেজিমেন্ট ও 'স্যাস'-এর ট্রেনিংকে ধন্যবাদ জানাল। তখন থেকেই তাকে শেখানো হয়েছিল কেমন করে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন একা নিঃশব্দ, নির্বাক হয়ে না নড়েচড়ে বসে থাকা যায়। তিনদিন ধরে তার

BanglaBook.org

অপহরণকারীরা দেখল সে কিভাবে নমাজ পড়ার সময়গুলো ছাড়া কাঠের মতো চুপচাপ বসে থাকতে পারে—তার মুখ ভাবলেশহীন, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

তিনদিন পরে তার জেরা শুরু হ'ল। তার হাতকড়া খুলে নিয়ে মাথা মুখ কালো হুড দিয়ে ঢেকে তাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে মুখের ঢাকা খুলে নেওয়ার পরে সামনে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। টেবিলের ওপারে যে লোকটি বসেছিল, তার পরণে দামী স্যুট, দাড়িগোঁফ নিখুঁত কামানো। তকফির! ডঃ ট্যামিয়ান গডফ্রের বলা শব্দটা মনে পড়ল তার। তকফির—নিখুঁত পাশ্চাত্য কেতা ও আদব কায়দায় নিপুণ বহুরূপী—সবচেয়ে বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী!

লোকটি তার দিকে চেয়ে হাসল। "আমি ড্রঃ আল-খাত্তাব। তোমাকে সোজাসুজি একটা কথা জানিয়ে রাখি—তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে তুমি নিজের যে পরিচয় দিচ্ছ, তুমি সেই লোকই বটে, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো। যদি তা না হয়, তাহলে তুমি এখানে, এই ঘরেই মরবে। সুতরাং সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দাও—তুমিই কি সেই লোক যাকে ওরা আফগান বলে ডাকে?"

গর্ডন ফিলিপস তাকে বেশ কয়েকবার এই কথাটা বলেছিল—"ওরা দুটো বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইবে। প্রথমত তুমি কি সত্যিই ইজমৎ খান? তুমিই কি সেই ইজমৎ খান যে কালা-ই-জঙ্গিতে লড়াই করেছিল? এবং দ্বিতীয়ত, তুমি কি সেই লোকই আছো, না কি গুয়ানতানামোতে পাঁচ বছরে অন্য কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছো?"

সুদর্শন, হাসিমুখ লোকটির দিকে মাইক কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "আফগান তো অনেক....আমাকে আফগান বলে কারা ডাকে?"

"আহ্, তাও তো বটে—তোমার সঙ্গে তো পাঁচ বছর কারো কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাছাড়া তোমার তো একটা গুরুতর চোটও লেগেছিল, তাই না?"

'হ্যাঁ, মাথায়। কালা-ই-জঙ্গিতে.....'

এইভাবেই চলল সারাদিন। ইজমৎ খানের জীবনের ছোটখাটো নানা খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ফোর্বস দুর্গে দিনের পর দিন ম্যাকডোনাল্ড ও ফিলিপস পাখি পড়া করে তাকে এগুলোই শিখিয়েছিল। প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার সময় ইজমৎ খানের সারা জীবনটা চেনা বইয়ের পাতার মতো তার চোখের সামনে খুলে যেতে লাগল। শেষ অবধি সন্ধের পর ডঃ আল-খাত্তাব উঠে পড়ল। হাতে বাঁধা রোলেক্স ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, "আমি প্রতিটি উত্তর পরীক্ষা করে দেখব। যদি সব সত্যি হয়, তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে। নাহলে কি হবে তা তুমি জানো।" ঘন্টা দুয়েক পরে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে লণ্ডন ফিরে গেল আল-খাত্তাব।

আলি আজিজ আল-খাত্তাব জন্মসূত্রে কুয়েতি, কিন্তু তার পড়াশোনা সবটাই ব্রিটেনে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি লাভ করার পর সে ডক্টরেট হয় এবং বার্মিংহ্যামের অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকরি নেয়। এর অনেক আগে থেকেই সে সঙ্কীর্ণ মুসলিম মৌলবাদে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। দেশে আত্মীয়দের কাছে যাওয়ার নাম করে সে ছ'মাস আল-কায়দা পরিচালিত একটা সন্ত্রাসবাদী ক্যাম্পে ট্রেনিং নেয়। সেখানেই ঠিক হয় যে সে ব্রিটেনেই থাকবে আল-কায়দার প্রধান গোপন প্রতিনিধিরূপে। তার তথাকথিত বিশুদ্ধতা যাচাই করে স্বয়ং আল-জাওয়াহিরি তাকে

BanglaBook.org

ব্রিটেনে আল-কায়দার সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত করে। তার ক্ষমতার পরিধি বিশাল—ব্রিটেনে সে-ই একমাত্র লোক যে জানতো আল-ইসরা কি।

যে সময়ে আল-খাত্তাবকে নিয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমান ওড়ার উপক্রম করছিল, সেই সময়েই ব্রুনেই থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রিম্যান্টল বন্দরের দিকে রওনা হচ্ছিল 'জাভা স্টার' নামে একটা মালবাহী জাহাজ। জাহাজের ক্যাপ্টেন নুট হেরমান জানতো যে তার যাত্রাপথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। প্রাকৃতিক কোনো বিপদ নয়, বিপদটা জলদস্যুদের আক্রমণ। প্রত্যেক বছর পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালী থেকে পূর্বে সেলেবিস সী পর্যন্ত এলাকায় গড়ে অন্তত পাঁচশোটা জাহাজের ওপর জলদস্যুরা হামলা চালায়। অনেক ক্ষেত্রে জাহাজটাকে হাইজ্যাক করে অরণ্যসঙ্কুল কোনো দ্বীপে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে, তারপর জাহাজ কোম্পানির কাছ থেকে মোটা মুক্তিপণ নিয়ে তবেই জাহাজকে ছেড়ে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু সশস্ত্র এই জলদস্যুরা দ্রুতগামী স্পীডবোটে চেপে গিয়ে জাহাজে উঠে পড়ে এবং সমস্ত নাবিক ও ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে মালপত্র লুঠ করে ও চোরাবাজারে বেচে দেয়। জাহাজটির ভাগ্যে ঘটে সলিল সমাধি।

ক্যাপ্টেন নুট হেরমান এবার নিশ্চিন্ত ছিল যে জলদস্যুরা তার জাহাজ আক্রমণ করবে না। কারণ তার জাহাজে এবার কোনো মালই নেই। কিন্তু ঘটল তার উল্টোটাই। পরের দিন ভোরবেলা সেলেবিস সাগরে ঢোকার মুখে দুটো স্পীডবোটে করে একদল জলদস্যু জাভা স্টারে চড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাবিকদের হত্যা করল। ক্যাপ্টেনকে মারল সব শেষে। মারার আগে তাকে দিয়ে জোর করে বেতারে একটা বিপদবার্তা পাঠাল চতুর্দিকে—যে জাভা স্টারের ইঞ্জিন রুমে সাংঘাতিক আগুন লেগে গেছে, বাঁচাও! বিপদবার্তা পাঠানোর সময়ে জাহাজের যে পজিশন দেওয়া হ'ল সেটা সেই জায়গা থেকে বেশ কয়েক মাইল পরে।

তারপরে রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো সমুদ্রে ক্ষুধার্ত হাঙরদের মুখে ফেলে দিয়ে জাহাজটাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ভর্তি দ্বীপের খাঁড়িতে লুকিয়ে ফেলল। জঙ্গল সেখানে এত ঘন যে আকাশ থেকেও গাছপালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। জঙ্গলের ভেতরে এর সঙ্গেই লুকোনো দুটো টিনের চাল দেওয়া জাহাজ তৈরির কারখানা! পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করল সেই লোকটা যার ছদ্মনাম আমেদ লামপং।

জাহাজটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আগে একটা স্পীডবোট জাহাজের বেশ কয়েকটা লাইফ জ্যাকেট, রবারের ডিঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে বেতারে ঘোষণা করা মিথ্যে পজিশনে ফেলে এলো। ফলে প্রথম যে জাহাজটি জাভা স্টারকে সাহায্য করতে এলো, তার ক্যাপ্টেন ও নাবিকেরা দেখল জলের মধ্যে লাইফ জ্যাকেট, ডিঙ্গি ইত্যাদি ভাসছে, জাভা স্টারের চিহ্নমাত্র নেই। দুঃখিতভাবে সে নিজের বেতারযন্ত্রে ঘোষণা করে দিল যে জাভা স্টার আগুন লেগে ডুবে গেছে, এবং তার সব নাবিকও সেই সঙ্গে মারা গেছে।

ইংল্যাণ্ডের বীমা কোম্পানি লয়েডস তাদের রেজিস্টারে ঘটনাটা নথিভুক্ত করে নিল। দুনিয়ার কাছে 'জাভা স্টার'-এর আর কোনো অস্তিত্ব রইল না।

BanglaBook.org

মাইক পুনরায় আল-খাত্তাবের মুখোমুখি হ'ল এক সপ্তাহ পরে। আগেরবারে জেরার উত্তরে আফগান যা বলেছে, বিভিন্ন সূত্রে যাচাই করে দেখা গিয়েছিল সবই সত্যি। মুশকিল হ'ল গুয়ানতানামোর অন্যান্য বন্দীদের কাছ থেকে ইজমৎ খান সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায়নি। এর কারণ, অসহযোগিতা করার শাস্তিস্বরূপ বেশিরভাগ সময়টাই তাকে একা ছোট একটা প্রকোষ্ঠে বন্ধ করে রাখা হ'ত।

তবে একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আল-খাত্তাব পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, বাগরাম ও কাবুলের মাঝামাঝি নির্জন রাস্তায় অন্তত দু'জন তালিবের অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ নিয়ে ইজমৎ খান যে পালিয়ে এসেছে, সেটা সর্বৈব সত্যি। আসলে ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ এত সাংঘাতিক ক্রোধের অভিনয় করেছিলেন যে এখন পুনরায় ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠা তালিবান আন্দোলনে সামিল লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে সত্যি, নকল নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার আল-খাত্তাবকে সমানে খোঁচাচ্ছিল—

"তুমি বোধহয় সারা আফগানিস্তানে একমাত্র লোক যার আত্মীয়স্বজন, এমনকি গোটা সম্প্রদায়ের কেউ বেঁচে নেই," সে বলল।

গুয়ানতানামোতে শত অত্যাচার সত্ত্বেও ইজমৎ খান মুখ ফুটে কিছুতেই বলেনি কেন সে 'আমরিকি'-দের এত তীব্রভাবে ঘৃণা করে। তার অধীনে লড়াই করেছিল যে সব তালিব, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গেছে, তারা সকলেই বলেছে ইজমৎ খানের ভয় ডর বলে কিছু নেই। তারা এও বলেছে যে মার্কিনদের সাহায্যপ্রাপ্ত উত্তরের জোটের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ আসলে তার ব্যক্তিগত জিহাদ। এখন নিশ্চিত হওয়া দরকার যে গুয়ানতানামোয় গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমেরিকানরা তাকে পাল্টে ফেলেছে কিনা। এই লোকটা অবশ্যই আসল ইজমৎ খান—দ্য আফগান—কিন্তু সে কি আমেরিকার গুপ্তচর?

"ইজমৎ খান, তুমি ২০০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের আগে মাসুদের জোটের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করোনি কেন?"

"কারণ 'আমরিকি'রা ওই সময়েই আফগানিস্তানে ঢুকেছিল।"

'তার মানে তুমি আফগানিস্তানের জন্য লড়েছিলে...এবং এখন তুমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে চাও?"

মাইক সম্মতিসূচক মাথা হেলাল—"অনেকদিন আগেই শেখ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"

আল-খাত্তাব তার কথা শুনে বিষম রকম চমকে গিয়ে হাঁ করে মাইকের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আল-কায়দার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও

BanglaBook.org

অধিকাংশ আল-কায়দা জঙ্গির মতো আল-খাত্তাবও ওসামা বিন-লাদেনকে কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখেনি। ছ'মাস পাকিস্তানে থাকার সময়েও নয়।

অবশেষে আল-খাত্তাব প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মহামান্য শেখকে দেখেছো? তিনি নিজের মুখে তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?"

এইবার মাইক পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করল। পুরো বর্ণনা থেকে সে নিজেকে এবং তার ব্রোপাইপ ক্ষেপণাস্ত্রকে পুরো সরিয়ে রাখল। কিন্তু সে ছবির মতো বর্ণনা করল কেমন করে তার বাবার লস্করের সৈন্য হিসেবে সে মাসুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে যাচ্ছিল; কি পরিস্থিতিতে রাশিয়ান হেলিকপ্টার গানশিপ তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো; তার উরুতে গুলি বেঁধার পর তার কি অনুভূতি হ'ল; এবং গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে হেলিকপ্টারটা শেষ অবধি উড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তারপরে সে বর্ণনা করল কেমনভাবে আল্লার দয়ায় একজন পাশতুন তাকে জাজিতে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল। জাজির গুহার গোলকধাঁধার মধ্যে ছড়ানো আরব সেনাঘাঁটির নিখুঁত বর্ণনাও দিল।

"কিন্তু শেখ.... শেখের সঙ্গে কি করে দেখা হ'ল তোমার?" আল-খাত্তাব অধৈর্য স্বরে প্রশ্ন করল। আগের দিনের মতো আজও সে মাইকের প্রতিটি কথা ও বর্ণনা একটা নোটপ্যাডে লিখে নিচ্ছিল। এইবার মাইক যা বলল, সে কথাগুলোর প্রতিটি শব্দ সে লিখে নিল। তারপর বলল, "আর একবার বলো, শেখ কি বলেছিলেন?"

"শেখ আমাকে বলেছিলেন : 'একদিন আসবে যখন আফগানিস্তানের তোমাকে আর প্রয়োজন হবে না, কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহতালার সব সময়েই তোমার মতো যোদ্ধার প্রয়োজন আছে।'"

"তারপরে কি হ'ল?"

"আমার উরুর ড্রেসিংটা বদলে দেওয়া হ'ল।"

"কে বদলাল? শেখ?"

"না, না। ওঁর সঙ্গে যে ডাক্তার ছিলেন, তিনি—মিশরীয়।"

আয়মান আল-জাওয়াহিরি! আল-খাত্তাব মনে মনে ভাবলো। শেখের প্রধান সঙ্গী ও পরামর্শদাতা। মিশরীয় ইসলামিক জিহাদকে শেখের অধীনে এনে আল-কায়দা সৃষ্টি করেছিলেন। আল-কায়দার ভেতরে তার নিজের পদোন্নতির জন্য এই মানুষটিই দায়ী। যদিও তাকে সে চাক্ষুষ দেখেছে মাত্র দু'বার। কিন্তু শেখ? যাঁকে সে আল্লার প্রতিভূ বলে মনে করে? .....সে তার কাগজ কলম গুছিয়ে নিল।

হিলটন হোটেলে তার ঘরে ফিরে গিয়ে আল-খাত্তাব একটা লম্বা চিঠি লিখলো, তারপরে হোটেলের বাইরে একটা বুথ থেকে ফোন করলো ফয়সল বিন-সেলিমকে। 'রাশা' তখনও দুবাইতে। পরদিন সকালে ঢাউতে উঠে বিন-সেলিমকে চিঠিটা দিল আল-খাত্তাব। এক ঘণ্টার মধ্যে দুবাই ছেড়ে পরদিন গোয়াদর পৌঁছে গেল বিন-সেলিম। তার কাছ থেকে তিন-চার হাত ঘুরে চিঠি গেল ওয়াজিরিস্তানের এক গহীন, গোপন স্থানে। উত্তর এসে পৌঁছল দশদিন পরে, একই পথে। কিন্তু লিখিত উত্তর নয়। বার্তাবাহককে উত্তরটা মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

BanglaBook.org

যে সে যেন উত্তরটা একমাত্র আল-খাত্তাবের কানে কানে বলে দেয়, আব কারো কানে যেন একটা কথাও না যায়।

'জাভা স্টার'-কে দুর্গম, অরণ্যঘেরা দ্বীপে নিয়ে আসার দু'দিন আগে চীন থেকে জাহাজ তৈরির কারিগরদের একটা দল সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রধান কারিগরের নাম ওয়েই উইংলি। যে কোনো জাহাজের চেহারা পাল্টে তাকে নতুন আদল দেওয়াই তার দলের কাজের বিশেষত্ব। এদের কাউন্টেস অফ রিচমণ্ডের কয়েকটা ছবি দেওয়া হ'ল—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা। সব ক'টা ফটোতেই জাহাজের নামটা মুছে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য জাহাজের নাম জানায় লি'র কোন আগ্রহ নেই। সে চায় টাকা। এই কাজটাতে চাহিদার তুলনায় বেশি টাকাই পাবে সে। সুতরাং ছবির সঙ্গে জাভা স্টারকে মিলিয়ে সে জানাল যে জাভা স্টারকে হুবহু ছবির জাহাজের চেহারায় বদলে দিতে দুই সপ্তাহ লাগবে। লামপং তাকে তিন সপ্তাহ সময় দিল, কিন্তু তার চেয়ে একদিনও বেশি নয়। এই ধরনের নাম ও আদল পালটানো অজস্র মালবাহী জাহাজ বে-আইনি পতাকা লাগিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়, এদের কাজ চোরাইচালান।

লি-কে শুধু একটাই নতুন জিনিস তৈরি করতে বলা হ'ল। সেগুলো হল ছ'টা ইস্পাতের তৈরি লম্বা বাক্স, থাকবে তিনভাগে সারা ডেক জুড়ে। বাস্তবে কিন্তু সেগুলো বাক্স হবে না। ডেকের ওপরে দেখা যাবে শুধু তাদের উপরিভাগ। নীচে কোনো দেওয়াল থাকবে না। প্রতিটাতে থাকবে একটা করে লম্বা গ্যালারি। ওপরের দৃশ্যমান অংশটায় কব্জা লাগানো থাকবে, যাতে নীচে থেকে ঠেলে খুলে দেওয়া যায়। এগুলোর ঢোকার রাস্তা ডেকের শেষে একটা নতুন দরজা—যে না জানে, সে ধরতে পারবে না যে ওখানে একটা দরজা আছে।

যেদিন লি'র দল জাভা স্টারের ওপর কাজ শুরু করল, সেদিন কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড ঢুকল সুয়েজ খালে।

ফয়সল বিন-সেলিমের ডাক পেয়ে একটা ছোট ভাড়া করা গাড়ি নিজে চালিয়ে দুবাই ক্রীকে হাজির হল আল-খাত্তাব। একটি তরুণ ছেলে এসে তার কানে ফিসফিস করে গোপন বার্তাটি বলে দিল। আল-খাত্তাবের মুখে ফুটে উঠল প্রথমে বিস্ময়, পরে আনন্দ। কিছুক্ষণ পরেই সে দ্রুত ফিরে গেল বাগানবাড়িতে। মাইকের হাতকড়া খুলিয়ে তাকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে গেল ডাইনিং রুমে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করার জন্য।

"একটা শেষ অনুরোধ, বন্ধু। তোমার ডিশডাশটা তুলে ডান পায়ের উরুটা আমাকে একটু দেখাবে?"

মাইক উরু উন্মুক্ত করে দাঁড়াল। সে নিঃশব্দে প্রার্থনা করল যে ডক্টর আল-খাত্তাব যেন চিকিৎসক 'ডক্টর' না হয়। প্রার্থনার দরকার ছিল না, কারণ আল-খাত্তাবের ডক্টরেট ডিগ্রিটা ছিল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। আল-খাত্তাব নীচু শুকনো, কুঁচকানো ক্ষতটা মন দিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। তাকে যা বলা হয়েছিল, ক্ষত চিহ্নটা ঠিক সেই

BanglaBook.org

জায়গাতেই। ছ'টা সেলাইয়ের দাগও স্পষ্ট চোখে পড়ে।

"ধন্যবাদ বন্ধু", সে বলল, শেখ স্বয়ং তোমাকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। ওহ্, কি অসামান্য সম্মান! তিনি ও তাঁর ডাক্তার বন্ধু দু'জনেরই কিশোর আফগান যোদ্ধাকে স্পষ্ট মনে আছে। উনিশ বছর আগে জাজির হাসপাতালে সেই যোদ্ধাকে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাও মনে আছে তাঁর।

"শেখ আমাকে অনুমতি দিয়েছেন তোমাকে একটা বিশেষ অভিযানে সদস্য করে নেওয়ার জন্য। এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা পশ্চিমী শয়তানকে এমন সাংঘাতিক একটা আঘাত হানবো যে, তুলনায় জোড়া মিনার ধ্বংসও ছেলেখেলা মনে হবে। তুমি আল্লার সৈনিকরূপে এক বিরাট গৌরবময় শহীদের মৃত্যুবরণ করতে পারবে। আজ থেকে হাজার বছর পরেও তোমার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।"

মধ্যাহ্নভোজ শেষ হতেই একজন নাপিত এসে মাইকের মাথার চুলের জঙ্গল ছেঁটে 'ইংলিশ কাট' করে দিল। আল-খাত্তাব দাড়িটাও কেটে ফেলতে বলল, কিন্তু মাইক রাজি হ'ল না। সে ধর্মপ্রাণ মুসলিম, দাড়ি তার ধর্মের অঙ্গ। শেষে আপোষ করে থুতনি ঘিরে 'ফ্রেঞ্চ কাট' দাড়ি করে দেওয়া হ'ল। একজন দর্জি এরপরে তার মাপ নিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জুতো, মোজা, অন্তর্বাস, টাই এবং গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট নিয়ে এলো। সব জিনিসগুলো একটা সুদৃশ্য বড় চামড়ার ব্যাগে ভরা। ইতিমধ্যে অপহরণকারী দলের সর্দার সুলেইমান নিজে ক্যামেরা এনে মাইকের মুখের চার-পাঁচটা ফটো তুলল। পরদিনই চলে এলো ইজমৎ খানের জাল নামে নিখুঁত পাসপোর্ট। পাসপোর্টের মালিকের পরিচয়—সে পশ্চিমপন্থী সুলতানশাহী বাহ্‌রাইনের বাসিন্দা, পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।

পরদিনই সুলেইমান আফগানকে সঙ্গে নিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে যাবে। আল-খাত্তাব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আফগানকে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। "আফগান, তুমি বেহেশ্‌তে যাচ্ছো! ইনশাল্লাহ্!"

বাগানবাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা হেঁটে তার ভাড়া করা গাড়িটার কাছে পৌঁছল আল-খাত্তাব। অভ্যেসমতো জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করে নীচু হয়ে আগে পিছে দেখল সন্দেহজনক কেউ আছে কিনা। অনেকটা দূরে একটা স্থানীয় মেয়ে, 'জিলবাব' দিয়ে চুল ও নাক মুখ ঢাকা, একটা স্কুটারকে বারবার কিক করে স্টার্ট করার চেষ্টা করছিল। আল-খাত্তাবের ভুরু বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। মেয়েদের একা স্কুটার বা গাড়ি চালিয়ে ঘোরা তার মোটেই পছন্দ নয়।

আল-খাত্তাব চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মেয়েটি তার স্কুটারে লাগানো বাস্কেটের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, বেজি নম্বর এক—বেরিয়ে পড়েছে।"

আল-খাত্তাবের পরিচয় প্রথমে মার্কিন ও পরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল তারই দোষে। মাইকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে প্রিডেটরের ক্যামেরা ওয়াইড অ্যাঙ্গলে রেখে যতটা সম্ভব বেশি এলাকা তার নজরের আওতায় আনা হয়েছিল। এতেই দেখা গেল বিন-সেলিমের সঙ্গে তার ঢাউ 'রাশা'র

BanglaBook.org

ডেকে দাঁড়িয়ে একজন সুদর্শন ডিশডাশ পরিহিত যুবক কথা বলছে। সে একবার মুখ উঁচু করে একটা উড়ন্ত বিমানের দিকে তাকালো। দৃষ্টিটা তার অজান্তে সোজাসুজি প্রিডেটরের লেন্সের দিকে পড়ল। যেহেতু বিন-সেলিমের পরিচিত লোক, সুতরাং পুরো মুখের এই ছবিটা রুটিনমাফিক কম্পিউটারের ফেস ডেটা বেসে ঢুকিয়ে সার্চ করতে দেওয়া হ'ল। এক ঘন্টা পরে কম্পিউটারে দুটো ছবি ফুটে উঠল। একটাতে জোড়া মিনার ধ্বংসের পরে ব্রিটেনবাসী এক উন্মত্ত মোল্লার বক্তৃতা শুনে সে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে ও হাততালি দিচ্ছে। অন্যটায় সে অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করছে। দ্বিতীয়টার থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাম ঠিকানা সবই জানা হয়ে গেল।

এইবার আল-খাত্তাবকে ছ'জন ব্রিটিশ এজেন্ট আলাদাভাবে অনুসরণ করা শুরু করল এবং সহজেই বাগানবাড়িতে পৌঁছে গেল। কিন্তু পরদিনই প্রিডেটরের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেল যে একটা বন্ধ ভ্যান বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। অত্যন্ত দ্রুত ইউ.এ.ই.'র স্পেশাল ফোর্সের অফিসারদের নিয়ে গিয়ে দেখা গেল ক্লীনাররা বাড়িটা পরিষ্কার করছে। জড়ো করা ময়লার মধ্যে মাথার চুল ও ছাঁটা গোঁফ দাড়ির চুল আবিষ্কৃত হ'ল। নাপিত ও দর্জিকে খুঁজে বার করতে এরপরে বেশি সময় লাগল না। দু'জনেই সাধারণ মানুষ। দু'জনেরই কাছ থেকে দীর্ঘদেহী ও বলিষ্ঠ পুরুষ, পরণে গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট এবং মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির কথা শুনে নিশ্চিত হওয়া গেল যে মাইক মার্টিন শুধু আল-কায়দার বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে তাই নয়, সে এক অজানা গন্তব্যের দিকে আল-কায়দার লোকেদের সঙ্গে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু অপারেশন স্টিংরের কি হ'ল? সে সম্বন্ধে তো কোনোই খবর নেই!

ঠিক এই সময়ে কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড ঢুকছিল সিঙ্গাপুর বন্দরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আল-কায়দার জঙ্গিদের খুঁজে বার করে ধরা যে কেন এত কঠিন, মাইক তা টের পেল সুলেইমানের সঙ্গে রওনা হওয়ার পরে। আল-কায়দার ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, এমনকি বহু উচ্চশিক্ষিত যুবক কিশোর তরুণদের শুধু যে মগজ ধোলাই করে আল্লার তথাকথিত শত্রুদের নিকেশ করার জন্য হিংস্র, উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত করা হয়, তা নয়। তাদের শেখানো হয় এইসব শয়তানের অনুচর বিধর্মী ও অশুদ্ধ মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোনো কাজ সরাসরি করতে নেই। তাদের যে কোনো কর্তব্য পালন করতে হয় অস্বাভাবিক, বাঁকাচোরা উপায়ে, শত্রুরা যাতে বুঝতেই না পারে তারা কি করতে যাচ্ছে, বা কিভাবে করতে যাচ্ছে।

রাসাল খাইমা থেকে বেরোনোর জন্য প্রত্যাশিত রাস্তা ছিল দুবাই বিমানবন্দর, নয়তো কোনো সমুদ্রবন্দর। তা যদি যেত, তাহলে সুলেইমান ও মাইককে সহজেই ধরে ফেলতো তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসা ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। তা না করে সুলেইমান ঢাকা ভ্যানটা চালিয়ে নিয়ে গেল ওমান উপসাগরে সপ্তম আমীরশাহী ফুজাইরার ছোট্ট বন্দর ডিব্বার দিকে। রুক্ষ, ন্যাড়া পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ডিব্বার দিকে নামার পথের একপাশে ভ্যানটা ছেড়ে রেখে পায়ে হেঁটে উত্তরমুখো নেমে গেল সুলেইমান। আফগানকে সে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করছিল না। দক্ষিণে ফুজাইরা সিটিতে ঢোকার রাস্তায় পুলিশ গাড়ি আটকাচ্ছিল। দুবাই থেকে সুলেইমান ও আফগানের বর্ণনা পেয়ে তারা অনেকগুলো ভ্যান থামালো, কিন্তু কোনোটাতেই ওই দু'জনের খোঁজ পাওয়া গেল না।

ডিব্বা বন্দরের আগে একটা খাঁড়িতে নুড়িভর্তি বেলাভূমির ওপর অর্ধেক উঠিয়ে একটা স্পীডবোট রাখা ছিল। এগুলোতে করে দুবাই থেকে ইরানে সিগারেট চোরাচালান করা হয়। শক্তিশালী আউটবোর্ড মোটর লাগানো এই বোটগুলো দুর্দান্ত গতিতে জল কেটে যায়। সুলেইমান আফগানকে সঙ্গে নিয়ে লম্বা, সরু স্পীডবোটের মাঝখানে উঠে বসল। তাদের দু'জনের সঙ্গেই একটা করে ব্যাগ, তাতে পাশ্চাত্য পোশাক ভরা। বোটের দুই চালক সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্ধকার নামতেই তারা বোটটাকে ঠেলে জলে নামিয়ে যাত্রা শুরু করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোটটা এত প্রচণ্ড বেগে চলা শুরু করল যে তার সামনের দিকটা জল ছেড়ে উঁচু হয়ে উঠল। আধঘণ্টার মধ্যে তারা পারস্য উপকূলে পৌঁছে গেল। সেখান থেকে বোটের মুখ ঘুরে গেল পাকিস্তানের দিকে। একমাস আগে এই পথেই 'রাশা' ঢাউতে গিয়েছিল মাইক। এখন তার দশ গুণ বেশি গতিতে জল কেটে ছুটছিল তারা। গোয়াদরের আলো দেখা যেতেই বোট থামিয়ে দু'পাশে বাঁধা তেলের

BanglaBook.org

ড্রাম তুলে দুই চালক বোটের ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিল। এরপরে গোয়াদরের দিক থেকে ঘুরল করাচির দিকে। রাত শেষ হয়ে তখন দিনের আলো ফুটে গেছে।

সারাদিন তীব্র রোদের মধ্যে একই রকম তীব্র গতিতে চলে সূর্যাস্তের সময় করাচি বন্দর ছাড়িয়ে একটা মাছ ধরা বস্তির সামনে সৈকতে তাদের নামিয়ে দিল বোট। অত্যন্ত অপ্রচলিত পথে তারা এমন জায়গায় এসে পৌঁছল যা কেউ প্রত্যাশাই করে না। আল-কায়দার তরফে নিশ্চয় এই পুরো রুটটা আগে থেকেই পরীক্ষা করার হয়ে গেছে। মাইক মনে মনে তারিফ না করে পারল না। কোনো গোয়েন্দা সংস্থা ভাবতেও পারে না যে এইভাবে কেউ সংযুক্ত আমীরশাহী থেকে পাকিস্তানে আসতে পারে।

গ্রামটায় চতুর্দিকে মাছের গন্ধ। সুলেইমান গ্রামের একটা ভাড়ার গাড়িকে খুঁজে বার করে ড্রাইভারের সঙ্গে দরাদরি করে ভাড়া ঠিক করল। গাড়িটা ঘন্টায় চল্লিশ মাইলের বেশি জোরে চলতে পারে না, তার ওপর রাস্তার অবস্থাও বেশ খারাপ। হাইওয়েতে ওঠার পরেই মাত্র গাড়িটা জোরে চলতে পারল। করাচি বিমান বন্দরে যখন পৌঁছল, তখনও রাত বেশি হয়নি।

মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে গিয়ে সুলেইমান দুটো কুয়ালালামপুরের ইকোনমি ক্লাস টিকিট কাটল। মাইক আফগানের চরিত্র অনুযায়ী বিভ্রান্ত, আনাড়ি আচরণ করতে লাগল। সে জীবনে দু'বার প্লেনে চড়েছে, দু'বারই শেকল বাঁধা কয়েদি হিসেবে আমেরিকান হারকিউলিস মালবাহী বিমানে। চেক-ইন, পাসপোর্ট কন্ট্রোল ইত্যাদি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সুলেইমান তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি কাজ করে দিতে লাগল। ইংরেজিতে যে ফর্ম ভর্তি করতে হল, তাও সুলেমানই করে দিল।

এয়ারবাস ৩৩০-এ কুয়ালালামপুর পৌঁছতে সময় লাগল ছ' ঘন্টার কিছু বেশি। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা। প্লেনে হালকা প্রাতরাশ মিলেছে। সুলেইমান এবার আন্তর্জাতিক এলাকা ছেড়ে বিমানবন্দরে ডোমেস্টিক এলাকায় ঢুকে আরো দুটো টিকিট কাটল। এরপরে টয়লেটে গিয়ে দু'জনেই পাশ্চাত্য পোশাক পরে নিল। পরণের ডিশডাশ ভরা হ'ল সঙ্গের ব্যাগে। বোর্ডিং পাস পেয়ে মাইক দেখল তারা চলেছে লাবুয়ান দ্বীপে। যদিও লাবুয়ানে অনেক পর্যটক যায়, তবুও এর আসল খ্যাতি বা কুখ্যাতি হ'ল জাহাজ হাইজ্যাকিং, চোরাকারবার, জাহাজের মাল চুরি ইত্যাদি কাজের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে। দ্বীপটা বোর্নিওর উত্তর উপকূলের কাছে, কিন্তু মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ইন্দোনেশিয়ার নয়।

বিমান ওড়ার পরে মাইক চিন্তা করল যে স্টিভ হিলের কাছে কিছু একটা খবর পাঠানো দরকার—একটা সঙ্কেত যাতে বোঝা যাবে সে ঠিক আছে এবং 'স্টিংরে' সম্ভবত কি হতে পারে। সে মৃদুস্বরে সুলেইমানকে টয়লেটে যাওয়া দরকার বলে উঠে সামনের দিকে এগোলো। ইকোনমি ক্লাসের টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাণ করল যেন দুটো টয়লেটেরই ভেতরে লোক আছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল এয়ার হোস্টেসের দেওয়া ল্যান্ডিং পাস দুটো ভরতে ব্যস্ত হয়ে আছে সুলেইমান। সে পর্দা সরিয়ে বিজনেস ক্লাসের টয়লেটের দিকে এগোতেই সামনে পড়ল আরেকজন হোস্টেস। মৃদু হেসে তার বুকপকেট থেকে একটা ল্যান্ডিং পাস আর বল পয়েন্ট পেনটা

BanglaBook.org

নিয়ে সে টয়লেটে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ল্যান্ডিং পাসের ওপর দুটো লাইন লিখে পাসটা মুড়ে কোটের সামনের বুক পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে সে দরজা খুলল। হোস্টেসকে পেনটা ফেরত দিয়ে মৃদুস্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে সে ফিরে গেল নিজের সীটে। এবার একটা সুযোগের অপেক্ষা। ভাগ্যের সহায়তাও দরকার।

সহায়তা এলো, এক মুহূর্তের জন্য। লাবুয়ান এয়ারপোর্টের বাইরে একটাও ট্যাক্সি ছিল না। খানিকক্ষণ দাঁড়ানোর পরে একটা এলো, ভেতর থেকে নামলো দুটি তরুণ, দু'জনের ইংরেজি শুনেই মাইক বুঝতে পারল তারা খাঁটি ইংরেজ। দু'জনেরই বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারা, পরণে ফুলছাপ হাওয়াইয়ান শার্ট। একজন মালয়েশিয়ান ডলার বার করে ড্রাইভারকে ভাড়া মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্যজন ডিকি খুলে তাদের লাগেজ নামাতে লাগল। মোট চারটে ঢাউস ব্যাগ—দুটো কাপড়জামা ইত্যাদি ভর্তি, অন্য দুটোতে স্কুবা ড্রাইভিংয়ের নানা সরঞ্জাম ভর্তি। ব্যাগের গায়ে একটা চেনা ব্রিটিশ ম্যাগাজিনের নাম লেখা ঃ দি স্পোর্টস ডাইভার। লাবুয়ান তার চারপাশের সমুদ্রের নীচে রঙবাহারি প্রবাল ও নানা জাতের জলজ প্রাণীর জন্য প্রসিদ্ধ। তার মানে এরা দু'জন ওই পত্রিকার তরফে ডাইভিং এবং আণ্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফি করতে এসেছিল।

যুবকটি ব্যাগগুলো নামাতে পারছিল না। সুলেইমান কিছু বলার আগেই মাইক ত্বরিত গতিতে এগিয়ে গিয়ে একটা ডাইভিং-এর কিট ব্যাগ টেনে বার করে ফুটপাথে নামিয়ে রাখল। নামাবার সময় ব্যাগের গায়ের একটা সাইড পকেটে তার বার্তা লেখা ল্যান্ডিং পাসটা ঠেসে ঢুকিয়ে দিল।

যুবকটি বলল, "থ্যাঙ্কস মেট।" তারপর দু'জনেই ব্যাগগুলো নিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেল কুয়ালালামপুরের উড়ান ধরবার জন্য।

মালয়ী ড্রাইভারকে সুলেইমান ইংরেজিতে নির্দেশ দিল বন্দরের কাছে একটা অফিসে যাওয়ার জন্য। সেইখানে মিঃ লামপং তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল—আর একজন 'তকফির'। সে তাদের নিয়ে গেল একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা ক্রুজারে। ক্রুজারটাকে দেখতে মাছধরার ট্রলারের মতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তদের নিয়ে ক্রুজার রওনা হয়ে গেল সুলু সাগরে ঢোকার মুখে অবস্থিত কুডাট দ্বীপের দিকে, ফিলিপাইন্সের জামবোয়াঙ্গা প্রদেশে—সন্ত্রাসবাদীদের লুকোনো ঘাঁটি।

ক্লান্তিকর দীর্ঘ যাত্রার পরে সুলেইমান ও আফগান দু'জনেই সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ডেকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রুজার চালাচ্ছিল আবু সাইয়াফ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর এক মাঝি। সারা রাত ধরে ক্রুজার চলল, কুডাট ছাড়িয়ে বালাবাক প্রণালীর ভেতর দিয়ে গিয়ে অদৃশ্য সীমান্ত পেরিয়ে ফিলিপাইনসের সমুদ্র সীমানায় ঢুকে পড়ল।

ইতিমধ্যে কাউন্টেস অফ রিচমণ্ডের ক্যাপ্টেন ম্যাককেন্ড্রিক তাঁর জাহাজ নিয়ে সিঙ্গাপুর ছেড়ে বেরিয়ে কোটা কিনাবালুর দিকে রওনা হয়ে গেলেন; সেখান থেকে জাহাজে উঠবে দামী কাঠ। লোডিং শেষ করে পরের দিন সন্ধেবেলাই ভারত মহাসাগরে ঢুকে পড়া যাবে। এর পরে সুরাবায়া থেকে উঠবে বহুমূল্য রেশম।

অন্যদিকে জামবোয়াঙ্গা অন্তরীপের কাছে একটা খাঁড়িতে নোঙর করা একটা জাহাজে নতুন রঙ করে গায়ে নাম লেখা হচ্ছিল। নামের শেষ অক্ষর ইংরেজি 'ডি'

BanglaBook.org

লেখা হয়ে যেতে মাচা থেকে নেমে পড়ল রঙের মিস্ত্রিরা। জাভাস্টার-এর রূপান্তর সম্পূর্ণ হ'ল। তার মাস্তুল থেকে ব্রিটিশ জাহাজী পতাকা 'রেড এনসাইন' উড়ছিল। গায়ে দু'পাশে বড় সাদা অক্ষরে লেখা 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'। ভোরবেলা তার শেষ দু'জন নাবিককে নিয়ে পৌঁছল মাছ ধরার ট্রলারের মতো দেখতে একটি ক্রুজার। এই দু'জন এবং বাকি নাবিকেরা মিলে যাবে রূপান্তরিত জাহাজের ও তাদের নিজেদের জীবনের শেষ সমুদ্রযাত্রায়।

ক্রুজার থেকে নেমে সুলেইমান ও মাইক লামপঙের সঙ্গে গিয়ে ঢুকল একটা লম্বা কাঠের তৈরি ক্যাবিনে। তীর থেকে কিছুটা দূরে অগভীর জলের মধ্যে মোটা কাঠের খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাবিনটা। তিন-চারটে ঘর, স্টিংরে অথবা আল-ইসরা সন্ত্রাসবাদী অভিযানের সদস্যদের শোয়া-খাওয়ার জায়গা। মাইক তথা আফগানের সঙ্গে বাকিদের আলাপ করিয়ে দিল লামপঙ। প্রতিটি লোকের আলাদা আলাদা কাজ। ইঞ্জিনীয়ার, কম্পাস ও চার্টের সাহায্যে পথ ঠিক রাখার জন্য ন্যাভিগেটর এবং বেতার যন্ত্রচালক বা রেডিও অপারেটর—এই তিনজনই ইন্দোনেশীয় ওয়াহাবি মুসলমান। সুলেইমানের কাছ থেকে এতক্ষণে সে জানতে পারল যে তার দক্ষতা ফিল্ম ও ভিডিও ফটোগ্রাফি। শহীদ হওয়ার আগে সে তার ডিজিটাল ক্যামেরায় আল-ইসরার চরম মুহূর্তগুলো সব রেকর্ড করবে। ছবিগুলো সেই একই সময়ে তার ল্যাপটপ কম্পিউটার ও স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে চলে যাবে আল-জাজিরা টিভি স্টেশনে—পুরো ঘটনা সারা পৃথিবী টেলিভিশনে দেখতে পাবে—'লাইভ'!

পঞ্চমজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক, বয়স বড়জোর আঠারো। সে সুলেইমানের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছিল। তার কথার টান শুনে মাইক বুঝল তার জন্ম ও পড়াশোনা লীডস/ব্র্যাডফোর্ড অঞ্চলে। তার কাজ কি তা মাইক বুঝতে পারল না—হয়তো রাঁধুনি। ষষ্ঠজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, বিস্ফোরক বিশারদ। কিন্তু ঠিক কি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে, এবং লক্ষ্য বস্তুটাই বা কি, সে সম্বন্ধে মাইক বিন্দুবিসর্গও ধারণা করতে পারল না।

আটজনের দলে বাকি রইল মাইক নিজে এবং অভিযানের নেতা। শেষ দল তখনো এসে পৌঁছয়নি। তার পরিচয়ও কেউ জানে না। ইতিমধ্যে মাইক ও সুলেইমানের জন্য এলো ঢিলে ট্রাউজার্স, সুতীর ফুলছাপ জামা ও স্থানীয় স্যাণ্ডালস। দু'জনেই পশ্চিমী স্যুট ছেড়ে এই পোশাক পরে নিল। মাছের তরকারি ও ভাত দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে মাইক ক্যাবিনের টানা বারান্দায় বসে সমুদ্রকে লক্ষ্য করতে লাগল। তখনো পর্যন্ত তার কোনো স্পষ্ট ধারণা হয়নি।

ড্রাইভার ছেলে দুটি হীথরো বিমানবন্দরে নামার পরে একজন কাস্টমস্ অফিসার তাদের ব্যাগগুলো খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। যদিও দুই ড্রাইভারই 'নাথিং টু ডিক্লেয়ার' বলে বেরিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু এই অফিসারটি অতিরিক্ত মাত্রায় হুঁশিয়ার হওয়ায় তাদের থামিয়ে ব্যাগ সার্চ করছিল।

ভাগ্য আরো একবার সহায়তা করল। বড় কিট ব্যাগ দুটোর ভেতরে খোঁজা হয়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার পরে অফিসারটি প্রথম সাইড পকেটে হাত ঢোকাতেই দু'পাট মোড়া ল্যান্ডিং কার্ডটা তার হাতে উঠে এলো। "এটা আপনি কোথা থেকে পেলেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

ড্রাইভারটি সত্যিই অবাক হয়ে গেল। "জানি না তো। আমি এটা কখনো দেখিনি।"

পাশ থেকে আর একজন কাস্টমস অফিসার এগিয়ে এসে কার্ডটা হাতে নিল। কার্ডের পেছনের লেখাটা পড়েই সে কাছে একটা ঘরে ঢুকে ব্রিটিশ এম.আই.৫ গুপ্তচর সংস্থার অফিসারকে সেটা দেখাল। পরমুহূর্তেই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা ছুটে এসে দু'জন ড্রাইভারকে মালপত্রসহ টেনে নিয়ে গেল আর একটা ঘরে। এম.আই. ৫-এর অফিসারটি কার্ডের সংক্ষিপ্ত বার্তাটা পড়ে তার মধ্যে দেওয়া ফোন নম্বরটা ডায়াল করল। নম্বরটা স্টিভ হিলের। অফিসারটি নিজের পরিচয় দিয়ে হিলকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, 'ক্রোবার' বললে আপনি কিছু বোঝেন?"

স্টিভ হিল সাংঘাতিক চমকে উঠে বলল, "আমি এখুনি যাচ্ছি।"

হীথরোতে ঘণ্টা দুয়েক দু'জন ড্রাইভারকে জেরা করে হিল বুঝতে পারল ছেলে দুটো সত্যিই কিছু জানে না। হঠাৎ তাদের একজন বলল, "মার্ক, লাবুয়ান এয়ারপোর্টে সেই আরব মার্কা চেহারার লোকটাকে মনে পড়ছে? আমার ব্যাগটা নামিয়ে দিল?

"কোন আরবমার্কা চেহারার লোক?" হিল জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটি চেহারার যা বর্ণনা দিল তা দুবাইয়ের দর্জির দেওয়া চেহারা ও পোশাকের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। নিঃসন্দেহে ক্রোবারই কার্ডটা ব্যাগের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে ছেলে দুটোকে ছেড়ে দিল। তারপর প্রথমে মারেক গুমিনিকে ও তার পরে এডজেল ঘাঁটিতে গর্ডন ফিলিপস্‌কে ফোন করে যে কার্ডে লেখা সংক্ষিপ্ত বার্তাটা পড়ে শোনাল ঃ 'যদি তুমি তোমার দেশকে ভালবাসো, তাহলে বাড়ি পৌঁছেই এই নম্বরটায় ফোন করো। (এর পরে স্টিভ হিলের অফিসের ফোন নম্বর) ওদের বলো যে ক্রোবার বলছে ব্যাপারটা কোনো একটা জাহাজ দিয়ে করা হবে।'

"সমস্ত কাজ বন্ধ রাখো," হিল ফিলিপস্‌কে বলল। "সারা দুনিয়া জুড়ে খোঁজ লাগাও—একটা কোনো জাহাজ হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে কিনা খবর নাও।"

'জাভা স্টার'-এর ক্যাপ্টেন হেরমানের মতোই 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-এর ক্যাপ্টেন ম্যাককেন্ড্রিকও তাঁর জাহাজকে বিভিন্ন দ্বীপের মাঝের খাঁড়ি দিয়ে সেলেবিস সাগরের মুখে এনে হাজির করলেন। লামপঙ-এর নেতৃত্বে দুটো স্পীডবোটে দশজন জলদস্যু একইভাবে জাহাজের পাশে এসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব ক'জন নাবিককে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলল। সবশেষে লামপঙ নিজে গুলি চালাল ক্যাপ্টেনের ওপর। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত দেহগুলো ছুঁড়ে ফেলা হ'ল সমুদ্রে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রক্তের গন্ধে পাগল হাঙরের দল মহাভোজ শুরু করে দিল।

আবু সাইয়াফ গোষ্ঠীর জলদস্যুরা এর আগে অনেক জাহাজ ডুবিয়েছে। তারা দ্রুত ডেক থেকে নীচে নেমে সীকক্‌গুলো খুলে দিল। তারপরেই ক্ষিপ্র পায়ে ডেকে উঠে

BanglaBook.org

ঝটপট নেমে গেল তাদের স্পীড বোটে। একশো গজ দূরে সরে গিয়ে তারা লক্ষ্য রাখল—পনেরো মিনিটের মধ্যে উন্মুক্ত সমুদ্রের জল ঢুকে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' সেলেবিস সাগরের অতলে তলিয়ে গেল।

ফিলিপাইনসের খাঁড়িতে ক্যাবিনের স্যাটেলাইট ফোনে লামপঙের ফোন এলো। এবার রওনা হতে হবে। মাছ ধরা ট্রলারের ছদ্মবেশী ক্রুজার তাদের নিয়ে দু'পাশে জঙ্গলে ঢাকা খাঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। মাইক তার চারপাশের লোকেদের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রতিটি মুখে স্পষ্ট ঈর্ষা। তারা সাতজন কত সৌভাগ্যবান—আল্লার জিহাদে শহীদ হওয়ার জন্য তারা নির্বাচিত হয়েছে! সে এর আগে কখনো এত কাছ থেকে এতজন আত্মঘাতী জঙ্গিকে দেখেনি। মানুষের প্রতি কি প্রচণ্ড, সাংঘাতিক ঘৃণা থাকলে তথাকথিত বিধর্মী কাফেরদের হত্যা করে নিজেও মরে যাওয়াকে পরম পুণ্য বলে এতগুলো মানুষ মনেপ্রাণে একান্তভাবে বিশ্বাস করতে পারে, তা ভেবে মাইক মনে মনে শিউরে উঠল। সে ফিরে দেখল তার ছ'জন সঙ্গীকে। প্রত্যেকের মুখে একটা পরম তৃপ্তি ও সন্তোষ ছেয়ে আছে। প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লার আশীর্বাদধন্য বলে বিশ্বাস করে।

কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখা গেল উন্মুক্ত সমুদ্রে পড়ার ঠিক আগে একটা জাহাজ নোঙর করা রয়েছে, তার গায়ে লেখা 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'—রূপান্তরিত 'জাভা স্টার'। এক এক করে 'আল-ইসরা'-র জন্য বলিপ্রদত্ত সাতজন ক্রুজার থেকে নেমে মই বেয়ে মালবাহী জাহাজটাতেও উঠে গেল। ডেকের ওপর ছ'টা ইস্পাতের বাক্সে ডেক-কার্গো সাজানো রয়েছে। ক্ষণিকের জন্য মাইক ভাবল লাফিয়ে তীরে নেমে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে কিনা। পরক্ষণেই চিন্তাটাকে ঠেলে মন থেকে সরিয়ে দিল সে—সে নিরস্ত্র, তার ওপর জঙ্গলটা তার পুরোই অচেনা, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এই খুনীর দল তাকে ধরে ফেলবে। তারপরে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার হবে তার ওপর, তা অকল্পনীয়। 'অপারেশন ক্রোবার' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। না, তাকে পরে অন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ডেকে ওঠার পরে অভিযানের নেতার দেখা মিলল। তাকে দেখা মাত্রই মাইক চিনতে পারল। ফোর্বস দুর্গে ম্যাকডোনাল্ড তাকে যে সব প্রথম শ্রেণীর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীদের ছবি দেখিয়েছিল, তার মধ্যে এই লোকটির ছবি ছিল তো বটেই, উপরন্তু এর ছবির কোণে পাঁচটি তারকা চিহ্ন দেওয়া ছিল। লোকটা বেঁটে এবং বলিষ্ঠ। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে লড়াই করার সময় কুখ্যাত আল-কায়দা কম্যাণ্ডার মুসাবাল জারকোয়াই-এর প্রধান সহকারী ছিল এই ইউসুফ ইব্রাহিম। যুদ্ধের সময় এর বাঁহাতে কামানের গোলার অনেকগুলো টুকরো বিঁধে গিয়েছিল। অপারেশন করা সম্ভব হয়নি, ফলে হাতটা অকেজো হয়ে শুকিয়ে গেছে। এর সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতার কাহিনী মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানে সুবিদিত।

'ও কি ইজমৎ খানকে চিনতো?' মাইকের এক মুহূর্তের জন্য শ্বাসরোধ হয়ে গেল। তারপরেই সোজাসুজি ইব্রাহিমের ক্রুর চাউনি ফিরিয়ে দিয়ে সে 'সালাম আলেইকুম' বলে এগিয়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আল-জাজিরা টিভিতে প্রদর্শিত

BanglaBook.org

একটা ভিডিও রেকর্ডিং—'কারবালার কসাই' নামে খ্যাত ইউসুফ ইব্রাহিম ক্যামেরার সামনে পরপর তিনজন রাশিয়ান সৈনিকের মাথা কেটে ফেলছে মাংস কাটা চপার দিয়ে। গত কুড়ি বছর ধরে ইব্রাহিম ঠাণ্ডা মাথায় নিজের হাতে কত লোককে হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। লোকটা স্বভাব-খুনী—মানুষ মারতে ভালবাসে।

রূপান্তরিত 'জাভা স্টার' সেলেবিস সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল—কাউন্টেস অফ রিচমণ্ডেরও এই পথ ধরেই যাওয়ার কথা ছিল। মাইককে কাজ দেওয়া হ'ল ইন্দোনেশিয়ান সারেংকে জাহাজ চালাতে সহায়তা করা। পাকিস্তানি-ব্রিটিশ ছেলেটার কাজ নানারকম—তার মধ্যে একটা ছিল, দরকার পরে বেতারে লিয়াম ম্যানকেস্ট্রিকের কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী নকল করে কথা বলা, যাতে শ্রোতার মনে জাল কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড সম্পর্কে কোনো সন্দেহ না জন্মায়। বাকি দুই ইন্দোনেশীয়র একজন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যতম রেডিও অপারেটর। দু'জন আরবের একজন সুলেইমান—আল-ইসরার ধ্বংসলীলার ছবি আল-জাজিরার মাধ্যমে প্রদর্শন করে সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেওয়া তার কাজ। দ্বিতীয় আরবটি রসায়নবিদ তথা বিস্ফোরক বিশারদ।

আর এই সাতজনের ওপর ঈগল চক্ষু মেলে সদা সর্বদা প্রহরায় ছিল ইউসুফ ইব্রাহিম—সে নিজেকে ছাড়া দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ত্রিনিদাদের বন্দরের কাছে একটা তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা পানশালায় দু'জন মার্চেন্ট নেভির নাবিক খুন হয়ে গেল। যতক্ষণে খবর পেয়ে পুলিশ এলো, ততক্ষণে পানশালার পনেরো-ষোলো জন প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যেকেরই স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে, তারা কেউই কিছু মনে করতে পারল না। দু-তিনজন শুধু এইটুকু বলল যে মোট পাঁচজন মিলে নাবিক দু'জনকে আক্রমণ করেছিল এবং তারা স্থানীয় গুণ্ডা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

বন্দরে নোঙর করে থাকা ভেনেজুয়েলার মাঝারি ট্যাঙ্কার 'ডোনা মারিয়া'-র ক্যাপ্টেন হঠাৎ দু'জন নাবিককে হারিয়ে মুশকিলে পড়ে গেল। জাহাজ ফের রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে, এক্ষনি দু'জন লোক নিয়োগ করা দরকার। তার স্থানীয় এজেন্ট দু'জন ভারতীয় মুসলিম নাবিককে খুঁজে বার করে নিয়ে এলো।

ক্যাপ্টেন পাবলো মন্টালবানের ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষ একটি হিন্দু দেশ। সে দেশের বেশ কয়েক কোটি বাসিন্দা যে মুসলমান—এবং তাদেরও মধ্যে বেশ কিছু লোক আল-কায়দার সহযোগী ইসলামী চরমপন্থী সংস্থার সদস্য—সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। দু'জনেরই নিখুঁত মার্চেন্ট নেভির সার্টিফিকেট আছে দেখে ক্যাপ্টেন তাদের জাহাজে তুলে নিল।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক থেকে চাক হেমিংওয়ে এবং লণ্ডন থেকে স্যাম সেমুর নামে দুই সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ যুবককে এডজেলে ডেকে এনে স্টিভ হিল পুরো ব্যাপারটা তাদের জানিয়ে আলোচনায় বসল। দুই যুবকেরই সন্ত্রাসবিরোধী কাজ করার অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। হিল তাদের বারো ঘণ্টা সময় দিল—তার মধ্যে ক্রোবারের পাঠানো বার্তা অনুযায়ী একটা পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে, যাতে দুর্বৃত্ত জাহাজটাকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের ঢের আগেই গুমিনি, হিল, ম্যাকডোনাল্ড ও ফিলিপসের কাছে হেমিংওয়ে ও সেমুর নিজেদের নোটস্ নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা সমস্বরে বলল যে কাজটা বিশাল খড়ের গাদা থেকে একটা মাত্র ছুঁচ খুঁজে বার করার চাইতেও কঠিন, কারণ পৃথিবীর সাত সমুদ্র জুড়ে কয়েক হাজার নানা জাতের ও নানা আয়তনের বাণিজ্য জাহাজ সব সময় ঘুরে বেড়ায়। তার ওপর যে জাহাজটাকে খুঁজে বার করার কথা ভাবা হচ্ছে, তার আয়তন, মাল বহনের ক্ষমতা, পুরোনো না নতুন, কোন্ দেশের জাহাজ, তার টাইপই বা কি এসব কোনো তথ্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও নেই। সুতরাং

BanglaBook.org

পরের পর জাহাজে সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে উঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা ছাড়া উপায় নেই। এই বিশাল কাজ করতে গেলে অন্য সমস্ত দেশের সরকার ও সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

কিন্তু এই কাজ এলোপাথাড়িভাবে শুরু করার আগে বুঝে নেওয়া দরকার, আল-কায়দা কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে আঘাত হানতে পারে। কারণ 'আল-ইসরা' দিয়ে আল-কায়দা নিঃসন্দেহে জোড়া মিনার ধ্বংসের বীভৎসতাকে ছাপিয়ে যেতে চাইছে। জোড়া মিনার ধ্বংসের ফলে প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আমেরিকা। এবারের আক্রমণের লক্ষ্য মনে হয় সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়া, হয়তো বা প্রাচ্যও। ওসামা-বিন-লাদেন সম্প্রতি বিবৃতি দিয়েছিল যে পাশ্চাত্য জগতের চরম অর্থনৈতিক ক্ষতি করাই তার প্রধান লক্ষ্য।

"তাহলে কি কি সম্ভাবনার কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে?" মারেক গুমিনি জিজ্ঞেস করল। "সেগুলো রুখতে যা করার তা আমরা করবো।"

হেমিংওয়ে বলল, "প্রথমত আল-কায়দা কোনো একটা সুপার ট্যাঙ্কার জাতীয় বিরাট বড় জাহাজকে প্রধান বাণিজ্যিক পথের মাঝপথে বোমা মেরে ডুবিয়ে দিতে পারে। তীরের কাছাকাছি কোনো জায়গায় যদি বিশাল জাহাজটা ডোবে, তাহলে তার ধ্বংসস্তূপ সরাতে বেশ কয়েক মাস লেগে যাবে। এর ফলে বাকি সব জাহাজ হয় আটকে থাকবে, নয়তো তাদের অনেক ঘুরপথে যেতে হবে। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার কোটি ডলার ক্ষতি হয়ে যাবে, যা সামলানো মুশকিল। এর থেকে বাঁচতে হলে সৈন্য ভর্তি দ্রুতগামী যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এই ধরনের জাহাজগুলোতে হানা দিতে হবে। যদি জাহাজটা আতঙ্কবাদীদের আয়ত্তে থাকে, তাহলে গুলির লড়াই অনিবার্য। তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো দুর্বৃত্ত জাহাজ কোন্‌টা।"

"দ্বিতীয় সম্ভাবনা", এবার সেমুর বলা শুরু করলো, "বিস্ফোরক বোঝাই জাহাজ নিয়ে কোনো বড়, ব্যস্ত বন্দরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তীরের একদম কাছে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে ওরা। ব্যাপারটা সাংঘাতিক, কত লোক যে মরবে তা ভাবা যায় না। ১৯১৭ সালে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স বন্দরে দাঁড়ানো একটা গোলাবারুদ ভর্তি জাহাজ বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল। পুরো হ্যালিফ্যাক্স বন্দর এবং শহরটাও এই বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল। একটি লোকও বাঁচেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এইটাই সবচেয়ে বড় অ-আণবিক বিস্ফোরণ! আল-কায়দা অনেক উন্নতমানের আধুনিক বিস্ফোরক ব্যবহার করবে—ক্ষতিকর পরিমাণ যে কোন পর্যায়ে পৌঁছবে তা অনুমান করাও অসম্ভব।"

BanglaBook.org

ইজমৎ খান তার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠোনে পায়চারি করার সময় সকাল বিকেল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। খোলা উন্মুক্ত জায়গায় স্বাধীন জীবনের জন্য তার মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠতো। সারাদিন ধরেই ওপর দিয়ে

নানা দেশের নানা বিমান উড়ে যেত এদিকে ওদিকে। সবই যেত অনেক উঁচু দিয়ে। কেবল একটা শ্রেণীর বিমান ছাড়া। এগুলো উড়ে যেত খুব নীচু দিয়ে, বিশেষ করে যখন উত্তরদিকে যেত। এই বিমানগুলোর গায়ে একটা পতাকা আঁকা—সাদা জমির ওপর একটা খাঁজ কাটা লাল পাতা। তার মানে, ইজমৎ খান বুঝে গিয়েছিল, কিছু দূরেই উত্তরদিকে আর একটা দেশ আছে। যদি কোনোদিন, কোনোরকমে এই জেলখানা থেকে সে পালাতে পারে, তাহলে তাকে যেতে হবে উত্তরদিকে। কয়েক দিন পরেই তার কাছে সেই সুযোগ এসে গেল।

অ্যারিজোনা রাজ্যের এক বিমানঘাঁটি থেকে দুই অভিজ্ঞ বৈমানিক একটা আমেরিকান এফ-১৫ ঈগল ফাইটার বিমান উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওয়াশিংটন রাজ্যের একটা সামরিক বিমানঘাঁটিতে। যুদ্ধ বিমানটায় অ্যারিজোনার ঘাঁটিতে কিছু জরুরী সারাই ও দুটো শক্তিশালী ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ বদল ইত্যাদি করা হয়েছিল। দুই বৈমানিক বিমানটা নিয়ে পরীক্ষামূলক উড়ানে যাচ্ছিল। ওয়াশিংটন রাজ্যের আকাশ সীমানা পেরোনোর পর দেখা গেল জমাট ঘন মেঘে চারদিক ঢেকে আছে। তারা উড়ছিল ২৪০০০ ফুট উঁচুতে, সেখানে সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোক। কিন্তু নীচে শুধু থরে থরে মেঘ, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কোনো একটা যন্ত্রাংশ ডানদিকের ইঞ্জিনের মধ্যে আলগা হয়ে খসে গিয়ে সজোরে ইঞ্জিনের দ্রুত ঘূর্ণায়মান টার্বোফ্যানে আঘাত হানলো। পরমুহূর্তেই ঘটলো বিস্ফোরণ। আগুন জ্বলে গেল ডানদিকের ইঞ্জিনে। কয়েক মুহূর্ত পরে বাঁদিকের ইঞ্জিনটাতেও আগুন ধরে গেল। দুই বৈমানিক বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে 'মে ডে' দুর্ঘটনা সিগন্যাল পাঠিয়ে প্যারাশুটে করে শূন্যে ঝাঁপ দিল। বিমানটা গোঁত্তা খেয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। মেঘের স্তরের মধ্যে ঢোকার পরেই আরো একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়ে বিমানটা দু' টুকরো হয়ে গেল। দুটো জ্বলন্ত ইঞ্জিন ছিটকে গেল দু'দিকে। একটা পড়ল ক্যাসকেড্‌সের জঙ্গলের মধ্যে। প্রায় কুড়ি-বাইশটা গাছ ধ্বংস হয়ে গেল। অন্যটা গিয়ে পড়ল একটা ক্যাবিনের ওপর, সেখান থেকে ঠোকর খেয়ে ছিটকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

এই ক্যাবিনেরই একটা অংশে বন্দী হয়েছিল ইজমৎ খান। ক্যাবিনটার অনেকটা অংশ পড়ন্ত ইঞ্জিনের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একদিকের উঁচু পাঁচিলটার চিহ্নমাত্র রইল না, কারণ ইঞ্জিনটা এসে ঠোকর খেয়েছিল পাঁচিলটাতেই। যে ক'জন আমেরিকান সেনা পাহারায় ছিল, তারা সকলেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, দু'জন আহত। জ্ঞান ফিরে আসার পর তারা দেখল বন্দী আফগান পালিয়েছে!

BanglaBook.org

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত ও শক্তিশালী আটটি দেশের প্রধানমন্ত্রী; রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের সম্মেলন 'জি-এইট কনফারেন্স' আর কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে

এই আটটি সরকারের প্রধান প্রতিনিধিদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশে সারা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণ করে। এবারের সম্মেলন হবে আমেরিকায়।

সাতটি দেশের প্রধান রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁদের প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে একে একে নিজস্ব বিমানে নিউইয়র্কে জে.এফ.কে. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরে মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের স্বাগত জানাবেন। তারপরে সাতটি আলাদা বিশাল সামরিক 'চপার' হেলিকপ্টারে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে সম্মেলনের অনুষ্ঠান স্থলে। অষ্টম দেশটি, বলা বাহুল্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আটটি দেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনের পাঁচদিন থাকবেন কঠোর নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে। তাদের সব রকম সুযোগ সুবিধে ও গোপনীয়তা রক্ষার ভার অবশ্যই মার্কিন-সরকারের। জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান জন নিগ্রোপন্টের কাছে এ ব্যাপারে তাঁর অধীন সমস্ত দপ্তরগুলিতে কড়া নির্দেশ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তরগুলো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে 'অপারেশন স্টিংরে'-র লক্ষ্যবস্তু নিঃসন্দেহে আমেরিকা। 'ক্রোবার'-এর সংক্ষিপ্ত বার্তায় এটুকু জানা গেছে যে 'আল-ইসরা' সংঘটিত করার চেষ্টা হবে একটা জাহাজের মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞতা বলছে যে জাহাজটা নিশ্চিতভাবেই নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে বা পাল্টে ফেলেছে। এছাড়া ক্রোবার যেহেতু লাবুয়ান বিমানবন্দর থেকে বার্তা পাঠিয়েছে, সুতরাং এই ভুতুড়ে, দুর্বৃত্ত জাহাজটাও ছোট্ট, প্রায় অজানা দ্বীপ লাবুয়ানেরই আশেপাশে কোথাও থেকে রওনা হচ্ছে, বা হয়তো ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে।

সুতরাং আমেরিকান বিশাল বহর, যুদ্ধজাহাজ ও উপকূল রক্ষীবাহিনী একদিকে সমগ্র উত্তর আমেরিকা মহাদেশের গোটা পশ্চিম উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডর পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে সমানে অনুসন্ধান চালাতে লাগল। অন্যদিকে সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালীর ওপরেও তীক্ষ্ণ নজর জারি রইল, কারণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল বোঝাই সুপার ট্যাঙ্কারগুলো ভূমধ্যসাগর দিয়েই যাতায়াত করে। যে কোনো একটা এরকম বৃহৎ জাহাজ উড়িয়ে দিয়ে বাণিজ্যপথ রুদ্ধ করে দিলে সুবিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে আমেরিকাকে।

পৃথিবীর সমস্ত বড় সমুদ্র বন্দরগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হ'ল। ভারত মহাসাগরে টহলরত মার্কিন নৌবহর ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। সমস্ত জাহাজ ও বিমানকে একটাই স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হ'ল—নজরদারি জারি রাখো, প্রতিটি জাহাজের কাছে পরিচয়পত্র দাবি করো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সত্যতা যাচাই করো। যে কোনো জাহাজের গতিবিধি বা তার দেওয়া তথ্য সন্দেহজনক মনে হলেই তাকে আটকাও এবং সৈন্যদল নিয়ে তাতে চড়ে তার প্রতিটি ইঞ্চি চেক করো। সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে যেমন প্রত্যাশিত, সে রকম সশস্ত্র প্রতিরোধ যদি আসে, দ্বিধা না করে সে জাহাজকে সমুদ্রেই রকেট মেরে উড়িয়ে দাও।

একই সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের ওপর ভূসমলয় কক্ষে অবস্থিত কে.এইচ-১১ কৃত্রিম

BanglaBook.org

উপগ্রহের কম্পিউটার চালিত ক্যামেরা লাবুয়ান দ্বীপের তিনশো মাইল ব্যাসের মধ্যে ভাসমান বা নোঙর ফেলা প্রতিটি বাণিজ্যতরীর ফটো তোলা শুরু করল। প্রতিটি জাহাজের নাম রেকর্ড করে তার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য খুঁজে বার করার কাজও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এই কাজটা শুরু হতে একটু দেরি হয়ে গেল। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন ফটো তোলা শুরু করল, তখন জাল 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' লাবুয়ান থেকে ঠিক তিনশো দশ মাইল দূরে, দক্ষিণে মাকাসার প্রণালী দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কম্পিউটারকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়, তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। ফলে নির্দেশিত তিনশো মাইল ব্যাসের মাত্র দশ মাইল দূরে থাকা 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-এর কোনো ছবি তোলা হ'ল না।

অবশ্য ছবি উঠলেও যে খুব একটা লাভ হ'ত, তা নয়। কারণ লয়েডসের রেজিস্টারে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-এর আয়তন, গতিপথ ইত্যাদি সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য রেকর্ড করা ছিল, তার কোনোটারই সঙ্গে জাল জাহাজের কোনো তফাৎ ছিল না। 'আফগান' মাইক মার্টিন জাহাজে সব কিছুর ওপরেই নজর রাখছিল, সে কিন্তু কিছুতেই জানতে পারল না জাহাজ ঠিক কোথায় যাচ্ছে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, ঠিক কি বিস্ফোরক বোঝাই আছে জাহাজে। এ কথা জানা তার পক্ষে সম্ভবও নয়, কারণ দুটো তথ্যই জানে কেবলমাত্র ইব্রাহিম। ইন্দোনেশীয় কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার দ্বিতীয় ব্যাপারটা সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিবহাল, কিন্তু সে কিছুতেই মুখ খুলছে না।

মাইকের কাছে একটাই রাস্তা খোলা ছিল—কোনমতে লুকিয়ে রেডিওরুমে ঢুকে জাহাজের নামটা স্টিভ হিলকে জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু ইন্দোনেশীয় রেডিও অপারেটার অথবা সুলেইমান সব সময় বেতার যন্ত্রটা আগলাতো। সুতরাং মাইক ইন্দোনেশীয় সারেঙের সঙ্গে মিলে জাহাজ চালাতে লাগল। শিগগিরই জাহাজের মুখ ঘুরলো পশ্চিমে, গন্তব্য আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ—হুবহু মৃত ক্যাপ্টেন ম্যাককেন্ড্রিক নির্দেশিত গতিপথ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ইজমৎ খান পালিয়েছে বোঝার পরে ক্যাবিনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ্য করলো। তার সঙ্গী সৈনিকদের মধ্যে দু'জন নিহত, আহত তিনজন। সে একা অক্ষত অবস্থায় রেহাই পেয়েছে। সে প্রথমেই বেতার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল। সৌভাগ্যক্রমে সেটা ঠিক ছিল। দরকার হলে যোগাযোগ করার জন্য তার কাছে একটাই আমেরিকার ফোন নম্বর ছিল, সেটা মারেক গুমিনির। ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে তখন বিকেল চারটে।

ফোন পেয়ে গুমিনি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অফিসারটিকে নির্দেশ দিল নিকটবর্তী মাজামা টাউনের শেরিফের সঙ্গে কথা বলে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। "আফগানকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না," সে বলল, ও ব্যাপারটা আমি দেখছি।" এরপরে পেন্টাগনে ফোন করে সে কানাডা সীমান্তের কাছে ম্যাক্‌কর্ড ঘাঁটি থেকে এক প্ল্যাটুন সৈন্য চাইল। বলতে ভুলল না যে তারা যেন শূন্য ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রায় বরফে ঢাকা অরণ্যাঞ্চলে পলাতক আসামীকে তাড়া করে ধরার কাজে অভিজ্ঞ হয়।

ম্যাক্‌কর্ড ঘাঁটির বিশেষজ্ঞ সেনাদলটি তখন প্রায় একশো মাইল দূরে অ্যাডভান্সড ট্রেনিং-এ ব্যস্ত ছিল। পেন্টাগনের নির্দেশে অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন মাইকেল লিনেটের অধীন প্ল্যাটুনটিকে হেলিকপ্টারে করে মাজামায় উড়িয়ে আনা হ'ল। তারা মাউন্ট রেইনার ন্যাশনাল পার্কের পার্বত্য অঞ্চলে পলাতক সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বার করার ট্রেনিংই নিচ্ছিল। ফলে তাদের কাছে সব রকম উপকরণই মজুত ছিল।

মাজামায় পৌঁছে লিনেট দেখল চতুর্দিকে বরফে ঢাকা, ঘন মেঘ নেমে এসেছে প্রায় গাছগুলোর মাথায়। বিধ্বস্ত ক্যাবিনের অফিসারটি তাকে ফোনে জানাল যে পলাতক সন্ত্রাসবাদী একজন পার্বত্য আফগান, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী, অদম্য তার মনোবল। তার পরণে কিন্তু এই উত্তর মেরুসুলভ আবহাওয়ায় বাইরে থাকার মতো পোশাক নেই। সে পরে আছে শুধু গরম জ্যাকেট ও ট্রাউজার্স এবং হাইকিং বুট। লিনেটের আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল। সে ইজমৎ খানের মতো যোদ্ধা আফগানদের মনোবলের সঙ্গে ভালই পরিচিত ছিল। আর দেরি না করে সে তার সৈন্যদের নিয়ে একটা ট্রাকে চড়ে যত দ্রুত সম্ভব প্যাসেটেন অরণ্যাঞ্চলের কাছে হার্টস গিরিপথে পৌঁছে গেল। এরপর আর গাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। হেলিকপ্টারও এত ঘন মেঘের মধ্যে উড়তে পারবে না। সুতরাং তারা উপযুক্ত পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্কি করে বরফে আকীর্ণ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগোতে শুরু করল। যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন ভেঙে পড়ার পর থেকে ততক্ষণে প্রায় পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে।

পলাতক আসামীকে ধরতে পারার ব্যাপারে লিনেটের মনে আদৌ কোনো সংশয় ছিল না। লোকটার সঙ্গে কম্পাস নেই, ফলে সে রাস্তা হারিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে বাধ্য। তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে জমে যাবে বরফের মধ্যে। কিন্তু

BanglaBook.org

একটা কথা সে হিসেবের মধ্যে রাখেনি—ইজমৎ খানের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে বিপদের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করার সামর্থ্যের সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কি করে এগিয়েও বিধ্বস্ত ক্যাবিনে পৌঁছতে তাদের এক ঘন্টা লাগল। আকাশে ঘন কালো মেঘের স্তূপ মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে। মাজামা থেকে উদ্ধারকারী দলটি তাদের কিছু আগেই এসে পৌঁছেছে। ক্যাবিনের মূল প্রবেশ পথের সামনে তুষারের ওপর এলোমেলো অনেকগুলো তুষার জুতোর সোলের ছাপ। কিন্তু ভাঙা পাঁচিল থেকে একটা মাত্র জুতোর ছাপ এগিয়ে গেছে উত্তরে। ওদিকে কানাডা সীমান্ত, বাইশ মাইল দূরে। এই আবহাওয়ায় বরফের মধ্যে দিয়ে অন্তত ৪৪-৪৫ ঘন্টা হাঁটলে তবেই সীমান্তে পৌঁছনো সম্ভব। লিনেট মুচকি হাসলো।.ঠিক যে দিকটায় লোকটার না যাওয়া উচিত ছিল, সেই দিকেই গেছে! দশ মাইলও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ, তার আগেই ঠাণ্ডায় জমে মারা পড়বে। কিন্তু তাই বলে ছেড়ে দেওয়া চলবে না, মৃতদেহ থাকলে সেটাই নিয়ে ফিরতে হবে।

এবারে বন্ধুর পাহাড়ি পথ, স্কি চলবে না। সেগুলো পিঠে বেঁধে তুষার বুট পরে দ্রুত হেঁটে রওনা হ'ল লিনেট ও তার প্ল্যাটুন, সাঙ্কেতিক নাম 'টিম আলফা'। এক ঘন্টা পরে, এক মাইল অতিক্রম করার পর তারা এসে হাজির হ'ল আর একটা ক্যাবিনের সামনে। প্যাসেটেন অরণ্যাঞ্চলে এই ধরনের হান্টিং ক্যাবিন তৈরি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তিন-চারটে ক্যাবিন এখনো রয়ে গেছে। এগুলো বিধিনিষেধ জারি হওয়ার আগে তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার এগুলো ভাঙেনি। উদ্যত বন্দুক হাতে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল একটা জানালার শার্সি ভাঙা। তার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকে লিনেট দেখল কোনো কিছু ভাঙাচোরা হয়নি, কিন্তু অনধিকার প্রবেশকারী—নিঃসন্দেহে পলাতক আফগান—সব কিছু ঘেঁটে দেখেছে।

মাজামার শেরিফকে ফোন করে জানা গেল, ক্যাবিনের মালিক এক শল্য চিকিৎসক, থাকে সিঅ্যাট্‌লে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটায়। অল্প স্বল্প শিকার করার পর শীত পড়ার আগেই ক্যাবিন বন্ধ করে ফিরে যায়। তাকে ফোন করে বোঝা গেল একজোড়া তুষার জুতো, মোটা পশমের প্যান্ট, ভারি জ্যাকেট সব শোবার ঘরের ওয়ার্ডরোব থেকে চুরি হয়ে গেছে। এর সঙ্গে আরো গেছে একটা লম্বা, ধারালো 'বাউয়ি' ছোরা এবং একটা কম্পাস। একটা বড় টর্চও নিয়ে গেছে আফগান। রান্নাঘরে একটা টিনবন্দী সেদ্ধ বীন্‌সের ক্যান খুলে খেয়েছে, আর সেই সঙ্গে একটা সোডাওয়াটার। একটা খালি জেলির শিশিও মুখ খোলা অবস্থায় পড়েছিল। এই শিশিটায় ২৫ সেন্টের মুদ্রা ভর্তি ছিল। কিন্তু ক্যাবিনের মালিক সেটার কথা বলতে ভুলে গেল।

লিনেট বুঝতে পারল পলাতক আসামীর কাছে এখন দরকারি সব কিছুই রয়েছে; তার মানে সে এখন অনেক দ্রুতগতিতে এগোতে পারবে। তার ঘুরপাক খাওয়ার বা জমে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। সে ম্যাক্‌কর্ডে ফোন করে বলল যে তার এক্ষুনি একটা ইনফ্রা রেড টেলিস্কোপ লাগানো হারকিউলিস গানশিপ চাই। ডাক্তারের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এইবার তারা দ্রুত হাঁটা শুরু করল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের পিঠে ভারি বোঝা, তার ওপর অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ আগেই। পলাতক ও তাদের

BanglaBook.org

মধ্যে দূরত্ব কমছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছিল না। সামনে প্ল্যাটুন সার্জেন্ট টর্চের আলোয় তুষারের মধ্যে পলায়মান আফগানের তুষার জুতোর ছাপ অনুসরণ করে এগোচ্ছিল। অকস্মাৎ শুরু হ'ল তুষারপাত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আফগানের পদচিহ্ন কয়েক ইঞ্চি পুরু তুষারের নীচে ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু একই সঙ্গে পাহাড়ের ঢালের এবড়ো খেবড়ো বন্ধুরতাও ঢেকে গিয়ে মসৃণতার সৃষ্টি হ'ল। লিনেট সকলকে পায়ে স্কি পরে নিতে নির্দেশ দিল। অনেক দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা দরকার।

দুর্বৃত্ত ভুতুড়ে জাহাজটা সুরাবায়ার ধারেকাছেও গেল না। সুরাবায়া থেকে রেশম বস্ত্র নেওয়ার যে অর্ডারটার কথা লামপং বলেছিল সাইবার্টকে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে, কারণ সুরাবায়াতে কস্মিনকালেও রেশম উৎপাদন হয়নি এবং হবেও না। কিন্তু ছ'টা ইস্পাতের বাক্স ডেকে সাজানো ছিল আগে থেকেই; যদি কোনো ইন্দোনেশীয় দ্বীপের উপকূল রক্ষীবাহিনী তাদের সামনে পড়ে, তাহলে স্বচ্ছন্দে বাক্সগুলো দেখিয়ে দেওয়া যাবে। ক্রমে যবদ্বীপের দক্ষিণ উপকূল ঘেঁষে ক্রিসমান দ্বীপ পেরিয়ে জাল 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' ঢুকে পড়ল ভারত মহাসাগরে।

মাইক যান্ত্রিকভাবে তার প্রাত্যহিক কাজ করে যাচ্ছিল। তার একটা স্বস্তির কারণ ছিল ইব্রাহিমের অনুপস্থিতি। সে বেশিরভাগ সময়টাই নিজের ক্যাবিনের মধ্যে কাটাচ্ছিল, কারণ সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলুনিতে সে সী-সিকনেসে আক্রান্ত। অন্যদের মধ্যে মেরিন ইঞ্জিনীয়ারটি সর্বদাই জাহাজের ইঞ্জিনের কাছেই থাকছিল। জাহাজ সমানেই পূর্ণগতিতে চলছিল, তেল যত পোড়ে পুড়ুক। কারণ জাহাজ যেখানে যাচ্ছে, সেখান থেকে তো আর ফিরবে না, কাজেই জ্বালানি বাঁচানোর প্রশ্ন নেই।

রেডিও অপারেটর সদা সর্বদা গ্রাহকযন্ত্র চালিয়ে শুনে যাচ্ছিল বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে কথাবার্তার আদান-প্রদান। তার লক্ষ্য কোথাও থেকে কেউ কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড-এর নাম বলে কিনা। আমেরিকার সুবিশাল অনুসন্ধান-কাণ্ড সম্বন্ধে কোনো বৈদ্যুতিন খবর বা কথাবার্তা সে শুনেছিল কিনা, তা কেউ জানে না। মাইক কিছুতেই রেডিও রুমে ঢোকার কোনো সুযোগ পাচ্ছিল না। অন্যেরা নিয়ম করে তার জায়গায় এসে হুইল ধরছিল। রাঁধুনি বলতে কেউ নেই, কারণ তাদের রোজকার খাবার শুধু দু'-তিন রকম টিনে ভরা খাবার। ন্যাভিগেটর সমানেই জাহাজকে নিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিমদিকে।

মাইক বুঝে গিয়েছিল যে, সে এখন সম্পূর্ণ একা, পশ্চিম থেকে তার কোনোই সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। লড়াইটা তাকে একাই লড়তে হবে। 'আল-ইসরা'-কে বানচাল করার একটাই মাত্র উপায়—তাকে কোনোরকমে জাহাজটার দখল নিতে হবে। কিন্তু তার জন্যে তাকে সাতটা লোককে হত্যা করতে হবে। সেই সাতটা লোক জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, তাদের একসঙ্গে এক জায়গায় যখন পাওয়া যাবে, তখন....কিন্তু ইব্রাহিমের কাছে রিভলভার আছে। কোমরে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্রটা তার পোশাকের ওপর দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ে। মাইকের নিজের কাছে অস্ত্র বলতে একটা বড় মাংস কাটা ছুরি, কিচেন থেকে সে চুরি করে নিজের শরীরে পোশাকের নীচে লুকিয়ে রেখেছে। এখন সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

সে জানতো না যে তার সংক্ষিপ্ত বার্তা স্টিভ হিলের হাতে ঠিকমতোই পৌঁছেছে,

BanglaBook.org

এবং তার ওপর নির্ভর করেই আজ আমেরিকা তার সর্বশক্তি নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা দুর্বৃত্ত, ভুতুড়ে জাহাজ—আল-ইসরা'র ভয়াল অস্ত্র।

লেমুয়েল উইলসন নামে একটি মধ্যবয়সী লোক ছিল প্যাসেটেন অরণ্যাঞ্চলের একমাত্র স্থায়ী মানুষ বাসিন্দা। তার একমাত্র বাসস্থান ছিল একটা শক্তপোক্ত লগ ক্যাবিন। সভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে একা থাকাই ছিল তার পছন্দ। মাসে একবার করে নেমে মাজামায় গিয়ে সে মাসের রসদ কিনে আনতো। কিন্তু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি তাকে কে জোগাতো, তা কেউই জানতো না।

তাকে নিয়ে কর্তৃপক্ষের একটা মুশকিল ছিল। সে নিজেকে সচেতন নাগরিক ও পরিবেশপ্রেমী বলে জাহির করতে ভালবাসতো। কর্তৃপক্ষ থেকে অবশ্য তাকে সব ব্যাপারে অযথা নাক গলানোর জন্য অতীব অপছন্দ করতো। কারণ অনেক সময়েই যথাযোগ্য দক্ষ লোকেদের আসার জন্য অপেক্ষা না করে যে কোনো অসুস্থ অভিযাত্রী বা আহত সখের শিকারীকে আনাড়ি, অপটু হাতে আগেভাগে সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা বাড়াতো, ফল হতো হিতে বিপরীত।

আকাশে ঈগল যুদ্ধবিমানের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেই সে দৌড়ে ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সে দেখল দুটো মস্ত আগুনের গোলা দু'দিকে ছিটকে গিয়ে বনের মধ্যে পড়ল। তার শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে ঘন মেঘ ভেদ করে সে আর কিছু দেখতে পেল না। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে তার একটা বেতার সঙ্কেত প্রেরক-গ্রাহক যন্ত্র ছিল। সে সাগ্রহে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে শোনার চেষ্টা করতে লাগল, দুর্ঘটনাটার কিছু খবর জানা যায় কিনা। অবশেষে বিকেলে সে শুনতে পেল যে বিধ্বস্ত বিমানের দুই পাইলট প্যারাশুটে করে জঙ্গলের মধ্যে নেমেছে, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পেশাদার উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে শেরিফের ওয়াকি-টকিতে কথা শুনে সে বুঝল যে তখনো পর্যন্ত একজন পাইলটকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নাগরিক সচেতনতা প্রমাণ করার এই একটা সুযোগ পেয়ে উইলসন উল্লসিত হয়ে উঠল। তার গর্ব ছিল যে চারপাশের দশ বর্গমাইল জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা। পেশাদার দলের আগে সে নিজেই আগে পৌঁছে গিয়ে আহত পাইলটকে উদ্ধার করবে। সে তার শক্ত সমর্থ পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়ার পিঠে জিন পরিয়ে শিকারের রাইফেল ও দূরবীন নিয়ে দ্রুত এগোতে শুরু করল উত্তরমুখো। হঠাৎ তার সামনে সেরু পোশাকে আবৃত একটা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মানুষ অন্ধকার ফুঁড়ে আবির্ভূত হ'ল। উইলসন এত চমকে গেল যে ঘোড়ার জিনের পাশে খাপে গোঁজা রাইফেলটার দিকে হাত বাড়াতেও ভুলে গেল। পরমুহূর্তেই রহস্যময় মনুষ্য মূর্তিটি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। একটা পেশীবহুল হাত তার ঘাড়-গলা সাপটে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে নামিয়ে নিল বরফের উপর। তার শরীর মাটি ছোঁয়ার আগেই একটা ধারালো 'কাউয়ি' ছোরা তার পাঁজরের ভেতর দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ডটা চিরে দিল।

ইজমৎ খান মৃতদেহটাকে হিঁচড়ে টেনে কিছু দূরের একটা অগভীর খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর স্বচ্ছন্দ, অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে তার পাছায় সজোরে এক চাপড় লাগালো। ঘোড়াটা উত্তরমুখো চলতে শুরু করলো। ইজমৎ জোড়া

BanglaBook.org

পায়ে ঘোড়াটার পেটে মাঝে মাঝে লাথি মেরে যতটা জোরে সম্ভব ছোটাতে লাগল। যত শীঘ্র সম্ভব উত্তরের দেশটায় ঢুকে পড়তে হবে তাকে, আমরিকিদের নাগালের বাইরে।

ইনফ্রা-রেড টেলিস্কোপ লাগানো হারকিউলিস বিমান ইতিমধ্যে লিনেট ও তার সৈন্যদলের মাথার ওপরে পৌঁছে গিয়েছিল। ওয়াকি-টকিতে লিনেট পাইলটকে বলল যে তাদের দলের থেকে মোটামুটি তিন মাইল দূরে একটা মাত্র মানুষ কানাডা সীমান্তের দিকে পালাচ্ছে। একটা চক্কর মেরে এসে হারকিউলিসের পাইলট জানালো যে সামনে কোথাও হেঁটে যাওয়া কোনো মানুষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

নিকষ কালো আঁধারের মধ্যেও কোনো মানুষ বা প্রাণীর দেহ নির্গত উত্তাপে একটা আলোকিত দেহরেখা তৈরি হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ইনফ্রা রেড বা অবলোহিত রশ্মির প্রভাবেই সেই রেখাচিত্র দেখা সম্ভব হয়। উইলসনের দেহটা পড়েছিল একটা খাদের মধ্যে, ফলে তার কোনো তাপচিত্র হারকিউলিসের ইনফ্রা রেড স্কোপে ধরা পড়ল না। লিনেট জোর গলায় তাগাদা দিতে পাইলট তার স্কোপটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরালো কানাডা সীমান্ত অবধি। তারপর সে বলে উঠল, "লিনেট, আমি কয়েকটা পশু ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

"কি কি পশু দেখতে পাচ্ছো?" লিনেট জানতে চাইল।

"চারটে চিত্রল হরিণ, দুটো ভালুক, একটা 'কুগার' পার্বত্য সিংহ আর একটা মুজ্ হরিণ। মুজ্ হরিণটা মাঝারি গতিতে দৌড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরদিকে উঠছে।"

"মুজ্ হরিণ?" লিনেট বলে উঠল। "শীত আসছে, এখন তো সব মুজ্ ঘাস খাবার জন্য নীচে নেমে আসে, এটা ওপরে যাচ্ছে কেন?" হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মাথায় সঠিক ব্যাখ্যাটা লাফিয়ে উঠল।

"ওটা মুজ্ নয়, একটা ঘোড়া। ওর পিঠে নিশ্চয় একটা লোক আছে। ওই আমাদের টার্গেট!" লিনেট চেঁচিয়ে উঠল তার ওয়াকি-টকিতে। "গুলি চালাও।"

"এখন তো পারবো না, "হারকিউলিসের পাইলট উত্তর দিল।" এই চক্করটা শেষ করে তবেই ফিরে এসে গুলি চালাতে পারবো।"

উইলসনের ঘোড়াটা শক্ত সমর্থ বটে, কিন্তু ক্রমাগত দ্রুতগতিতে পিঠে বোঝা বয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার সওয়ারিও কেবল উত্তরদিকের সীমান্তের কথাই ভাবছিল। ফলে পাশের জঙ্গল থেকে যখন ক্ষুধার্ত কুগারটা সোজা ঘোড়াটার ওপর লাফিয়ে পড়ল, তখন মানুষ ও ঘোড়া কেউই তা আগে থাকতে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ইজমৎ খানের সহজাত প্রবৃত্তি তখনো তীব্রভাবে সক্রিয়। ঘোড়াশুদ্ধ উল্টে পড়ে যেতে যেতেই সে এক টানে জিন থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে জমির ওপর শোয়া অবস্থাতেই কুগারটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালালো। মৃত কুগার মারাত্মক আহত ঘোড়াটিকে নিয়ে আছড়ে পড়ল বরফাবৃত জমিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে সে আহত ঘোড়াটার মাথায় ব্যারেল ঠেকিয়ে আর একবার বন্দুকের ট্রিগার টিপে অসহায় প্রাণীটিকে ভব যন্ত্রণা দিতে মুক্তি দিল। আর না থেমে সে হনহন করে চলতে শুরু করলো ফের উত্তরের সীমান্তের দিকে।

শল্য চিকিৎসকের মেরু-পোশাকটা অত্যন্ত দামী। সেটা পরে থাকায় ইজমতের শরীরের উত্তাপ এতটুকুও বেরোচ্ছিল না। ফলে হারকিউলিসের পাইলট তার

BanglaBook.org

মেশিনগান চালিয়ে ঘোড়া ও কুগারের মৃতদেহটি ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। কিন্তু পলায়মান ইজমৎ খান তখনও হারকিউলিসের ইনফ্রা রেড স্কোপে ধরা পড়ল না।

লিনেট ও তার সৈন্যরা স্কি করে এগোচ্ছিল। কিন্তু ঘোড়ার চড়ে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ফলে ইজমৎ খান তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের থেকে অনেকটা বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ক্ষীণ ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ইজমৎ খানের সঙ্গে সৈনিকদের একটা দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। হারকিউলিস বিমানকে তার ঘাঁটিতে ফেরত পাঠিয়ে দিল লিনেট। কিছুদূর যাওয়ার পরে সে দেখল পাহাড়ের ঢাল এবার কানাডার দিকে নেমে যাচ্ছে।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে লিনেট দেখল পাহাড়ি ঢালটা প্রায় আধ মাইল দূরে একটা কাঁচা রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ওই রাস্তাটাই কানাডা-ইউ.এস.এ. সীমান্ত। চারদিক ইতিমধ্যে আরো একটু ফর্সা হয়েছে, কিন্তু দূরবীনের মধ্যে দিয়েও লিনেটের দৃষ্টিতে কোনো মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল না। আফগানটা গেল কোথায়?

তার প্রধান স্নাইপার মাস্টার মার্জেন্ট বেয়ারপও ইতিমধ্যে একটা পাথরের ওপর উবুড় হয়ে তার শক্তিশালী দূরপাল্লার রাইফেলের টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে সীমান্তের এপারটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল। মরিয়া ক্যাপ্টেন লিনেটের উদ্দেশে সে হঠাৎ বলে উঠল, "আমি টার্গেটকে পেয়ে গেছি, স্যার। দীর্ঘদেহী, ঈষৎ জট পাকানো লম্বা চুল, চাপ দাড়ি....."

"ঠিক!" লিনেট চেঁচিয়ে উঠল।" কি করছে লোকটা?"

"সীমান্ত থেকে কিছুটা ভেতরে, যেখানে পাইন গাছের কাটা গুঁড়ি সব স্তূপ করে রাখা রয়েছে, তার পাশে একটা ফোন বুথের মধ্যে রয়েছে। বাঁ হাতে রিসিভার ধরে কানে লাগিয়ে কথা বলছে...."

গুয়ানতানামোতে জর্ডনের এক বন্দী ইজমৎ খানকে মুখে মুখে একটা ফোন নম্বর বলে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল, "এই ফোন নম্বরটা যার, সে আমাদের বন্ধু। কোনোদিন প্রয়োজন হলে ফোন করো, সাহায্য পাবে।"

ফোন নম্বরের সঙ্গে একটা নামও বলেছিল জর্ডনের বন্ধু। শল্যচিকিৎসকের ক্যাবিন থেকে নেওয়া পঁচিশ সেন্টের মুদ্রা ইজমৎ খানের কাছে ছিল অনেকগুলো, কিন্তু আই.এস.ডি. কল ঠিক কিভাবে করতে হয়, তা সে ভালমতো জানতো না। পাঁচ বছরের কারাবাসের সময় সে কিছু ইংরেজি শব্দ শিখেছিল; প্রধানত জেরার সময় প্রশ্নকর্তাদের কথা শুনে শুনে ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে তার কিছুটা ধারণা জন্মেছিল। সে সময় নষ্ট না করে বুথের ফোনে একটা কোয়ার্টার ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই অন্যদিকে এক্সচেঞ্জের এক অপারেটর তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন নম্বর চাইছো?"

ধীরে ধীরে সে মুখস্থ সংখ্যাগুলো একটা একটা করে বলল।

"এটা তো ইংল্যাণ্ডের নম্বর। তোমার কাছে কি আমেরিকান কোয়ার্টার্স আছে?"

'আমেরিকান' শব্দটা বুঝতে পারল ইজমৎ খান এবং উত্তর দিল, "ইয়েস"।

"ঠিক আছে। তুমি ফোনের মধ্যে আটটা কোয়ার্টার ফেলো, আমি তোমাকে কানেকশন দিয়ে দিচ্ছি। যখনই বীপ্ শুনবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা কোয়ার্টার আরও ফেলবে।"

ইজমৎ খান ফোন বক্সের ওপরে সরু ছিদ্রে কোয়ার্টার মুদ্রা ফেলা শুরু করল।

BanglaBook.org

"তোমার নিশানা ঠিক আছে?" লিনেট অধৈর্য স্বরে প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ, একদম সঠিক," উত্তর দিল সার্জেন্ট বেয়ারপও।

"গুলি চালাও।"

"টার্গেট কানাডার ভেতর ঢুকে পড়েছে।"

"সার্জেন্ট, গুলি চালাও।"

পিটার বেয়ারপও ধীরে একটা লম্বা শ্বাস নিল, তারপর দম চেপে রেখে রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিল। টার্গেট তার থেকে এক মাইলেরও বেশি দূরে। তরঙ্গহীন, স্তব্ধ বাতাসের মধ্য দিয়ে বুলেটটা নিঃশব্দে তীব্রগতিতে একেবারে সোজা এগিয়ে গেল।

ইজমৎ খান মন দিয়ে একটা একটা করে মুদ্রা ঢোকাচ্ছিল ফোন বক্সে। তিন নম্বর মুদ্রাটা ফেলার মুহূর্তেই বুথের একটা শার্সির কাঁচ চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল, আর বুলেটটা ইজমৎ খানের মাথার খুলির পেছনের অংশটা উড়িয়ে দিয়ে উল্টোদিকের শার্সি ভেদ করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের একটা পাইন গাছের গুঁড়িতে বিঁধে গেল।

কানাডিয়ান অপারেটর মেয়েটি ধৈর্য ধরে প্রায় আধ-মিনিট অপেক্ষা করল। ফোন বুথের লোকটি মাত্র তিনটে কোয়ার্টার ফেলেছে, তারপরে রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে বোধহয় চলেই গেছে। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

ক্যাপ্টেন লিনেটের ফোন কল পাওয়ার পরে মারেক গুমিনি পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেল। উপায় ছিল না, কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকে গুলি চালিয়ে কানাডার মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোককে হত্যা করা হয়েছে—এই ব্যাপারটা জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি হ'ত।

ফোন বুথের ভেতরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মৃতদেহটা আবিষ্কার হল বেশ কয়েকদিন পরে। মৃত লোকটির জামাকাপড়ের মধ্যে কোনো পরিচয়পত্র পাওয়া গেল না। তাকে কেউ চেনেও না। কানাডিয়ান পুলিশ ধরে নিল ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা—কোনো অসতর্ক হরিণ শিকারীর রাইফেল থেকে ছুটে যাওয়া বুলেট লেগে মৃত্যু হয়েছে লোকটার। করোনার্স কোর্ট 'রহস্যজনক মৃত্যু' রায় দেওয়ার পরে দেহটা কবর দিয়ে দেওয়া হ'ল।

ইজমৎ খান কোন নম্বরে কথা বলতে চাইছিল, সেটা জানতে পারলে সি.আই.এর সুবিধে হ'ত। কিন্তু তাও সম্ভব হল না। কারণ এই তথ্যটা জানতে চাওয়ার মানেই হ'ল যে তাদেরই কেউ লোকটাকে গুলি করে মেরেছে। সুতরাং মারেক গুমিনি ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না, এমনকি স্টিভ হিলকেও জানাল না।

কিন্তু গুমিনি নম্বরটা জানতে চাইলেই ভালো করতো। কানাডিয়ান সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা করে ঝামেলাও সহজে মিটিয়ে নেওয়া যেত। ফোন নম্বরটা জানতে না চাওয়াটা তার পেশাদার জীবনে চরম বোকামির নিদর্শন হয়ে রইল। কারণ ইজমৎ খান কথা বলতে চাইছিল বার্মিংহ্যামের অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আলি আজিজ আল-খাত্তাবের সঙ্গে—পুরো পাশ্চাত্য দুনিয়ার একমাত্র লোক যে দুর্বৃত্ত ভুতুড়ে জাহাজ—রূপান্তরিত 'জাভা স্টার'—'কাউন্টেস অব রিচমণ্ড'-এর নামটা জানতো!

ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সহ সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তারা অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। এতদিন কেটে গেল, দুনিয়া জুড়ে তল্লাশি চালাতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচা হয়ে গেল, অথচ এখনও পর্যন্ত দুর্বৃত্ত জাহাজের কোনো খোঁজই মিলল না। পুরো ব্যাপারটা বুনো হাঁসের পেছনে ছোটার মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মারেক গুমিনি এইবার লণ্ডন গিয়ে পুনরায় স্যাম সেমুরকে ডেকে পাঠালো।

"সারা পৃথিবীতে যত সুপার ট্যাঙ্কার আর অয়েল ট্যাঙ্কার আছে, সব ক'টা চেক করা হয়ে গেছে। কোনটাতেই কিছু গণ্ডগোল নেই," সেমুর জানালো।

"তাহলে?" গুমিনি জিজ্ঞেস করল, "বিস্ফোরক বোঝাই কোনো জাহাজ?"

'তারও সম্ভাবনা নেই," সেমুর উত্তর দিল। "প্রথমত, সামরিক গোলা বারুদবাহী কোনো জাহাজ—কোনো দেশেরই—ছিনতাই হয়নি। দ্বিতীয়ত, যদি বা সেরকম একটা আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও সেটাতে ১৯১৭ সালে হ্যালিফ্যাক্সের মতো বিস্ফোরণ ঘটানো অসম্ভব। আজকাল ওসব জিনিস জাহাজের খোলের মধ্যে এমন নিরাপদভাবে রাখা হয় যে, সেগুলোয় বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে তার একটা সুবিশাল মাপের বিস্ফোরণ ঘটানো প্রয়োজন। আল-কায়দা নিঃসন্দেহে জোড়া মিনার ধ্বংসের মতো, বা তার চেয়েও প্রকাণ্ড কিছু ঘটাতে চাইছে, নতুবা ওরা এই ব্যাপারটার নাম 'আল-ইসরা' দিত না। 'আল-ইসরা' কোরানে তথা নবী মহম্মদের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা!"

"তবে কি ভোপালের মতো কিছু ঘটাতে চাইছে? ধরা যাক, বোস্টন, ফ্লোরিডা, কীজ্ বা সানফ্রানসিসকো বন্দরে জাহাজটা ভেড়াল। তারপর সমুদ্র থেকে ডাঙার দিকে যখন হাওয়া বইছে, তখন হাওয়ার অনুকূলে 'মিক' বা ওই রকম কোনো মারণ ডাইঅক্সিন গ্যাস ছেড়ে দিল—"

"না", সেমুর জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ল। "এই সব রাসায়নিক মিশ্রে খুব কম সংখ্যক জাহাজই যায় আজকাল। সেরকম কোনো জাহাজ ছিনতাই হলে সারা দুনিয়া জুড়ে হইচই পড়ে যেত এতদিনে। কোনো তেল বোঝাই ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটানোও অসম্ভব, কারণ খনিজ তেল অর্থাৎ ক্রুড অয়েলে আগুন লাগানো যায় না। সমুদ্রে ক্রুড অয়েল ছড়িয়ে পড়লে পরিবেশের ক্ষতি হয়, কিন্তু মানুষ মরে না। তাছাড়া তরল প্রাকৃতিক গ্যাস, যাকে আমরা সংক্ষেপে এল.এন.জি. বলে থাকি, জোড়া ইস্পাতের পাতওয়ালা জাহাজের খোলে মাইনাস ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা হয়। বাতাসে ছেড়ে দিলেও সাধারণ তাপমাত্রায় নেমে দাহ্য অবস্থায় আসতে বেশ কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে।"

"তাহলে জাহাজের খোঁজ করা বরং ছেড়েই দিই আমরা, না কি?" হিল বলল।

BanglaBook.org

"না", সেমুর মাথা নাড়ল, "একটা সাংঘাতিক, দুর্দান্ত ভয়াবহ সম্ভাবনা বাকি আছে—এল.পি.জি—লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। সিলিণ্ডারে ভরে যে গ্যাস দিয়ে আমরা রান্নার উনুন জ্বালাই। কারখানাতেও এর ব্যবহার সুপ্রচুর। একটা ছোট জাহাজও যে পরিমাণ এল.পি.জি. বহন করে, তা যদি বাতাসে ছেড়ে দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে তাতে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তাহলে যে বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ঘটবে, তা অন্তত তিরিশটা হিরোসিমার অ্যাটম বোমার সমান।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর স্টিভ হিল প্রশ্ন করল, "মোদ্দা কথাটা তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ? আমরা এখন কি করব?"

"আল-ইসরার লক্ষ্য আমেরিকা, সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এল.পি.জি.'র সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশও আমেরিকা। আমার মতে এখন থেকেই আমেরিকার যে কোনো বন্দরের দিকে যত এল.পি.জি ট্যাঙ্কার আসছে, তার প্রত্যেকটাতে গভীর সমুদ্রে থামিয়ে চেক করতে হবে। আমি ফের বলছি—প্রতিটি এল.পি.জি. ট্যাঙ্কার—তা সে যে দেশ থেকেই আসুক না কেন। আমি লয়েডসের রেজিস্টার দেখে এক-দু'দিনের মধ্যে সারা পৃথিবীর সমস্ত এল.পি.জি. ট্যাঙ্কারের তালিকা দিয়ে দিতে পারবো।"

টেমস নদীর তীরে ভক্সহল ক্রসে স্টিভ হিলের দপ্তরে বসে যখন এইসব আলোচনা চলছিল, তখন 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' দক্ষিণ আফ্রিকার আগুলহাস অন্তরীপ ঘুরে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করল। ব্যস্ত সমুদ্রপথে বহু নানা আয়তনের, নানা জাতের, নানা রকম পণ্যবাহী জাহাজের আনাগোনা—এশিয়া থেকে ইউরোপ বা আমেরিকায়, অথবা উল্টোমুখে। ইদানীং প্রত্যেক জাহাজে তার নিজস্ব 'কল সাইন' সব সময় ট্রান্সপণ্ডারের মাধ্যমে বায়ু তরঙ্গে প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। আমেরিকান কৃত্রিম উপগ্রহগুলি প্রতিটি জাহাজের ফটো তুলে 'কল সাইন'-এর কপির সঙ্গে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। প্রতিটি জাহাজের দেওয়া পরিচিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-কেও একইভাবে যাচাই করা হ'ল। লয়েডস এবং জাহাজী দালাল সাইবার্ট অ্যান্ড অ্যাবারক্রম্বি উভয়েই জানাল যে জাহাজটা লিভারপুলে রেজিস্ট্রিকৃত ছোট পণ্যবাহী 'ফ্রেটার'—পূর্ব নির্ধারিত পথে সুরাবায়া থেকে রেশম নিয়ে যাচ্ছে বাল্টিমোর। আমেরিকার তরফে আর কিছু খোঁজ নেওয়া নিরর্থক। তাছাড়া জাহাজটা আমেরিকার উপকূল থেকে তখনও কয়েক হাজার মাইল দূরে এবং সেটা এল.পি.জি.ও বহন করছে না।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো নিয়মিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বন্দরে নানা রকমের পেট্রোলজাত সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। 'ডোনা মারিয়া' পোর্ট অফ স্পেনের কাছেই ছোট দ্বীপ বন্দরে নোঙর করল। এই বন্দরটা বিশেষ করে পেট্রো-ট্যাঙ্কারে পণ্য বোঝাই করার জন্য নির্দিষ্ট। 'ডোনা মারিয়া' দাঁড়িয়েছিল অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও নির্জন একটা ডকে, কারণ তার পণ্য এল.পি.জি.—এত সহজদাহ্য যে তার ভাণ্ডার বা ডিপোর কাছাকাছি বিশেষ জনবসতি গড়ে উঠতে দেওয়া হয় না। সূর্য ডোবার কিছু আগে ডোনা মারিয়াতে এল.পি.জি ভরে তার ট্যাঙ্ক

BanglaBook.org

সীল করে দেওয়া হ'ল। ক্যাপ্টেন পাবলো মন্টালবান আর দেরি না করে নোঙর উঠিয়ে নিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

'ডোনা মারিয়া' ছোট ট্যাঙ্কার। ক্যাপ্টেন ও তার মেট-ন্যাভিগেটর পালাক্রমে হুইলহাউস থেকে জাহাজ চালায়। এছাড়া ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার ও দু'জন ডেকহ্যাণ্ড বা খালাসি। শেষোক্ত দু'জন ত্রিনিদাদেই নবনিযুক্ত ভারতীয় ইসলামিক আতঙ্কবাদী। জাহাজ বন্দর ছেড়ে মাইলখানেক যাওয়ার পরেই তারা দেখতে পেল একটা হাওয়া ফোলানো রাবারের ডিঙ্গি জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে চারজন লোক। এই সঙ্কেতের জন্যই তারা অপেক্ষা করছিল। ডিঙ্গিটা দেখামাত্রই তারা দু'জন দুটো পিস্তল বার করে তৈরি হয়ে নিল। একজন নেমে গেল ডেক থেকে নীচে, যেখানে 'স্কাপারস্' অর্থাৎ ডেকে জমে যাওয়া জল বার করে দেওয়ার জন্য জাহাজের গায়ের গর্তগুলো আছে। অন্যজন হুইলহাউসে ঢুকে ক্যাপ্টেনের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে খুবই নম্র স্বরে বলল, "দয়া করে কিছু করার চেষ্টা করবেন না। জাহাজের গতিও কমাবেন না। আমাদের চারজন বন্ধু কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজে চড়বে। রেডিওতে কিছু ডাক পাঠানোর চেষ্টাও করবেন না দয়া করে, কেননা তাহলে আমি আপনাকে গুলি করতে বাধ্য হবো।"

দু' মিনিটের মধ্যেই চারজন সন্ত্রাসবাদী—দু'জন আলজিরিয়ান ও দু'জন মুর অর্থাৎ মরক্কোর অধিবাসী—জাহাজে উঠে এলো। শেষজন ওঠার সময় হাওয়া ফোলানো ডিঙ্গিটা একটা ভোজালি দিয়ে কেটে দিল, ফলে মিনিট খানেকের মধ্যেই সেটা ডুবে গেল। এই চারজনকে আল-খাত্তাব স্বয়ং খুঁজে বার করে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল এক মাস আগে। সূর্য ডুবে যেতেই চারজন দক্ষিণ আমেরিকান নাবিককে ডেকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হ'ল। দেহগুলোর পায়ে ভারি শেকল বেঁধে ফেলে দেওয়া হ'ল সমুদ্রে, যাতে এগুলো কোনোদিন ভেসে না ওঠে।

'ডোনা মারিয়া'র গন্তব্য ছিল পুয়ের্তো রিকো। সেদিকে না গিয়ে ছয় সন্ত্রাসবাদী জাহাজটা নিয়ে ঢুকে পড়ল উইণ্ডওয়ার্ড ও লীওয়ার্ড দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রে। এই অঞ্চলে সর্বদাই অসংখ্য ছোটবড় জাহাজ, লঞ্চ, নৌকো ও ফেরির ভিড় লেগে থাকে। ভীত ক্যাপ্টেন মনটালবানকে একটা ক্যাবিনে হাত-পা-মুখ বেঁধে আটকে রেখে ছয় তথাকথিত নাবিক জলযানের ভীড়ের মধ্যে মিশে জাহাজটাকে লুকিয়ে রাখল। আল-খাত্তাব তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে যতদিন না পুয়ের্তো রিকোতে পৌঁছনোর তারিখ পেরিয়ে যাচ্ছে, ততদিন জাহাজটাকে এইভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে। তারপরে কি করতে হবে, সে নির্দেশ তখন আসবে।

'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' ইতিমধ্যে বিষুবরেখার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। সমুদ্র এখানে অনেক শান্ত। ইব্রাহিম এইবার তার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো। তার মুখ এখনও একই রকম ভাবলেশহীন, মার্বেল গুলির মতো গোল, তীক্ষ্ণ চোখের তারায় ঝরে পড়ছে ক্রূর নিষ্ঠুরতা। তার নির্দেশে মাইক বাদে বাকিরা মিলে জাহাজের খোল থেকে তুলে নিয়ে এলো একটা কুড়ি ফুট লম্বা হাওয়া-ফোলানো স্পীডবোট। তাতে

BanglaBook.org

১০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন আউটবোর্ড মোটর লাগিয়ে তাতে তেল ভর্তি করে জলে নামানো হ'ল। সুলেইমান ও অন্যেরা এই স্পীডবোটে চেপে জাহাজ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে চলে যাওয়ার পরে সুলেইমান তার ক্যামেরা চালু করল।

মাইক জাহাজ চালাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল যে এই ব্যাপারটা সেই অজানা ভয়ঙ্কর শেষের দিনের মহড়া হচ্ছে। সুলেইমানের ভিডিও ক্যামেরা লাগানো তার ল্যাপটপের সঙ্গে। তার থেকে স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে পুরো ধ্বংসলীলার 'লাইভ' ছবি পৌঁছে যাবে পূর্ব গোলার্ধের একটা ওয়েবসাইটে। সেই রেকর্ডিং বারংবার দেখানো হবে বিশেষ একটি টিভি চ্যানেলে। এই হ'ল ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় প্রোপাগাণ্ডা—সত্তরটা দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তরুণ চাক্ষুষ করবে আল্লার ভৃত্যেরা কেমন করে শয়তানের দেশকে শাস্তি দিচ্ছে! এই সব দেশ থেকেই আল-কায়দা ও তার সহযোগী গোষ্ঠীগুলিতে হাজারে হাজারে তরুণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগ দেয়। তাদের একটাই কামনা—তারাও এই রকম 'মহান' কাজ করে বেহেশ্‌তে যেতে চায়।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু মাইক জানতে পারেনি ডেকের ইস্পাতের বাক্সগুলোতে ঠিক কি ভয়াবহ বস্তু লুকানো আছে, এবং তা দিয়ে ঠিক কবে এবং কোথায় আঘাত হানবে আল-কায়দা। ইতিমধ্যে ইব্রাহিমের মতিগতি তার সুবিধের ঠেকছিল না। ডেকে থাকলেই ইব্রাহিম স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। মাইক ভেবেই পাচ্ছিল না কেন ইব্রাহিম তাকে সব সময় এভাবে দেখে। সে কি নমাজ পড়ার সময় কোনো ভুল করেছে কোনদিন? না কি ইব্রাহিম কোনো একসময় ইজমৎ খানকে সরাসরি দেখেছিল?

আসলে ইব্রাহিম কোনোদিন ইজমৎ খানকে চাক্ষুষ দেখেনি, কিন্তু এই বিখ্যাত তালিবান যোদ্ধা সম্পর্কে সে অনেক গল্প-কাহিনী শুনেছিল। ইজমৎ খানের মতো আরও কয়েকজন তালিবান যোদ্ধাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো, কারণ এরা সবাই রণাঙ্গনে অকুতোভয়—অসীম সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করে। ইব্রাহিমের দ্বারা একাজ কোনোদিনই হয়নি। ফলে এক গভীর ঈর্ষা ও তজ্জনিত পরম ঘৃণা জন্মেছিল তার মনে। সে একান্তভাবে চাইতো যে ইজমৎ খান যেন বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হয়। তাহলে তার মুখোশ খুলে দিয়ে সে নিজের হাতে এই আফগানটাকে মারবে।

ইব্রাহিম তার এই বিকৃত ক্রোধ এবং ঘৃণাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, তার প্রধান কারণ সে মনে মনে এই দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ আফগানকে ভয় পেত, যদিও জাহাজে একমাত্র তারই কাছে সবসময় জোব্বার নীচে লুকানো একটা গুলিভরা পিস্তল থাকতো। সে শুধু আফগানকে স্থির দৃষ্টিতে সব সময় লক্ষ্য করতো—আর অপেক্ষা করতো।

কিছুতেই দুর্বৃত্ত জাহাজটার খোঁজ না পাওয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা মহলে একটা নৈরাশ্য ক্রমশ দানা বাঁধছিল। ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সেক্রেটারিকে একদিন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে ডেকে প্রধানমন্ত্রী চারটে প্রশ্ন করলেন ঃ এরকম কোনো জাহাজ কি সত্যিই আছে? যদি থাকে, তাহলে সেটা কি জাতের জাহাজ? এই মুহূর্তে কোথায় আছে? তার লক্ষ্যবস্তু কি?

হীথরো বিমানবন্দরে এক যাত্রীর কিট ব্যাগে পাওয়া ছোট বার্তাটুকু ছাড়া

BanglaBook.org

ক্রোবার-এর কাছ থেকে আর কোনোরকম সাড়া পাওয়া যায়নি। সে কি বেঁচে আছে? তার খবরটাও কি সঠিক ছিল? মারেক গুমিনি একদিন স্টিভ হিলকে ফোন করে বলল, "আমি দুঃখিত, স্টিভ, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার সাহসী কর্নেল আর বেঁচে নেই। মনে হচ্ছে তাকে ধরে অত্যাচার করে আসল কথা আদায় করার পরে আল-কায়দা তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু 'আল-ইসরা' নাম দিয়ে একটা প্রচণ্ড বিভীষিকা তৈরি করার পরিকল্পনার কথা আমরা জানতে পেরেছি বলে হয়তো আল-কায়দা ব্যাপারটা বাতিল করে দিয়েছে। এই জন্যেই আমরা এমন কোনো জাহাজের খোঁজ পাচ্ছি না যেটা দিয়ে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধানো যেতে পারে।"

"মাইক মার্টিন অত্যাচারিত হয়ে মরে যাবে, কিন্তু তার মুখ থেকে একটিও গুপ্ত কথা ফাঁস হবে না; কিছুতেই না," স্টিভ হিল বলল। "এখনই হাল ছেড়ো না, মারেক। আরও কয়েকটা দিন অনুসন্ধান চালু রাখো।"

লয়েডস-এর অফিসে গিয়ে স্যাম সেমুরের দেখা পেল হিল। কাফেটেরিয়ায় কফি ও চিপ্‌স্ খাওয়ার ফাঁকে সে বলল, "আচ্ছা স্যাম, সেদিন এল.পি.জি.'র বিষয়ে তুমি যা বলেছিলে—তিরিশটা হিরোসিমা অ্যাটম বোমার সমান—ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো তো।"

স্যাম সেমুর বলা শুরু করল ঃ "স্টিভ, অ্যাটম বোমা ফাটলে তার প্রতিক্রিয়া হয় চারভাবে। প্রথমেই যে তীব্র আলোর ঝলকটা দেখা যায়, সেটা এত সাংঘাতিক রকম তীব্র যে খালি চোখে দেখলে চোখের কর্নিয়া পুড়ে যায়। হিরোসিমায় এক মুহূর্তের জন্য সূর্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এর পরেই সৃষ্টি হয় একটা প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাপমাত্রা এত উঁচুতে উঠে যায় যে ঘাসপাতা পর্যন্ত দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এর পরে তৈরি হয় একটা 'শক ওয়েভ'। তাপপ্রবাহে বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠে যায়, আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চারপাশ থেকে ছুটে আসে ঝড়ো হাওয়া। এই হাওয়ার বেগে বাড়িঘর হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে, ট্রেন বাস ট্রাক গাড়ি সব বাচ্চাছেলের খেলনার মতো এধারে ওধারে ছিটকে পড়ে। মানুষজনও মরে এই পর্যায়েই। শেষকালে নির্গত হয় গামা রশ্মি, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পুরুষানুক্রমে এর ক্ষতিকর প্রভাব চলতে থাকে, সৃষ্টি হয় ক্যান্সার, লিউকেমিয়া, অঙ্গ বিকৃতি ইত্যাদি।

"এল.পি.জি'র বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয় শুধুই উত্তাপ—সাংঘাতিক, মারাত্মক উত্তাপ। মনে রেখো, এল.পি.জি. বাতাসের চেয়ে ভারি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় এল.এন.জি. রাখা থাকে অবিশ্বাস্য রকম কম তাপমাত্রায়, কিন্তু এল.পি.জি.'র উপর উচ্চচাপ সৃষ্টি করে তাকে বড় ট্যাঙ্কে বা সিলিণ্ডারে ভরা হয়। যদি ট্যাঙ্ক বা সিলিণ্ডারের মুখ খুলে যায়, তাহলে ফোয়ারার মতো তীব্র বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অদৃশ্য এল.পি.জি. হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু যেহেতু এই গ্যাস বাতাসের চাইতে ভারি, ফলে সেটা উৎস মুখেরই চারপাশে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এর ফলে একটা বিশাল জ্বালানি বোমা তৈরি হয়ে যায়। এইবারে একটামাত্র আগুনের স্ফুলিঙ্গ পেলেই সেটা জ্বলে উঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের দরুন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে, তাপমাত্রা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে

BanglaBook.org

চড়ে যায় ৫০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

"কিন্তু এই সব নয়। এই ভয়াবহ অগ্নিবোমার আসল ধ্বংসলীলা শুরু হয় এর পরে। উত্তাপ চড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল আগুনের কুণ্ডলিটা গড়াতে শুরু করে। যে ঝড়ো হাওয়াটা তৈরি হয় তা অ্যাটম বোমার মতো অন্তর্মুখী নয়—বহির্মুখী। আগুনের গোলাটা ক্রমশ বিরাট থেকে বিরাটতর হয়ে চারপাশে গড়াতে থাকে। পথে যা কিছু পড়ে সব নিমেষে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। যতক্ষণ না সব গ্যাসটুকু পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণে এটা নেভে না।"

"কতদূর পর্যন্ত এই আগুনের গোলা গড়িয়ে যেতে পারে?" স্টিভ জিজ্ঞেস করল।

"আমি এই বিষয়ে দু'জন বিখ্যাত রসায়ন বিশেষজ্ঞের মত নিয়েছি। তারা যা বলেছে, সে অনুসারে যদি একটা ছোট ট্যাঙ্কার—ধরো ৮০০০ টন—যদি তার মধ্যে মজুত পুরো এল.পি.জি উৎক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে যাবতীয় সব কিছু—মানুষ পশু সব পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

"আরও একটা কথা। আমি বলেছি এল.পি.জি. বিস্ফোরণের ফলে বহির্মুখী হাওয়া তৈরি হয়। কিন্তু এই আগুনের গোলাটা বাতাস থেকে দ্রুত অক্সিজেন শুষে নেয়। তার মানে আগুনে পুড়ে যাওয়ার আগেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সবাই মারা পড়ে।"

স্টিভ হিলের চোখের সামনে একটা ব্যস্ত বন্দর ও তার তীরবর্তী জনাকীর্ণ শহরের ছবি ভেসে উঠল। এল.পি.জি. ট্যাঙ্কারটা যদি বড় মাপের হয়? বন্দর শহর তো বটেই, উপকণ্ঠের জনবসতিগুলোও রেহাই পাবে না।

"সমস্ত এল.পি.জি. ট্যাঙ্কারগুলো চেক করা হচ্ছে তো?" সে জিজ্ঞেস করল।

"প্রত্যেকটা, দুনিয়ার প্রায় সব সমুদ্রে। বড়, মাঝারি, ছোট, অতি ছোট—সব। পৃথিবীর সব দেশে সতর্কবাণী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সকলেই জানে যে এরকম কোনো একটা আক্রমণ যদি করা হয়, তো তার লক্ষ্য হবে পাশ্চাত্যের কোনো একটা উন্নত, ধনী দেশ।"

ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে কনর‍্যাড ফিপ্‌স্ নামে একটি তরুণ ছেলে ঢুকে এলো। "স্যাম", সে বলল, "আমাদের কাজ শেষ। সমস্ত এল.পি.জি. ট্যাঙ্কারের হিসেব নেওয়া হয়ে গেছে। কোনোটাতেই গণ্ডগোল নেই।"

স্টিভ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। "মনে হচ্ছে এল.পি.জি. ট্যাঙ্কারের ব্যাপারটা এবারে ভুলে যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু স্যার", ফিপ্‌স্ বলল, "একটা ব্যাপারে আমার খটকা রয়ে গেছে। তিন মাস আগে 'জাভা স্টার' নামে একটা এল.পি.জি. ট্যাঙ্কার উধাও হয়ে গেছে। তার নাবিকরাও সকলেই নিখোঁজ। জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা 'ডিসট্রেস কল' পাঠিয়েছিল যে জাহাজের ইঞ্জিনরুমে বিশাল মাপের আগুন লেগে গেছে। জাহাজটাকে কেউ স্বচক্ষে ডুবতে দেখেনি অবশ্য।"

"তুমি কি বলতে চাইছো?" হিল জিজ্ঞেস করল।

"ডিসট্রেস কল শুনে প্রথম একটা রেফ্রিজারেটরবাহী জাহাজ ক্যাপ্টেনের উল্লেখ করা জায়গায় পৌঁছে দেখে কয়েকটা হাওয়া-ফোলানো রাবারের ডিঙ্গি, লাইফবেল্ট

BanglaBook.org

আর কয়েকটা নানা রকম জিনিস ভাসছে। 'জাভা স্টার' বা তার নাবিকদের চিহ্নমাত্র নেই। আমার খটকা এইখানেই—ইঞ্জিনরুমে বিধ্বংসী আগুন লাগলে রাবারের ডিঙ্গি বা লাইফবেল্ট আস্ত থাকার কথা নয়। ওগুলো থাকে ডেকের নীচে খোলের মধ্যে—পুড়ে যেতে বাধ্য।"

"তুমি বলছো 'জাভা স্টার' ছিনতাই হয়েছে?"

'নিঃসন্দেহে। বিশেষ করে তথাকথিত 'আগুন লাগা'টা যেখানে ঘটেছে—"

"কোথায়?"

"সেলেবিস সাগরে। লাবুয়ান নামে একটা দ্বীপ থেকে দুশো মাইল দূরে।"

"ওহ্, মাই গড!" স্টিভ হিল নিজের কপালে চাপড় মারল।

আটলান্টিক মহাসাগরে বিষুবরেখা পেরিয়ে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' ধেয়ে চলছিল উত্তর উত্তর-পশ্চিমে। মাইক জাহাজ চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার সঠিক গন্তব্যস্থল জানতো শুধু তার ন্যাভিগেটর। মাইক আন্দাজ করল এই পথে গেলে আজোর্স দ্বীপপুঞ্জের আটশো মাইল পশ্চিমে পৌঁছে তারপর জাহাজ ঘুরে সোজা পশ্চিমদিকে আমেরিকার বাল্টিমোর বন্দরের দিকে এগোবে—কাউন্টেস অফ রিচমণ্ডের ঘোষিত গন্তব্য।

মাইকের কাছে অস্ত্র বলতে ছিল একটা সাত ইঞ্চি লম্বা ফলাযুক্ত মাংসা কাটা ছুরি। সকলেই টিনের খাবার খাচ্ছিল রোজ, ফলে ছুরিটার অনুপস্থিতি কেউই লক্ষ্য করেনি। মাইক প্রতিদিন রান্নাঘরের শান দেওয়ার পাথরে ঘষে ঘষে ছুরিটা প্রচণ্ড ধারালো করে তুলেছিল। নিজের পিঠের নীচের দিকে সে সব সময় ছুরিটা আটকে রাখতো। কিন্তু 'স্টিংরে'-কে ব্যর্থ করবে কিভাবে, তা সে ভেবে পাচ্ছিল না।

অন্যদিকে দুর্বৃত্ত জাহাজের জন্য অনুসন্ধানের বৃত্ত এবার ছোট করে আনা হ'ল। 'জাভা স্টার' সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করা হ'ল। যে পোতাশ্রয়ে জাহাজটা তৈরি হয়েছিল, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল ছ' বছর আগে 'জাভা স্টার' ও তার একটি যমজ জাহাজ একসঙ্গে তৈরি করা হয়েছিল। যমজ জাহাজটিকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। সেটি নিরাপদ। নিঃসন্দেহে ছিনতাইকারীরা 'জাভা স্টার'-এর নাম পাল্টে ফেলেছে। সুতরাং হুবহু একই আয়তনের ও চেহারার আর একটা জাহাজের জন্য খোঁজ শুরু হ'ল। এ কাজে নিয়োজিত হল মহাশূন্যে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ও তার ক্যামেরা এবং জলে বেশ কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ।

যে ব্যাপারটা কেউ আন্দাজ করতে পারল না তা হ'ল, জাভা স্টার-এর শুধু নামই বদলে ফেলা হয়নি, সেই সঙ্গে তার পুরো চেহারা এবং আয়তনও পাল্টে ফেলে তাকে একটা সম্পূর্ণ অন্য, আইনসম্মতভাবে রেজিস্ট্রি করা জাহাজে পরিণত করা হয়েছে।

BanglaBook.org

জি-এইট সামিট কনফারেন্সের দিন এসে গেল—এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। আমেরিকান গোয়েন্দামহল সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে ব্রিটিশ গুপ্তচর কর্নেল মাইক মার্টিনের মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত। লাবুয়ান থেকে আসা ড্রাইভারের কিট ব্যাগে সংক্ষিপ্ত বার্তা

পাঠানোর পর থেকে অনেক দিন কেটে গেছে, তার বেঁচে থাকার কোনো চিহ্ন আর পাওয়া যায়নি। যদি কোনো জাহাজ 'ভাসমান বোমা' রূপে আমেরিকার কোনো বন্দরের দিকে এগোবার চেষ্টা করে, তাহলে বোঝা যাবে যে মার্টিন তার কাজে সফল। কিন্তু সে যে জীবিত নেই, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হয়ে গেল।

জি-এইট সম্মেলন শুরু হওয়ার তিনদিন আগে মারেক গুমিনি গোপন লাইনে ফোন করে স্টিভ হিলকে বলল যে সে মাইক মার্টিনের জন্য দুঃখিত, কিন্তু সারা দুনিয়ার সব সমুদ্রে এত বড় অনুসন্ধান চালানোর পরেও যখন নিশ্চিত কিছু জানা গেল না, তার মানে মার্টিনের পাঠানো খবরটা ভুল ছিল। স্টিভ হিলের সঙ্গে কথা বলার সময়েই আর একটা লাইনে গুমিনির একটা কল এলো। সে বলল, "এক্সকিউজ মী, স্টিভ; আমি একটু অন্য কলটা ধরে নিই।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ফের হিলের লাইনটা ধরলো গুমিনি। উত্তেজিত স্বরে বলল, "একটা জাহাজের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে ত্রিনিদাদ থেকে রওনা হয়েছে, গতকাল সকালে পুয়ের্তো রিকোতে পৌঁছনোর কথা। সেখানে যায়নি তো বটেই, উপরন্তু কল করলে উত্তর দিচ্ছে না।"

"কি রকম জাহাজ?" হিল জিজ্ঞেস করলো।

"তিন হাজার টনের ট্যাঙ্কার। হতে পারে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছে। আমরা চেক করে দেখছি।"

"ট্যাঙ্কার? কি নিয়ে যাচ্ছিল?"

"এল পি জি!"

ছিনতাই হওয়া 'ডোনা মারিয়া' কৃত্রিম উপগ্রহের চোখ এড়াতে পারল না। ভীত, সন্ত্রস্ত ক্যাপ্টেন মন্টালবান দুই মরক্কোবাসী আতঙ্কবাদীর উদ্যত পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে তার ছোট ট্যাঙ্কারটা নিজেই ন্যাভিগেট করে চালাচ্ছিল। কিম্বা জলদস্যুদের নির্ধারিত পথে চালাতে বাধ্য হচ্ছিল বলাই সমীচীন। চারদিন ধরে বেচারাকে একটু ঘুমোতেও দেয়নি আতঙ্কবাদীরা, কারণ তারা নিজেরা কেউই জাহাজ চালাতে পারে না। রাতের অন্ধকারে পুয়ের্তো রিকো পেরিয়ে বাহামার সাতশো ছোট বড় দ্বীপের মধ্যে বেশ কয়েক ঘন্টা জাহাজটা বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন তার ট্রান্সপণ্ডার থেকে নির্গত বৈদ্যুতিন সিগন্যাল শুনে তার স্থান নির্দেশ করল, তখন বিমিনি দ্বীপ ছাড়িয়ে সে ধেয়ে চলেছে সোজা মায়ামি বন্দরমুখো। এপ্রিল মাস, গ্রীষ্ম শুরু হচ্ছে, সারা মায়ামি জুড়ে অজস্র পর্যটকের ভিড়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কী ওয়েস্টের নৌঘাঁটি থেকে উড়ে এলো একটা অরিয়ন থ্রী জেট ফাইটার, চক্কর কাটতে লাগল 'ডোনা মারিয়া'র চারপাশে। উপকূল রক্ষীবাহিনীর দুটো সশস্ত্র, দ্রুতগামী জাহাজও ধেয়ে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু তাদের সমস্ত নির্দেশ ও সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তীব্র গতিতে মায়ামির দিকে ছুটে চলল ডোনা মারিয়া। মারেক গুমিনি খবর পেয়েই এন.এস.ই. এবং সি.আই.এ-কে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল। উপকূল রক্ষীবাহিনীর থেকে বারংবার অনুরোধ যাচ্ছিল জাহাজটার

BanglaBook.org

প্রতি ঃ "অপরিচিত জাহাজকে বলছি—আমরা আমেরিকান উপকূল রক্ষীবাহিনী। এখনই জাহাজ থামাও, আমরা উঠে তল্লাশি করতে চাই।"

কথা শোনা দূরে থাক, একজন আলজিরীয় সন্ত্রাসবাদী ডেকে উঠে এসে একটা মেশিন পিস্তল থেকে উপকূল রক্ষীবাহিনীর জাহাজের দিকে গুলি চালাতে শুরু করল। সেই মুহূর্তেই সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ট্যাঙ্কারটা সন্ত্রাসবাদীদের দখলে। উপকূল রক্ষীবাহিনীর জাহাজ থেকে নির্ভুল নিশানায় একটা রাইফেলের বুলেট ছুটে গিয়ে বিঁধল উত্তর আফ্রিকানটির বুকে, সে ডেকেই লুটিয়ে পড়ল। ডোনা মারিয়ার গতি কিন্তু একটুও কমল না, বা তার পথও বদলালো না। বোঝা গেল জাহাজের আরোহীরা আত্মঘাতী জঙ্গি, পূর্ণ গতিতে জাহাজটাকে মায়ামি বন্দরে নিয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোই তাদের উদ্দেশ্য।

উপকূলরক্ষী জাহাজটির কম্যাণ্ডার অনুমতি চাইল কামান দেগে জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। নৌঘাঁটি থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ এলো ঃ "এখনই তোমাদের জাহাজ দুটোর মুখ ঘুরিয়ে অন্তত এক মাইল দূরে সরে যাও। এই জাহাজটা একটা বিশাল ভাসমান বোমা। এর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালাও।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্দেশ পালন করে উপকূলরক্ষী জাহাজ দুটো দ্রুত এক মাইল দূরে সরে গেল। সরে যেতে যেতেই রক্ষীরা দেখতে পেল পেন্‌সাকোলা বিমানঘাঁটি থেকে উড়ে আসছে দুটো মারাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন রকেটবাহী এফ-১৬ বিমান।

সব এল.পি.জি. ট্যাঙ্কারের মতো ডোনা মারিয়ার মালবাহী খোলও ডবল ইস্পাতের চাদরে তৈরি। ফলে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র যখন সামনে ও পিছনের অংশে একই সঙ্গে আঘাত হানলো, তার নিজের ব্যবহার্য জ্বালানি তেলের ট্যাঙ্কারটায় বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ধরে গেল, কিন্তু একটুও এল.পি.জি. বেরিয়ে হাওয়ায় মেশার সুযোগ পেল না। জোড়া রকেটের আঘাতে 'ডোনা মারিয়া' ভেঙে দু' টুকরো হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল। পোড়া পেট্রলের গন্ধভরা গরম হাওয়ার হলকা ধেয়ে গিয়ে উপকূল রক্ষীদের চোখে মুখে আঘাত করল কিছুক্ষণের জন্য। মার্কিন ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয় এবং দু' দেশের গোয়েন্দা কর্তাদের এতদিনে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। যাক, 'আল্-ইসরা' অবশেষে ব্যর্থ!

বার্মিংহ্যামের অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে সি.এন.এন.-এর সংবাদ বুলেটিন টিভিতে দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে ডঃ আলি আজিজ খান-খাত্তাবও একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, হুবহু তার নির্দেশ মতোই কাজটা হয়েছে!

'ডোনা মারিয়া' ধ্বংস হওয়ার এক ঘন্টা পরে মারেক গুমিনি হোয়াইট হাউসে গিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের কাছে অপারেশন ক্রোবার এবং অপারেশন স্টিংরে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংক্ষেপে পেশ করল। সি.আই.এর ডাইরেক্টরের দিকে তাকিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বললেন, "তাহলে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া খবরটা সম্পূর্ণই সঠিক ছিল।"

"হ্যাঁ স্যার", মারেক গুমিনি জবাব দিল। "ওদের গুপ্তচর—এক অতীব সাহসী

BanglaBook.org

এবং বীর অফিসার—ছদ্মবেশে, অন্য পরিচয়ে আল-কায়দার ভেতরে ঢুকে এই খবর পাঠিয়েছিল। সে নিশ্চিতরূপেই নিহত হয়েছে, কিন্তু সেই খবর দিয়েছিল যে একটা জাহাজের মাধ্যমে এই সাংঘাতিক ধ্বংসলীলা ঘটানো হবে।"

"প্রতিদিন সারা পৃথিবী জুড়ে এল.পি.জির মতো এত বিপজ্জনক জিনিস নিয়ে জাহাজগুলো এইভাবে যাওয়া-আসা করে? আমার ধারণাই ছিল না", বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

"আমারও ছিল না", বললেন রাষ্ট্রপতি। "আচ্ছা, তাহলে জি-এইট সম্মেলনের ব্যাপারে আপনারা কি বলছেন?"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একবার জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের ডাইরেক্টর জন নিগ্রোপন্টের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমরা এখন নিশ্চিত যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষত মায়ামি বন্দর শহরের উপর জঙ্গি হামলার চেষ্টা আমরা বানচাল করে দিতে পেরেছি। আর কোনো ভীতি বা আতঙ্কের কারণ নেই। সুতরাং জি-এইট সম্মেলন পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তিনদিনের এই সম্মেলনের সময় আপনি স্বয়ং এবং আপনার সকল অতিথি ও অভ্যাগতরা চব্বিশ ঘন্টাই মার্কিন নৌবাহিনীর সুরক্ষার আওতায় থাকবে। নেভির সর্বাধিনায়ক লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আপনাদের কারো কোনো ক্ষতি কিছুতেই কেউই করতে পারবে না। সুতরাং সরকারিভাবে আপনার প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, আপনি স্বচ্ছন্দে, খোলা মনে জি-এইট নিয়ে এগোতে পারেন।"

"ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ!" আমেরিকান রাষ্ট্রপতি হাসলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঠিক বাহাত্তর ঘন্টা পরে নিউইয়র্ক বন্দরের নবনির্মিত ব্রুকলিন টার্মিনালের দীর্ঘ বারো নম্বর জেটিতে সন্ধেবেলা নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল একুশ শতকীয় দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা বিলাসবহুল ও দ্রুতগামী যাত্রীবাহী জাহাজ 'কুইন মেরী-২'। এপ্রিল মাসের সুগন্ধী, সুখকর সন্ধ্যা। ফার্স্ট অফিসার ডেভিড গুগুল্যাখ গর্বিত ভঙ্গিতে জাহাজের বিশাল, সুউচ্চ ব্রিজের ডানপাশে দাঁড়িয়ে চারদিকের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য উপভোগ করছিল।

'কুইন মেরী-২' ব্রিটিশ জাহাজ। মার্কিন সরকার পাঁচদিনের জন্য জাহাজটা চার্টার করেছে। এ বছরের জি-৮ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই জাহাজে। আটটি উন্নত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁদের পরিবারসহ মোট ৪২০০ জন যাত্রী ও ১২০০ জন নাবিক ও কর্মী নিয়ে 'কুইন মেরী-২' নিউইয়র্ক থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডের সাদাম্পটন বন্দরে ভিড়বে পাঁচদিন পরে। নির্বিঘ্নে সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করতে করতে খোলা মনে আলোচনা চালাতে পারবেন আট রাষ্ট্রপ্রধান।

প্রথম পৌঁছলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য জাপানি মন্ত্রী, আমলা ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি দল। আগের ব্যবস্থা মতো কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মার্কিন নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার ব্রিগেড তাঁদের সোজা পৌঁছে দিল 'কুইন মেরী-২'-এর ডেকে। তারপরে একে একে পৌঁছল অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি দল—কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য। সবশেষে পৌঁছল মার্কিন প্রতিনিধি দল, কারণ আমেরিকান রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এবারের সম্মেলনের নিমন্ত্রণকর্তা 'হোস্ট'।

ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় নোঙর তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু করল 'কুইন মেরী-২'। রাত আটটায় সম্মেলনের উদ্বোধন ও স্বাগতম নৈশভোজ। বক্তৃতা দেবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। চতুর্দিকে ভাবলেশহীন মুখে ঘুরছে গাঢ় রঙের স্যুট পরিহিত কম্যাণ্ডো ও নিরাপত্তা রক্ষীর দল। পুরো সমুদ্রযাত্রার সময় জাহাজের ডাইনে-বাঁয়ে দু'পাশে মার্কিন নৌবাহিনীর দুটি দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধ জাহাজ 'মন্টেরী' এবং 'লীট গাল্‌ফ্' সঙ্গে চলবে। তাছাড়া শূন্যে নিরাপত্তার জন্য সর্বদাই অন্তত একটি 'হক-আই' যুদ্ধ বিমান উড়ে চলবে জাহাজের সঙ্গে। এই বিমানগুলির শক্তিশালী র‍্যাডার দিনে রাতে সব সময়েই জাহাজের চারপাশে পঁচিশ বর্গমাইল পর্যন্ত এলাকায় যে কোনো উড়ন্ত বা জলে ভাসমান যানের উপর লক্ষ্য রাখবে।

'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' এই সময়ে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে পশ্চিমে

BanglaBook.org

এগোচ্ছিল। তার হাতে এখনও দু'দিন সময় আছে—তারপরেই আসবে সেই মহান সময়, শয়তানদের ধ্বংস করে আল্লাহ্‌র রাজ্য বেহেশতের দিকে অন্তিম, পবিত্র যাত্রা। ইন্দোনেশীয় ন্যাভিগেটরের নির্দেশে তার স্বদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার জাহাজের গতি একেবারে কমিয়ে দিয়েছিল। প্রায় পায়ে হাঁটার গতিতে দুলকি চালে এগোচ্ছিল জাহাজ। আমেরিকার উপকূল আর ১৬০০ মাইল দূরে।

শূন্য থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরায় তার ছবি উঠল ২/৩ বার। তার চালু ট্রান্সপণ্ডারের আত্মপরিচিতির সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে প্রতিবারই কম্পিউটার একই বার্তা পাঠালো ঃ আইনসম্মত বাণিজ্যিক জাহাজ, কোনো বিপদ নেই।

কুইন মেরী-২'তে দ্বিতীয় রাতে হোস্ট হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাঁদের উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের নিয়ে ডিনার সারলেন দু'শো আসনবিশিষ্ট 'কুইনস্ গ্রিল' রেস্তোরাঁয়। অন্য প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল বিশাল 'ব্রিটানিয়া' রেস্তোরাঁ অথবা কুইনস্ বলরুম, নাইটক্লাব ডিসকোতে। নির্বিঘ্নে আনন্দের মধ্যেই কাটল দ্বিতীয় রাত। ফার্স্ট অফিসার গুণ্ডল্যাখ নিশ্চিন্ত মনে শুতে গেল। তার জাহাজের দু'পাশে দু'টি পাহারাদার যুদ্ধ জাহাজ—তাছাড়া কুইন মেরীর র‍্যাডার এবং স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকারী যন্ত্রও কৃত্রিম উপগ্রহের মতোই শক্তিশালী। কু-মতলব নিয়ে কোনো প্রকার জলযান বা বিমান কাছাকাছি আসার আগেই বিনা প্রশ্নে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

কুইন মেরীর সমুদ্রযাত্রার তৃতীয় রাত্রিতে এগারোটা বাজার কিছু আগে উড়ন্ত হকআই বিমান একটা সতর্ক বার্তা পাঠালো ঃ পঁচিশ মাইল দূরে একটা ছোট মালবাহী জাহাজ রয়েছে। কুইন মেরীর পথের দু' মাইল দক্ষিণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' ঠিক চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তা বলা যায় না। যদিও মোটরগাড়ির নিউট্রাল গীয়ারের মতো তার ইঞ্জিন 'মিডশিপ' অবস্থানে সেট করা ছিল এবং তার প্রপেলার দুটো স্থির হয়ে ছিল, কিন্তু সমুদ্রের চার 'নট' বেগের বহমান স্রোতে সে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকেই এগোচ্ছিল।

হাওয়া-ফোলানো স্পীড বোটটা ইতিমধ্যে জলে নামানো হয়ে গিয়েছিল। জাহাজের বাঁ পাশে নামানো দড়ি ও কাঠের ঝুলন্ত মইয়ের সঙ্গে একটা কাছি দিয়ে বাঁধা। চারজন লোক বোটের মধ্যে বসেছিল। অন্য চারজন জাহাজের ব্রিজের মধ্যে—ইব্রাহিম ডানদিকে হুইলে হাত রেখে বসেছিল, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ দিগন্তরেখার দিকে। সে অপেক্ষা করছিল কতক্ষণে ভাসমান শহরের আলো কাউন্টেসের দিকে এগিয়ে আসা শুরু করে।

ইন্দোনেশীয় রেডিও অপারেটার বেতার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল যে সেটার মাইক্রোফোন কথা বললে দূরের জাহাজ স্পষ্ট শুনতে পায়। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রিটিশ নাগরিক পাকিস্তানি ছেলেটি। চতুর্থজন আফগান, তিনজনের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সব কিছু পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে রেডিও অপারেটার একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল। এবারে অপেক্ষা—কতক্ষণে প্রত্যাশিত কলটা আসে।

BanglaBook.org

কলটা এলো কুইন মেরীর ডানদিকের যুদ্ধ জাহাটার থেকে। দেড় ঘন্টার ঘুম সেরে গুগুল্যাখ তখন ফের ব্রিজে হাজির। দু' পক্ষের কথা সে তার সামনের বেতার যন্ত্রে পরিষ্কার শুনতে পেল ঃ "কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড—ইউ.এস.নেভি ক্রুজার মন্টেরি থেকে বলছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?" কণ্ঠস্বরটা দক্ষিণী আমেরিকান।

যে কণ্ঠস্বরটা উত্তর দিল, সেটা ঈষৎ অস্পষ্ট। তার মানে বেতার যন্ত্রটা বহু পুরোনো মডেলের। কিন্তু উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল বক্তা ল্যাঙ্কাশায়ার অথবা ইয়র্কশায়ারের লোক—শব্দের প্রথমে 'এইচ' উচ্চারণ করে না ঃ "ওহ্ হ্যাঁ, মন্টেরি। কাউন্টেস থেকে বলছি। আমাদের ইঞ্জিন পুরোনো—অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে—থেমে থাকতে হচ্ছে খানিকক্ষণ—সারাই হয়ে যাবে শিগগির...."

আমেরিকান সৈনিকটি উত্তর ইংল্যাণ্ডের বাচনভঙ্গী বুঝতে পারছিল না। ডেভিড গুগুল্যাখ নিজের সামনের মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে বলল, "হ্যালো মন্টেরি, আমি কথা বলছি।" গুগুল্যাখ নিজে লিভারপুলের কাছে চেশায়ারে বড় হয়েছে। ল্যাঙ্কাশায়ার বা ইয়র্কশায়ার দুটো কাউন্টিই চেশায়ারের কাছে। কাজেই তাদের কথা সে সহজেই বুঝতে পারে।

"হ্যালো কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড", সে বলল, "কুইন মেরী-২ থেকে বলছি। তোমার ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে, সারাই চলছে, তাই তো?"

"রীট্ ইআর" (অর্থাৎ রাইট ইউ আর) অন্যপ্রান্ত থেকে উত্তর এলো। "আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। উই ওপ (হোপ) সো।"

"কাউন্টেস, তোমার তথ্য জানাও—কোন বন্দরে রেজিস্ট্রি হয়েছে, কোন বন্দর থেকে আসছো, গন্তব্য কোন বন্দর, সঙ্গে পণ্য কি আছে?"

"অ্যাই (ইয়েস) কুইন মুরি—লিভারপুল, সুরাবায়া, বাল্টিমোর—তোমার প্রথম তিনটে প্রশ্নের উত্তর। সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ, সঙ্গে আছে দামী কাঠ আর রেশম।"

শনাক্তকরণ যন্ত্রের কম্পিউটারের পর্দায় চোখ রেখে গুগুল্যাখ দেখল সব তথ্যই সঠিক। সে জিজ্ঞেস করল, "আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আমি ক্যাপটিন মাককেনড্রিক। উ আ ইয়ু? (হু আর ইউ)

"ডেভিড গুগুল্যাখ, ফার্স্ট অফিসার, কুইন মেরী-২। ওভার।"

এবারে মন্টেরি থেকে প্রশ্ন এলো, "কুইন মেরী, তুমি কি পথ পাল্টাতে চাও?"

গুগুল্যাখ প্রধান কম্পিউটারের পর্দায় চোখ রাখল। কম্পিউটার কুইন মেরীকে পূর্ব নির্ধারিত পথেই নিয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ বা গণ্ডগোল হলে যন্ত্র নিজে থেকেই যাত্রাপথ পাল্টে নেবে। এখন যাত্রাপথ পাল্টানোর অর্থ কম্পিউটার অফ করে নিজের হাতে জাহাজ চালাতে হবে। তারপরে পুনরায় জাহাজকে ঘুরিয়ে আগে থেকে ঠিক করা পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। সে অনেক ঝামেলা।

"মন্টেরি", সে মাইক্রোফোনে বলল, "এখন থেকে ঠিক একচল্লিশ মিনিট বাদে আমরা থেমে থাকা ফ্রেটারটাকে পেরিয়ে যাব। পথ বদলের দরকার নেই। পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে আমরা দু' মাইল দূরে থাকবো।"

BanglaBook.org

মাত্র দু' হাজার ফুট ওপর থেকে হকআই বিমানের পাইলট ফ্রেটারটার ওপর বিরামহীন নজর রাখছে। কোনোরকম ক্ষেপণাস্ত্র মারতে চাইলে তা করতে হবে ডেকের ওপর থেকে। সেরকম কোনো আচরণ চোখে পড়া মাত্রই হক আইয়ের পাইলট রকেট মেরে জাহাজটাকে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু স্তব্ধ ফ্রেটারের ডেকে সেরকম কোনো ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল না।

"ওকে, কুইন মেরী", মন্টেরি থেকে উত্তর এলো।

কাউন্টেসের ব্রিজের মধ্যে সব কথাই চারজন শুনল। ইব্রাহিম মাথা নেড়ে বাকি তিনজনকে স্পীড বোটে নেমে যেতে বলল। রেডিও অপারেটর ও পাকিস্তানি-ব্রিটিশ ছেলেটা তরতরিয়ে মই বেয়ে নেমে বোটে উঠে বসল। বাকি রইল শুধু আফগান।

কুইন মেরী-২? মাইক মার্টিনের অত্যন্ত পরিচিত নাম। তারা নেমে গেলে কি এই উন্মাদ ইব্রাহিম পুনরায় জাহাজের ইঞ্জিন চালু করে পূর্ণগতিতে ধেয়ে গিয়ে বিশাল ব্রিটিশ প্রমোদ তরীটিকে ধাক্কা মেরে বিস্ফোরণ ঘটাবে? যেমন ১৯১২ সালে বরফের ভাসমান পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে গিয়েছিল টাইটানিক?

মাইক শরীর কাত করে ধীরে ধীরে মই বেয়ে নেমে গেল। কাউন্টেসের ডেকের রেলিং-এ বাঁধা ঝুলন্ত কাছি ধরে ইন্দোনেশীয় ইঞ্জিনীয়ারটি তীব্র স্রোতের মধ্যে বোটটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিল। বোটের পেছনদিকে সুলেইমান তার ক্যামেরা, ল্যাপটপ, স্যাট ফোন ইত্যাদি ঠিক করতে ব্যস্ত—বাকি দু'জন ইন্দোনেশীয় তাকে সাহায্য করছিল। পাকিস্তানি ছেলেটা মস্ত আউটবোর্ড মোটরটার পাশে বসে চোখ বুজে বিড়বিড় করছিল—সম্ভবত কোরানের কোনো শ্লোক আওড়াচ্ছিল।

নামতে নামতে মাইক তার পোশাকের ভেতর থেকে ধারালো ছুরিটা বার করে নিল। মইয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে বাঁ হাতে শক্ত করে দড়ি আঁকড়ে ধরে সে নীচু হ'ল। পর মুহূর্তেই ঝুঁকে পড়ে এক কোপে বোটের কিনারার শক্ত রাবারটাকে ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি ছ' ফুট কেটে ফাঁক করে দিল। কাজটা এত অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত যে কয়েক সেকেণ্ড কারও মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হ'ল না। শুধু শোঁ-ও-ও শব্দ করে তীব্র গতিতে বোটটার হাওয়া বেরিয়ে যেতে লাগল। ছ'জন লোকের ওজনে ভারাক্রান্ত বোটটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাত হয়ে জলে ভরে গেল।

আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে মাইক কাছিটা কাটবার জন্য ছুরি চালালো। সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল, কিন্তু রেডিও অপারেটারের পুরো বাহুটা ছুরির ঘায়ে কেটে ফাঁক হয়ে গেল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে সে কাছিটা ছেড়ে দিতেই দ্রুতবেগে স্পীডবোটটা স্রোতের টানে জাহাজ ছাড়িয়ে পিছনদিকে ভেসে গেল। প্রচণ্ড ভারী আউটবোর্ড মোটর এবং ছয় আরোহীর মিলিত ওজনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে তীব্র স্রোতে আটলান্টিকের গর্ভে তলিয়ে গেল বোট। কেউ একজন ঝাঁপ দিয়ে জাহাজের দিকে সাঁতরে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু মাঝসমুদ্রে চার নট স্রোতের বিরুদ্ধে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। জাহাজের পিছনদিকে লাগানো আলোর আভায় মাইক

BanglaBook.org

দেখতে পেল কয়েক জোড়া হাত জলের ওপরে উঠছে নামছে। তারপর সেগুলো তলিয়ে গেল।

জাহাজটার দখল নেওয়ার জন্য মাইকের সামনে এখন একটিই বাধা—ইব্রাহিম! সে মই বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে ইব্রাহিম ব্রিজের ঠিক বাইরে লাগানো তিনটে আলগা সুইচের একটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে পটকা ফাটার মতো আওয়াজ—ডেকের দুটো ইস্পাতের বাক্সের ডালা উঁচু হয়ে বাইরের দিকে কাত হয়ে গেল। তার পরেও পরপর ফাটতে লাগল নীচে লাগানো ছোট ছোট বিস্ফোরক। বাকি সব ক'টা ইস্পাতের ডালা খানিকটা ওপরে উঠে গিয়ে কাত হয়ে ডেক থেকে পিছলে জলে পড়ে গেল।

মাইক সারাক্ষণ ছুরিটা দাঁতে কামড়ে ধরে মইয়ের দ্বিতীয় ধাপে গুঁড়ি মেরে বসেছিল। সে এইবার ছুরিটাকে তার ঢিলে প্যান্টের পকেটে ভরে ওপরে উঠে এলো। সে দেখল ব্রিজের ভেতর কাঁচের উইণ্ড শীল্ডের মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে দেখছে 'কারবালার কসাই'। দিগন্ত রেখায় পঁচিশ নট বেগে এগিয়ে আসছে 'কুইন মেরী-২' অন্তত চার-পাঁচ হাজার লোকে পূর্ণ, আলোকিত একটি ১,৫০,০০০ টন ওজনের ভাসমান শহর। ব্রিজের নীচে ডেকের ওপর ইস্পাতের বাক্সগুলো আর নেই, নীচে দেখা যাচ্ছে একটা গ্যালারি। এই প্রথম মাইক বুঝতে পারল যে বাক্সগুলো আসলে ঢাকনা ছিল, নীচে কিছু একটা লুকোনো জিনিসকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাই ছিল তাদের কাজ।

সেই মুহূর্তে আকাশে মেঘ সরে গিয়ে আধখানা চাঁদ দেখা দিল। আর সেই আলোয় পূর্বতন জাভা স্টার-এর ডেকের সামনের অংশটা মাইকের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল জাহাজটা বিস্ফোরক বোঝাই সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ নয়—জাহাজটা ট্যাঙ্কার। ব্রিজের নীচে থেকে ছড়ানো অজস্র পাইপ, টিউব, ট্যাপ, স্পিগট এবং ছোট বড় চাকাগুলো দেখেই স্পষ্ট হয়ে গেল ইব্রাহিম কি করতে চলেছে।

পাইপের জালের নীচে ছ'টা গোল ট্যাঙ্ক, প্রতিটার মাঝখানে লাগানো একটা গোল ইস্পাতের ঢাকনা—ট্যাঙ্কের ভেতরে উচ্চচাপে রাখা পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন বস্তুর নির্গমন পথ।

"আফগান, তোমাকে বোটে থাকতে বলেছিলাম", ইব্রাহিম বলে উঠল।

"আর জায়গা ছিল না ভাই। সুলেইমান আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল। আমি মইয়ের ওপর থেকে নেমে পা রাখবার জায়গাও দেখতে পেলাম না। তারপরে তো ওরা চলেই গেল। আমি তোমার সঙ্গেই থাকব, একত্রে প্রাণ দেবো—ইনশাল্লাহ্!"

ইব্রাহিমকে মনে হ'ল এই উত্তরে সন্তুষ্ট। সে জাহাজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় লিভারটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। পরপর ছ'টা পটকা ফাটার মতো শব্দ হ'ল। ছ'টা ট্যাঙ্কের ওপর থেকে ঢাকনাগুলো উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে তীব্র বেগে যে বস্তুটি সোজা ফোয়ারার মতো আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল, সেটি চোখে দেখা গেল না, কিন্তু তার গন্ধে মাইক টের পেল বস্তুটা এল পি জি! মাইক এই

BanglaBook.org

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস সম্বন্ধে এটুকু জানতো যে বস্তুটা জগতের সবচেয়ে বিপজ্জনক সহজ দাহ্য পদার্থ। তার বালক বয়সে ইরাকে একবার একটা বাড়ির রান্নাঘরে একটা মাত্র সিলিণ্ডারের এল পি জি লিক করে বেরিয়ে আসার পর তাতে আগুন লেগে যে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, তাতে বাড়ির একটা দেওয়াল ধসে গিয়েছিল এবং পুরো বাড়িটায় আগুন ধরে গিয়েছিল।

অদৃশ্য এল পি জি ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস তীব্র ধারায় বেরিয়ে প্রায় একশো ফুট উঁচুতে উঠে গেল। তারপরে মাধ্যাকর্ষণের টানে তা নেমে এলো সমুদ্রের বুকে এবং উৎসমুখের চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

মাইক নিজের বুকের মধ্যে একটা চরম হতাশার ব্যথা অনুভব করল। সে বুঝতে পারল সে হেরে গেছে। সে বরাবরই ভেবেছিল যে জাহাজটার মধ্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক কিছু বিস্ফোরক পদার্থ বোঝাই করা আছে এবং সন্ত্রাসবাদীরা জাহাজটা নিয়ে কোনো ব্যস্ত বন্দরের তীরে ধাক্কা মেরে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটাবে। গত এক মাস ধরে সে জাহাজের সাতটা লোককে হত্যা করে জাহাজের দখল নেওয়ার সুযোগ খুঁজেছে, কিন্তু কোনো সেরকম সুযোগ সে পায়নি। এখন আর উপায় নেই। ছ'টা ট্যাঙ্কের থেকে যে অদৃশ্য মৃত্যু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে আটকানোর আর রাস্তা নেই।

সে বুঝতে পারল জাভা স্টার/কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড নিজেই একটি বিশাল বিধ্বংসী বোমা। যে প্রকাণ্ড জাহাজটি এখন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, যার মধ্যে রয়েছে নিশ্চিন্তে আনন্দ ও বিলাস উপভোগরত চার-পাঁচ হাজার লোক, সে জাহাজটা জাভা স্টারের তিন কিলোমিটারের মধ্যে এসে গেলেই সাংঘাতিক, ভয়ঙ্কর এক আগুনের গোলার খাদ্যে পরিণত হবে। অত বড় প্রমোদতরী ও তার মানুষগুলোর লেশমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না।

মাইক জি-৮ সম্মেলনের কথা জানাতো না। সে জানতো না যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ও ক্ষমতাশালী আটটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা কুইন মেরীর সওয়ার। এবং জানতো না বলেই সে কল্পনাও করতে পারছিল না যে এই আটটি ধনাঢ্য ও ক্ষমতাবান দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির একসাথে মৃত্যু সারা দুনিয়া জুড়ে কি ভীষণ চাঞ্চল্য, আতঙ্ক এবং রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে! সে এই মুহূর্তে শুধু একটা কথাই ভাবছিল—যে করে হোক, এই বীভৎস ধ্বংসকে আটকাতেই হবে।

ইব্রাহিমের ডানহাতের পাশে তৃতীয় একটা সুইচ দেখতে পেল মাইক—ঠিক সুইচ নয়, একটা বড় লাল বোতাম। বোতামের নীচে থেকে একটা তার বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে ব্রিজের খোলা জানালায় টাঙানো একটা 'ভেরি' পিস্তলের বাঁটে। বোতামটায় সামান্য একটা চাপ দিলেই ভেরি পিস্তল থেকে বেরিয়ে আসবে একটা জ্বলন্ত 'ফ্লেয়ার'—বিপদ সঙ্কেতের সূচক অনাবৃত অগ্নিশিখা....

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আলোকিত ভাসমান শহর দিগন্তের এপারে চলে

BanglaBook.org

এসেছে। বড় জোর পনেরো মাইল দূরে, তিরিশ মিনিট লাগবে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-এর কাছে মৃত্যুর বৃত্তে পৌঁছতে—এল পি জি এবং বাতাস মিলে মিশে সর্বাধিক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ততক্ষণে।

ব্রিজের এক কোণে রাখা বেতার যন্ত্র ও মাইক্রোফোনের দিকে ঝটিতি একবার তাকালো মাইক। একটা শেষ সুযোগ যদি পাওয়া যেত! একটা সুইচ টিপে একবার মাত্র চেঁচিয়ে হুঁশিয়ারি.....তার ডান হাতটা সে ধীরে তার ঢোলা টাউজার্সের পকেটে ঢোকাল, ওখানে ছুরিটা গোঁজা আছে।

উন্মত্ত ইসলামিক আত্মঘাতী জঙ্গির তীক্ষ্ণ চোখ সে এড়াতে পারল না। এতদিন ধরে জর্ডন ও ইউ.এ.ই'র গোয়েন্দা পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাদের চোখে ধুলো দিয়ে এবং আমেরিকান ও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এড়িয়ে সে বেঁচে আছে—তার দৃষ্টি সদা সতর্ক! এর সঙ্গে যোগ হ'ল আফগানের জন্য জমিয়ে রাখা তার পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস ও ঘৃণা। সে বুঝতে পারল যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, আরবীতে কথা বলা সত্ত্বেও, এই আফগান তার বন্ধু নয়।

মাইক পকেটে হাত ঢোকানোর আগেই টেবিলে চার্ট ও ম্যাপের তলায় লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা তুলে সোজা তার বুকের দিকে তাক করল ইব্রাহিম। তাদের দু'জনের মধ্যে দূরত্ব প্রায় বারো ফুট—দরকারের চেয়ে অন্তত ন'-দশ ফুট বেশি।

যে কোনো পেশাদার সৈনিকের মনে তার ট্রেনিংয়ের প্রথমদিন থেকে একটা কথা গেঁথে দেওয়া হয় ঃ চরম প্রাণঘাতী বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ালেও তোমাকে ঝুঁকি নিতে হবে; এক মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি এগোবে না পিছোবে, শূন্যে লাফ দেবে নাকি জমিতে আছাড় খাবে। তার চুয়াল্লিশ বছরের জীবনকালের চব্বিশটা বছর ধরে কর্নেল মাইকেল মার্টিন সমানেই ঝুঁকির পরে ঝুঁকি নিয়েছে। এখনও মৃত্যুর অদেখা বাষ্পে ঘেরা জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে সে মনস্থির করে ফেলল। তার সামনে কেবল দু'টি মাত্র পথ খোলা—হয় লোকটাকে আক্রমণ করো, নয়তো বোতামটা টিপে দাও। যে কোনোটাই সে করুক না কেন, সে প্রাণে বাঁচবে না। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে এতদিন ধরে, এত কষ্ট সয়ে, এত বিপদের মোকাবিলা করে, এতদূর পর্যন্ত এসেছে, সেই উদ্দেশ্য তাকে চরিতার্থ করতেই হবে!

অনেকদিন আগে স্কুলে পড়া একটা কবিতার লাইন তার মনে পড়ল ঃ "এ ধরায় সকল লোকের তরে/মৃত্যু নিশ্চিত আসে,/কখনও শীঘ্র অথবা কখনও দেরিতে...." তার আরো মনে পড়ল রুক্ষ পাহাড়ে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে পাঞ্জশিরের সিংহ আহ্‌মদ শাহ্ মাসুদ বলছেন ঃ "আংলিজ, আমরা সকলেই মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষ; কিন্তু একমাত্র সেই যোদ্ধাই আল্লাহ্‌তালার আশীর্বাদধন্য, সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে সে কিভাবে মরবে!" কর্নেল মাইক মার্টিন তার জীবনের চরম ও শেষ সিদ্ধান্তটি নিল...

ইব্রাহিম দেখল লোকটা প্রমত্ত বেগে তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে চিৎকার করে উঠে হাতে ধরা রিভলভারের ট্রিগার টিপলো। সেই একই মুহূর্তে দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহটা

BanglaBook.org

ঝাঁপ দিল শূন্যে....আর ইব্রাহিমের ছোঁড়া গুলিটা গিয়ে লাগল উড়ন্ত দেহটার বুকে। ইব্রাহিম দেখল মানুষটা মরে যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা এবং তীব্রতম আঘাতেরও নাগালের বাইরে থাকে মানুষের দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি—যে ইচ্ছাশক্তি মৃত্যুর নিশ্চিত গহ্বরে ঢুকে যাওয়ার আগে অন্তত এক মুহূর্ত প্রাণকে টিকিয়ে রাখে।

সেই এক মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখটার থেকে বেরিয়ে এলো একটা দুর্ধর্ষ জয়োল্লাসের চিৎকার.....আর বাঁ হাতটা গিয়ে আছড়ে পড়ল লাল বোতামটার ওপর।

ডেভিড গুগুল্যাখ চমকে উঠে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। সামনে পনেরো মাইল দূরে, কুইন মেরীর গতিতে পঁয়ত্রিশ মিনিটের দূরত্বে, অকস্মাৎ সমুদ্রের বুক চিরে একটা দানবাকার আগ্নেয়গিরি জেগে উঠল। বিশাল লেলিহান অগ্নিশিখা লকলক করে ছুটে যাচ্ছিল আকাশের দিকে। পাশে দাঁড়ালো নাবিকটির গলা চিরে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, "হে ভগবান, এটা কি?"

পর মুহূর্তেই বেতারযন্ত্র সজীব হয়ে উঠল : "মন্টেরি টু কুইন মেরী! এখনই, এই মুহূর্তে বাঁয়ে জাহাজ ঘোরাও! সরে যাও যত দূরে সম্ভব।"

গুগুল্যাখ ডাইনে তাকিয়ে দেখল মন্টেরি তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে বিশাল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। নিঃসন্দেহে কাউন্টেস অফ রিচমণ্ডে একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সে ক্যাপ্টেনকে ডাক পাঠিয়ে কম্পিউটার বন্ধ করে দ্রুত হুইল ঘোরাতে লাগল বাঁয়ে। ক্যাপ্টেন আসার আগেই কুইন মেরী তিন মাইল দূরে সরে গেল। অন্য ক্রুজারটি সারাক্ষণ বাঁদিকে সঙ্গে ছুটে চলল।

ব্রিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে কুইন মেরীর ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট অফিসার দেখল আগুনটা শেষবারের মতো দপদপ করে নিভে যাচ্ছে। মন্টেরি ওখানে পৌঁছোনোর আগেই আগুন পুরোই নিভে যাবে। কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড বা তার কোনো আরোহীর চিহ্নমাত্র পাওয়া সম্ভব হবে না।

ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন, পুনরায় কম্পিউটার চালু করে পূর্ব নির্ধারিত যাত্রা পথে যেতে—সাদাম্পটন পৌঁছতে বেশি দেরি হয়ে গেলে মুশকিল হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উপসংহার

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী একটা তদন্ত কমিটি অবশ্যই তৈরি হ'ল। তদন্ত শেষ হতে লেগে গেল দু' বছর। কমিটি দুটি দলে ভাগ হয়ে কাজ করল। একটা দল 'জাভা স্টার'-এর তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে তার তথাকথিত ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তদন্ত চালিয়ে, বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ফিলিপাইনস সরকারের সহায়তায় জামবোয়াঙ্গার জঙ্গলে ফিলিপিনো কম্যাণ্ডোদের একটা আক্রমণ চালিয়ে এক বছর পরে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল যে, বোর্নিও থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রীম্যান্টল বন্দরে ছ'টি ট্যাঙ্ক ভর্তি এল পি জি নিয়ে যাওয়ার সময় 'জাভা স্টার' সন্ত্রাসবাদী জলদস্যুদের কবলে পড়ে এবং ছিনতাই হয়ে যায়। ক্যাপ্টেনসহ সমস্ত নাবিকদের সম্ভবত হত্যা করা হয়, যদিও তা প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু নানা কৌশল করে সামুদ্রিক বাণিজ্যমহলকে বিশ্বাস করানো হয় যে 'জাভা স্টার' ডুবে গেছে, কিন্তু বাস্তবে জাহাজটা অক্ষতই ছিল।

দ্বিতীয় দলটা তদন্ত চালালো 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' সম্পর্কে। অ্যালেক্স সাইবার্টের অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সিঙ্গাপুর বন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল 'কাউন্টেস' সেখানে পঞ্চাশটি জাগুয়ার মোটরগাড়ি নামিয়েছিল নির্বিঘ্নেই। ক্যাপ্টেন ম্যাককেন্ড্রিক তাঁর এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটা পাবে গিয়ে বীয়ার পান করতে করতে আড্ডাও দিয়েছিলেন এবং বাড়িতে ফোন করেছিলেন।

এরপরে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দিতে নিশ্চিত জানা গেল যে কিনাবালু বন্দরে জাহাজ ভিড়েছিল এবং তাতে দামী কাঠ বোঝাই করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ম্যাককেন্ড্রিক ও তাঁর নাবিকেরা সকলেই বহাল তবিয়তে ছিলেন। কিন্তু সুরাবায়া থেকে জানা গেল যে 'কাউন্টেস' সেখানে থামেইনি। অথচ সাইবার্ট অ্যান্ড অ্যাবারক্রম্বির দপ্তরে সুরাবায়ার জাহাজি এজেন্ট চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল যে সেখান থেকে 'কাউন্টেস' বহুমূল্য রেশমের সম্ভার তুলেছে। নিঃসন্দেহে চিঠিটা জাল।

অ্যালেক্স সাইবার্টের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে কম্পিউটারে মিঃ লামপং-এর একটা ছবি তৈরি করে ইন্দোনেশিয়ান সরকারকে দেওয়ার পরে তাদের নিরাপত্তা বিভাগ জানালো যে ছবিটা জামাত ইসলামিয়া সংগঠনের এক সন্দেহভাজন অর্থ সংগ্রাহকের, যদিও তার বিরুদ্ধে কখনো কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মাস দুয়েক চেষ্টা চালিয়েও সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

তদন্তকারী দ্বিতীয় দলটি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' সেলেবিস সাগরে জলদস্যুদের হাতে ছিনতাই হয়ে যায়। তার যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ, পরিচিতি পত্র, ট্রান্সপণ্ডার, বেতারযন্ত্র ইত্যাদি চুরি করার পর জলদস্যুরা ক্যাপ্টেনসহ সমস্ত নাবিককে হত্যা করে জাহাজটা ডুবিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

যৌথ তদন্ত কমিটির চরম সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, 'জাভা স্টার'-এর চেহারায় রদবদল ঘটিয়ে তার ভোল পাল্টে 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' রূপান্তরিত করা হয়েছিল— অবশ্যই আপাতদর্শনে বাইরে থেকে—কারণ একথা প্রমাণিত যে তার এল পি জি ভাণ্ডার অটুট ছিল, যদিও প্রতিস্থাপিত ট্রান্সপণ্ডার, বেতার যন্ত্র ও কাগজপত্র দিয়ে দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করা হয়েছিল যে ওই জাহাজটিই আসল 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'।

ডঃ আলি আজিজ আল-খাত্তাবের ওপর অনেকদিন ধরেই নজর রাখছিল এম.আই-৫। তার ট্যাপ করা ফোনের একটা কল থেকে হঠাৎ জানা গেল যে সে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কাটছে। এম.আই-৫-এর সদর দপ্তরে একটা ছোট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হ'ল যে যথেষ্ট হয়েছে, একে আর ছেড়ে রাখা যায় না। বার্মিংহ্যাম পুলিশ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি দল তার ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে তাকে বাথরুম থেকে অর্ধেক স্নান হওয়া অবস্থায় তোয়ালে পরিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

কিন্তু দেখা গেল আল-খাত্তাব অতীব ধূর্ত প্রাণী। তার অ্যাপার্টমেন্ট, সেল ফোন, ল্যাপটপ, গাড়ি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে এক সপ্তাহ ধরে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও তাকে অভিযুক্ত করার মতো ছিটেফোঁটা প্রমাণও কিছু মিলল না। তাকে জেরা করতে সে শুধু ঝকঝকে সাদা দাঁতের পার্টি দেখিয়ে হাসল এবং তার উকিল বিস্তর চেঁচামেচি করতে লাগল যে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই, এমনকি সরকারিভাবে কোনোরকম অভিযোগ না করেই ব্রিটিশ পুলিশ তার নির্দোষ মক্কেলকে আটকে রেখেছে। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে অবশ্য আইনসম্মত ক্ষমতা আছে, যে কোনো সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে তারা আটাশ দিন পর্যন্ত জেলে আটকে রাখতে পারে।

আটাশ দিন বাদে বেলমার্শের জেলখানা থেকে আল-খাত্তাব মুক্তি পেল। সে উজ্জ্বল হেসে জেলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে জেলের বাইরে রাস্তায় পা দিল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হ'ল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল যখন সে জানল যে সংযুক্ত আরব আমীরশাহী (ইউ.এ.ই.) সরকার তার নামে একটি 'এক্সট্রাডিশন' পরোয়ানা জারি করেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের কাছে ইউ.এ.ই. সরকার প্রার্থনা জানিয়েছে, আজিজ আলি আল-খাত্তাবকে যেন যথাবিহিত বিচার ও দণ্ডদানের জন্য তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবারে কোনো সময়সীমা নেই। আল-খাত্তাব পুনরায় জেলে ফেরৎ গেল। তার উকিল মামলা করল যে তার মক্কেল কুয়েতের লোক, সুতরাং তার ওপর ইউ.এ.ই'র কোনো দাবি থাকতে পারে না।

দুবাইয়ের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পুলিশ বিভাগ এইবার পঞ্চাশটি ফটোগ্রাফ আদালতে পেশ করল। এই ফটোগুলিতে স্পষ্টই দেখা গেল আল-খাত্তাব বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে একজন ঢাউয়ের মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলছে এবং তার নৌকার মধ্যেই বসে রয়েছে। এই ঢাউ-মালিকটি আল-কায়দার সহযোগী, অনেকদিন থেকেই তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এছাড়া আরো কিছু ফটোতে দেখা গেল আল-খাত্তাব রাসাল খাইমার একটা সন্ত্রাসবাদী আস্তানায় ঢুকছে বা সেখান থেকে বেরোচ্ছে।

BanglaBook.org

বিচারক সব দেখে এবং শুনে যথেষ্টই নিশ্চিত হয়ে এক্সট্রাডিশনের পক্ষেই রায় দিলেন।

আল-খাত্তাব উচ্চতর আদালতে আপীল করল এবং আবার হারল। এবার সে নিজে থেকেই ব্রিটিশ সরকারের জেলেই থাকতে চাইল, কারণ দুবাই গেলে তার কি দুর্দশা হবে, সে ভালমতোই জানতো। কিন্তু ব্রিটিশদের হাতে তাকে ধরে রাখার মতো প্রমাণ নেই। সুতরাং জেলের গাড়িতে তাকে সশস্ত্র প্রহরায় হীথরো নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে সঙ্গী এজেন্ট দু'জনের সঙ্গে একটা রফা করল। তাকে এম.আই-৫-এর দপ্তরে ফিরিয়ে আনার পরে সে হড়মুড়িয়ে আল-কায়দার গুপ্ত তথ্য ফাঁস করতে শুরু করে দিল। তার শুধু একটাই প্রার্থনা—তাকে যেন দুবাইতে না পাঠানো হয়। পরিবর্তে সে যা কিছু জানে, সব বলে দেবে। সে যে কত কিছু জানে তা দেখে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা চমৎকৃত হয়ে গেল। সে অন্তত একশো জন গুপ্ত আল-কায়দা এজেন্টের নাম ঠিকানা গতিবিধি ফাঁস করে দিল। এতদিন অবধি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এই লোকগুলোকে কোনো সন্দেহই কখনো করেনি। এমনকি আমেরিকা ও ব্রিটেন মিলিয়ে মোট চব্বিশটা গুপ্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেরও হদিশ সে দিয়ে দিল।

এইবার একদিন তাকে জেরা করার সময় এক প্রশ্নকারী আল-কায়দার একটা পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করল—যে পরিকল্পনা তথা অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'আল-ইসরা'। আল-খাত্তাব স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার ধারণাই ছিল না যে এই বিষয়টা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগৎ ওয়াকিবহাল। এরপরে সে আবার কথা বলা শুরু করল। দেখা গেল বিষয়গুলোর অধিকাংশ লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের জানা, বা সন্দেহ তালিকাভুক্ত। শেষ অবধি সে কাউন্টেস অফ রিচমণ্ডের আটজন আরোহীকেই শনাক্ত করল। পাকিস্তানি ছেলেটা কেমন করে ম্যাককেন্ড্রিকের মতো কথা বলে গুগুল্যাখকে বোকা বানিয়েছিল, এবং এটা যে আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল, একথা বলার পর সে 'ডোনা মারিয়া' সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করল। ওই জাহাজটার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা না করে উপায় ছিল না, কারণ দুর্বৃত্ত জাহাজ ধরা না পড়লে যদি কুইন মেরীতে জি-৮ সম্মেলন বাতিল করে দেওয়া হয়!

'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড' তথা 'জাভা স্টার' কিভাবে কুইন মেরী-২'কে ধ্বংস করবে, সে ব্যাপারটাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করল আল-খাত্তাব। এই সময়ে প্রশ্নকর্তারা তাকে জিজ্ঞেস করল সে ইজমৎ খান দি আফগানকে চিনতো কিনা। একটুও ইতস্তত না করে আল-খাত্তাব বর্ণনা করল কেমনভাবে সে নিজে ওই আফগানকে জেরা করে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। সে বলল যে আয়মান আল-জাওয়াহিরি তাকে পাঠিয়েছিল আফগানকে জেরা করার জন্য, এবং 'শেখ' নিজে আফগানের আত্মপরিচিতি সমর্থন করে তাকে আল-ইসরার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

তার প্রশ্নকর্তা দুই এজেন্ট হাসিমুখে যখন তাকে জানাল 'আফগান' আসলে কে, আল-খাত্তাব একেবারেই ভেঙে পড়ল।

এক হস্তরেখা বিশারদ 'নিখোঁজ' কর্নেল মার্টিনের হাতের লেখার সঙ্গে লাবুয়ান থেকে পাওয়া সংক্ষিপ্ত লেখাটা মিলিয়ে পরীক্ষা করে জানালেন যে দুটো লেখা

BanglaBook.org

নিঃসন্দেহে একই লোকের। ক্রোবার কমিটি শেষ অবধি সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে আফগানের বেশে সন্ত্রাসবাদীদের ধোঁকা দিয়ে কর্নেল মাইক মার্টিন নিশ্চিতভাবেই দুর্বৃত্ত জাহাজে চড়েছিল, কিন্তু এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ কমিটি জোগাড় করতে পারল না যার থেকে ইঙ্গিত মিলতে পারে যে সে জাহাজ থেকে পালাতে পেরেছিল।

নির্ধারিত সময়ের পঁয়ত্রিশ মিনিট আগেই কেন 'কাউন্টেস অফ রিচমণ্ড'-এ বিস্ফোরণ ঘটল, সে প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

কিছুদিন বাদে এস.এ.এস-এর পক্ষ থেকে কর্নেল মাইকেল মার্টিনের প্রতি সরকারিভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হ'ল। মাইক প্রথম স্যাস এজেন্ট নয় যে তার কর্তব্য করতে গিয়ে 'নিখোঁজ' বা 'কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত' বলে ঘোষিত হয়েছে। একটাই কথা শুধু থেকে যায়—সে নিজের প্রাণ দিয়ে যে পাঁচ হাজার লোককে বাঁচিয়েছিল, তারা কেউ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জানল না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG